একই সুর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নি বে দ ন

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বিমল কর বলতেন, সব লেখকই বিশেষ একটা 'থিম' নিয়ে কাজ শুরু করেন। বারে বারে সেটিকে ধরার চেষ্টা করেন। সেটি ঠিক মতো ধরতে পারলেই তাঁর রচনাকাল শেষ। একই সুর বারে বারে ফিরে অ ত চায়। 'চ্যালেঞ্জে'র মতো। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলে সে যে পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় / যায় না ারে ধরা / তবু সোনার হরিণ খোঁজা। জীবনের সুর অজ্ঞাতভাবে কখন কেমন যে বাঁধা হয়ে যায়— কে জানে! সারা জীবন শুধু ঘুরে মরা— আমি কোথায় পাবো তারে?

—লেখক

এই জায়গাটায় এসে সুমনকে রোজই একটু থমকে যেতে হয়। সামনে নেমে গেছে সাত, আট ধাপ লম্বা লম্বা সিঁড়ি। সুমনের পেছনে পড়ে থাকে দীর্ঘ এক করিডর। চওড়া। ওই পথ ধরে আসতে তার কোনো অসুবিধে হয় না। দু'হাত দিয়ে তার হুইল চেয়ারের চাকা ঘোরায়। গড়গড় করে চলে আসে। সমস্যা হল সিঁড়ি। মটোর লাগানো চক্রযানকে সিঁড়িতে গড়িয়ে দেওয়া যায় সাহস করে। সেই সাহসটুকুরই অভাব। এত তীব্রবেগে নামতে হয়, এত লাফায়, ভয় করে। যদি ছিটকে পড়ে যায়। যদি উল্টে যায়। পা দুটো তো গেছেই। সেই শৈশবেই ভাগ্য তাকে অচল করে দিয়েছে। এখন হাত দুটো যদি যায় তাহলে আত্মহত্যাই করতে হবে। বসে বসে কে তাকে খাওয়াবে। তেমন তো কেউ নেই। আর যদি থাকতও, ওইভাবে পরের অনুগ্রহে বেঁচে থাকাটা তো মৃত্যুরই সামিল।

সুমন একপাশে অপেক্ষা করে; চোখের সামনে নেমে গেছে সিঁড়ি ধাপে ধাপে! কলেজের অন্য ছেলেমেয়েরা কল কল করে কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে লাফাতে লাফাতে নেমে যাচ্ছে। সুমন তাকিয়ে থাকে করুণ চোখে। বড় অসহায় সে। সুমন থমকে যায়। তার পেছনে থমকে দাঁড়ায় রেখা। রেখা তার সহপাঠী। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সাধারণ মেয়ের চেয়ে দীর্ঘাঙ্গী। সুন্দরী। চোখে ফিনফিনে সোনালি ফ্রেমের চশমা। গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিশে আছে। বড় বড় টানা টানা চোখ। দীর্ঘ চোখের পাতা। একবার চোখ পড়ে গেলে, বারে বারে তাকাতে হবেই।

রেখা খুব আতঙ্কের গলায় কেবলই বলতে থাকে, 'সুমন, সাবধান। একলা নামার চেষ্টা কোরো না। অপেক্ষা করো, ব্রজেন আসুক। ব্রজেন আসুক।'

ব্রজেন আসবেই তবে দেরিতে। ব্রজেনের একটা বাতিক আছে। ক্লাস শেষ হবার পর, সে টয়লেটে যাবে। মুখ ধোবে। চুল আঁচড়াবে। পকেট

থেকে ছোট্ট একটা আতরের শিশি বের করবে। হাতে, ঘাড়ে কপালে চন্দন লাগাবে। ফিটফাট হয়ে আসতে পনের মিনিট লাগতে পারে। আধ ঘণ্টাও হতে পারে। ততক্ষণে কলেজ খালি হয়ে যায়। অধ্যাপকরাও একে একে চলে যেতে থাকেন। প্রত্যেকেই পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডেকে যান, 'সুমন' সকলেই ভালবাসেন সুমনকে। ভাল ছাত্র হিসেবে সুমনের ভীষণ খ্যাতি। শুধু ভাল নয়, একস্ট্রাঅর্ডিনারি। অনেকে বলেন 'ফেনোমেনা'। ভগবান পা দুটো নিয়ে মাথাতে পুষিয়ে দিয়েছেন। যেমন নিলুম তেমনি দিলুম। সব শেষে আসবেন মিশনারি কলেজের সায়েব প্রিন্সিপ্যাল। সাদা লংকোট। ফর্সা মুখে ঐশ্বরিক হাসি। তিনি কখনই সুমনের দুর্বলতা সম্পর্কে একটিও কথা বলবেন না। এমন একটা ভাব দেখাবেন, যেন সুমন স্বাস্থ্যবান, স্বাভাবিক এক ছেলে। প্রথমেই বলবেন, 'হ্যাললো সুমন। ওয়েটিং ফর ইওর ফ্রেন্ড।' তারপর বলবেন, 'হ্যাললো! সুইট গার্ল।'

প্রিন্সিপ্যাল কলেজ কোয়ার্টারেই থাকেন। অবিবাহিত এক ধর্মযাজক। প্রসন্ন, পণ্ডিত মানুষ। পরক্ষণেই তিনি চলে যাবেন দর্শনে। কান্ট, হেগেল, হিউম, স্পিনোজা, হবস, ডেকার্ট, প্লেটো, সক্রেটিস। সুমন গড় গড় করে তাঁদের লেখা থেকে লাইনের পর লাইন উদ্ধৃতি দিতে থাকবে। প্রিন্সিপ্যালের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

হঠাৎ ব্রজেন এসে গেল। একেবারে ফিটফাট, ফুলবাবুটি। প্রিন্সিপ্যাল সায়েব বললেন, 'হ্যালো জেন্টলম্যান, ফিনিশড ইওর ড্রেসিং। ইউ আর দি রিয়েল সেন্টপারসেন্ট বাবু।'

ব্রজেন তার হাত দুটো সায়েবের নাকের সামনে ঘুরিয়ে দিল।

রোনাল্ড সায়েব অমনি চোখ বড় বড় করে, 'আ, রিয়েল স্যান্ডাল'।

ব্রজেন পকেট থেকে ছোট্ট আতরের শিশিটা বের করে সায়েবের হাতে দিয়ে বললে, 'এ স্নিফ অফ স্পিরিচ্যুয়াল স্মেল। কিপ ইট। ইউস ইট ইন প্রেয়ার।'

গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট ব্রজেন। পাকা পেয়ারার মতো রঙ। মুখে সব সময় অদ্ভুত অসাধারণ এক হাসি লেগে থাকে। ব্রজেনের বাবার বিরাট ব্যবসা আছে এজরা স্ট্রীটে, গন্ধ দ্রব্যের। দেশ-বিদেশ থেকে আতর আর আরক আমদানি করেন, রপ্তানি করেন। ব্রজেন খুব সৎ, সাত্ত্বিক, পরোপকারী ছেলে। একটু বেশি মাত্রায় শৌখিন। বন্ধুবৎসল, শান্ত, নির্বিরোধী। শরীরে

অসীম শক্তি। গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তি করে। সরষের তেল আর মাটি মাখে। সকালে ছোলা আর বাদাম খায়। এতটাই সাত্ত্বিক যে তার মনে স্বাভাবিক নারী-পুরুষের ভেদটাই নেই। রোনাল্ড সায়েব বলেন, 'হি ইজ এ সেন্ট। ওকে আমি ডক্টর অফ ডিভিনিটি করাবো।'

ব্রজেন সুমনের চেয়ারটা পেছন দিক থেকে প্রাণপণে টেনে ধরল। প্রিন্সিপ্যাল রোনাল্ড সায়েবও হাত লাগালেন। প্রবীণ মানুষ হলেও, শক্তি ধরেন শরীরে। ভোর বেলা শর্টস পরে মাইলখানেক দৌড়ন। বাগানে কোদাল পাড়েন। ফুলই তাঁর সাধনা। মানুষ ফুল আর গাছের ফুল। সুমন তিন জনের সাহায্যে সাতটা ধাপ অতিক্রম করে নেমে এল নিচে। সমান জমিতে। সামনেই কয়েক কদম দূরেই কলেজের বিশাল গেট। প্রায় নির্জন একটি রাস্তা। একটা পার্ককে দু'বাহু দিয়ে ঘিরে পথ গিয়ে পড়েছে কলকাতার ব্যস্তসমস্ত রাজপথে। এই সময়টায় সুমনের নিজেকে খুব দীন-হীন অসহায় মনে হয়। তার জন্য তিনজন মানুষের কি কষ্ট। রেখার উদ্বেগ। তার মতো অক্ষম, পঙ্গু একটা ছেলের জন্যে রেখার কেন এত মমতা। প্রিন্সিপ্যাল সায়েব, তিনিও রোজ এই সময়ে আসবেন। এ যেন তার অবশ্য কর্তব্য। আর ব্রজেন? সে তো অবিচ্ছেদ্য। সুমনের জন্যে তার কলেজ কামাই করার উপায় নেই। ব্রজেন জানে সুমন তা হলে অসহায় হয়ে পড়বে।

ব্রজেন সুমনকে সমতলে নামিয়ে দিয়েই, 'আসি রে?' বলে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। তার আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই, আখড়ায় যেতে হবে। আখড়াই তার প্রাণ। রেখা সুমনের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এল। বিকেলের বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। চুল উড়ছে। রেখা বললো, 'সুমন, আমি তাহলে আসি। তুমি কিন্তু সাবধানে যাবে।'

সুমন তার চেয়ার গাড়িতে বসে আছে পাথরের ভাস্কর্যের মতো। চওড়া বুক। বলিষ্ঠ ঘাড়। গ্রীক দেবতার মতো মুখ। কোঁকড়া চুল। সমুদ্রের মতো চোখ। সুমন তার মামার চেহারা পেয়েছে। পোলিওয় দুটো পা পড়ে না গেলে সুমন নায়ক হতে পারত।

সুমন রেখার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'আমি তো সাবধানে যাবোই, তবে রাস্তা সাবধান হবে কি না আমি জানি না।'

'তোমার জন্যে আমার ভীষণ ভয় করে। কাল আবার দেখা না হওয়া

পর্যন্ত আমি খুব দুশ্চিন্তায় থাকি।'

সুমন অদ্ভুত এক চোখে তাকিয়ে থাকে রেখার দিকে। তার ভেতরটা একটা ভাবে ভরে যায়। বেদান্তে যাকে বলে পূর্ণতা। কোনও কথা বলে সে এর উত্তর দিতে পারে না। তার অসহায় নিঃসঙ্গ ভাবটা কেটে যায়। মনে হয় বাঁচি। অনেক বছর বাঁচি। প্রায় সন্ধ্যা। সামনেই পার্ক। সবুজ গাছপালা। জলাশয়। সাঁতারুদের ঝাঁপ খাবার উঁচু মঞ্চ। সুঠাম শরীরের ছেলে, মেয়েরা সংক্ষিপ্ত পোশাকে ঝাঁপ মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সুমন হাত তুলে বলে, 'আমি তাহলে আসি।'

সুমনের চেয়ারযান চলতে থাকে ডানদিকে। সুমন বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটমুখো না হওয়া পর্যন্ত রেখা দাঁড়িয়ে থাকে একই ভাবে। সুমনকে সে ভালবাসে। কেন বাসে তা বলতে পারবে না। নিজেকে অনেক প্রশ্ন করেছে। কোনও উত্তর পায়নি। ব্রজেনকেও তো ভালবাসতে পারত।

ব্রজেন অবশ্য ভালবাসার কিছুই বোঝে না। ভাল বন্ধু হবার সমস্ত গুণ তার মধ্যে আছে। ভাল প্রেমিক হবার কোনও গুণ নেই। ব্রজেন রেখাকে উৎসাহ দেয়, সুমন হল দেবতা। ব্রজেন আবার রেখাকে তুই বলে। 'তুই সুমনকে ভালবেসে ফ্লাড করে দে। দেখবি ঠকবি না।' ব্রজেন যেন রেখার দাদা। মাঝে মধ্যে চড়চাপড় চালায়। কান মলে দেয়। সময় সময় ব্রজেনকে রেখার মনে হয় বালক।

সুমন কর্নওয়ালিস স্ট্রীট অতিক্রম করার জন্যে বাঁ পাশে থামল। তার ডানপাশে বিশাল এক মটোরবাইক। রয়াল এনফিল্ড। বসে আছেন এক ব্যায়ামবীর। তার পাশে নতুন এক মটোরগাড়ি। পেছনে বসে আছেন এক সুন্দরী মহিলা উদাস মুখে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ধরে ডাইনে বাঁয়ে গাড়ি ছুটছে। ট্রাম যাচ্ছে ঘণ্টা বাজিয়ে। শব্দ, ব্যস্ততা। শহর ঘুমিয়ে পড়ার আগে যেন অসম্ভব গতিময়। ট্র্যাফিক পুলিশ যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পথ খুলে গেল। সুমন জানে সুস্থ গাড়ি তাকে সমীহ করবে না। মটোর সাইকেল বাতাসে অহঙ্কারের লাথি ছুঁড়ে তার গা ঘেঁষে চলে গেল তীরবেগে। সুন্দরীকে নিয়ে হুশ করে চলে গেল নতুন মটোরগাড়ি। সুমন ইতস্তত করছে। থামার পর চলাটা বড় এলোমেলো হয়। অধৈর্য মন আর ধৈর্য মানে না। এই মোড়ের ট্র্যাফিক পুলিশ সুমনকে চেনেন। তিনি দু'কদম

এগিয়ে এসে সুমনকে পার হতে সাহায্য করলেন। সুমন বিডন স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল। আর একটা ফাঁড়া সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়। তারপর গ্রে স্ট্রিট চিৎপুর জাংশন। চিৎপুরে সে ডানদিকে ঘুরে এগিয়ে যাবে কুমারটুলির দিকে।

সারাটা পথে চেষ্টা করেও সুমন একটা ভাবনা মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারে না। সেই ভাবনা হল মানুষের দুটো পা। পা শুধু দেহের নয়, পা মনেরও। মনেরও পা আছে। সেই পায়ের নাম অহঙ্কার। আর অহঙ্কারের অস্ত্র হল লাথি। পা হল মানুষের গতি, অস্থিরতা, অহঙ্কারের প্রতীক। সারাটা পথ নিজের সঙ্গেই নিজের যুক্তি, তর্ক, গল্প চলতে থাকে। যেন সোক্রোতিসের সঙ্গে ফিলাবুসের আলোচনা। প্লাতো বলেছিলেন, ফিলজফার ইজ এ চাইল্ড। পাপ শব্দটা পা থেকেই আসা উচিত। পায়ে পায়ে মানুষ পাপের দিকে এগোয়। এই তো সেই বাঁয়ের গলি। মেরুন অন্ধকারে প্যাঁচ মেরে পড়ে আছে। বিলাস-ব্যসনের পসারিরা সব ঢুকছে একে একে। ফুলঅলা, মালাইঅলা, চাঁটঅলা, ঘুগনিঅলা। রাত আর একটু গাঢ় হলেই এই পায়ে পায়েই এগিয়ে যাবে বিলাসীরা বিলাসিনীদের কাছে।

সুমনের বাড়িতে তার এক বিধবা জ্যাঠাইমা ছাড়া কেউ নেই। একেবারে গঙ্গামুখো সাবেক কালের একটা দোতলা বাড়ি। পেছনে রেললাইন। পথ। তার পরেই গঙ্গা। পিতৃপুরুষের এই সম্পত্তি আর ব্যাঙ্কে কিছু টাকা। কিছু বনেদী গয়না ছাড়া কিছুই নেই। সুদের টাকায় সংসার চলে। একেবারে ছাঁটকাট পরিবার চলে যায় কোনরকমে। জ্যাঠাইমা নিঃসন্তান। সবই মায়ের দয়া। গোটা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে স্মল পক্সে। সাবেক আমলের এক ম্যানেজার আছেন। হরিদা। তিনিই দেখাশোনা করেন। অবিবাহিত ধার্মিক মানুষ। ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করেন না। গোঁড়া বৈষ্ণব। তাঁর একটা খোল আর করতাল আছে। একসঙ্গে দুটো বাজানো যায় না বলে, হয় এটা না হয় ওটা বাজান। সুমনকে দুটোই বাজাতে শিখিয়েছেন। সুমনের সময় হলে নামসঙ্কীর্তন বেশ ভালই জমে। দোতলার হলঘরে। দেয়ালে, দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবি। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য। অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্মগুরু। পশ্চিমে গঙ্গার বাতাস। আকাশে মিটিমিটি তারা। ওপারের মন্দির থেকে ভেসে আসা শঙ্খঘণ্টার শব্দ।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই সিমেন্ট বাঁধানো পরিচ্ছন্ন একটা উঠোন।

তুলসীমঞ্চ। জুঁই, মালতী, মাধবী লতার ঝাড়। তিন পাশে লাল চকচকে দালান। পাশাপাশি ঘর। রকের বাঁ দিক দিয়ে উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি। উঠোন পর্যন্ত আসতে সুমনের কোনও সমস্যা নেই। তারপরেই সে অসহায়। আগে জ্যাঠাইমা তাকে সাহায্য করতে পারতেন। সম্প্রতি তিনি বাতে কাবু। তাঁকেই সাহায্য করতে পারলে ভাল হয়।

হরিদা এসে সুমনকে নামালেন কোনরকমে ধরে ধরে। প্রায় কোলে করেই বসিয়ে দিলেন বাঁ পাশের রকে! এইটুকুতেই দু'জনের ভীষণ পরিশ্রম। দু'জনেই পাশাপাশি বসে একটু হাঁপিয়ে নিলেন। সুমন হরিদার বলিষ্ঠ হাত দুটো ধরে বলল, 'আমার জন্যে আপনারও কি কষ্ট।'

হরিদা বললেন, 'তোকে আমি বলেছি না, এই কথাটা তুই আমাকে বলবি না। তুই আমারই কোলে মানুষ। তুই আমার বুকে আছিস। তবে হ্যাঁ, আমি গেলে কি হবে, সেটা ভাবার আছে। তখন প্রভু আছেন, কি বলিস।'

হরিদা উঠে গিয়ে সুমনের গাড়িটাকে উঠোনের একপাশে একটা আচ্ছাদনের তলায় রেখে দিলেন। রাতের মতো ছুটি। এর পরে সুমনকে যা করতে হবে, সেটা সে নির্জনে, একান্তেই করতে চায়। এমন কি হরিদা, কি জ্যাঠাইমার সামনেও তা করতে চায় না। দু'জনেই সুমনের এই লজ্জাটুকু জানে বলেই সামনে থেকে সরে যায়।

সুমন আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে আসা। বিপুলদেহী বাস, উদ্দাম ট্যাক্সি, একগুঁয়ে রিকশা, অহঙ্কারী প্রাইভেট কার তাকে উপেক্ষা করে চলে যায়। সামান্য একটা টুসকি মারলেই সুমন শেষ। সুমন অবশ্য এই ভেবেই পথে নামে, তার জীবনের কি-বা দাম। মরে গেলে তবু নতুন একটা শরীর পাওয়া যাবে। আবার লোভও হয়, এমন মাথা, এমন স্মৃতি যদি আর না পায়। শুধু মাত্র ভাল একটা শরীরের কি-ই বা দাম।

তিনতলার ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যার শাঁখে ফুঁ দিয়েছেন জ্যাঠাইমা।

সুমন এদিকে, ওদিকে একবার তাকাল। কেউ নেই। এই মুহূর্তে কারোর আসারও সম্ভাবনা নেই। সুমন একটা পশুর মতো দু' হাত আর অবশ দুটো পায়ে হামা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল দোতলায়। তার হাসি পাচ্ছে। সে না কি একটা মানুষ। ভীষণ বুদ্ধিমান মানুষ। কলেজের অধ্যাপকরা তার মাথার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ডঃ বোস ক্লাসে

এসেই বলবেন, 'তোমাকে আর কি পড়াবো, তুমিই তো আমাকে পড়াতে পার।'

সুমন ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে, 'স্যার প্রশংসা করে লজ্জা দেবেন না। আমি এক পঙ্গু।'

প্রথম যেদিন এই কথা বলেছিল, ডঃ বোস ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'শাটআপ ইডিয়েট। মানুষের দেহটা কিছুই নয়। আসল হল মন। তোমার মনটা কি পঙ্গু হয়ে গেছে। কমপ্লেক্সে ভোগো কেন?'

সেই ভীষণ হুঙ্কারে ক্লাস কেঁপে উঠেছিল। ডক্টর বোস ক্লাসের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, 'এরা কি তোমাকে ঘৃণা করে, উপহাস করে, ব্যঙ্গ করে? তোমার দৈহিক অক্ষমতায় হাসাহাসি করে?'

'না স্যার।'

'তবে। নিজের পেছনে যা-তা বিশেষণ লাগাচ্ছ কেন? ওরা তোমাকে ভালবাসে না?'

'অসম্ভব ভালবাসে স্যার। কিন্তু আমি যে আমার অক্ষমতা বুঝি। আমার মধ্যে একটা হতাশা আসে। একটা ক্ষোভ। সে তো আমি বোঝাতে পারব না। সে যে এক যন্ত্রণা।'

সেদিন ডঃ বোস ক্লাসে একটা গল্প বলেছিলেন।

''এক কবি। খুব অসুস্থ। এক ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি অসুবিধে আপনার?'

অনেক অসুবিধে! হরেক রকমের সিমটম। সাংঘাতিক, সাংঘাতিক সব রোগলক্ষণ। আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই। আমার শরীরে সুখ নেই এতটুকু। আমার সারা শরীর যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'একটা সত্য কথা বলবেন আমাকে, একটা কবিতা ধরেছেন তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কবিতাটি আটকে গেছে তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আচ্ছা, কবিতাটি আবৃত্তি করুন তো আমার সামনে। যতটা হয়েছে ততটাই করুন।'

লোকটি গড়গড় করে আবৃত্তি করতে লাগলেন। যেখানে আটকে

গিয়েছিলেন, সেই জায়গাটাও টপকে গেলেন। লাইনের পর লাইন এসে গেল। ছন্দে ছন্দ মিলে গেল। ভাবের তরঙ্গ খেলে গেল।

একবার আবৃত্তি হয়ে যাবার পর ডাক্তারবাবু বললেন, 'এইবার সোজা উঠে দাঁড়ান। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। আপনার ভেতরে যেটা আটকে ছিল, সেটাই বাইরেটাকে অসুস্থ করে তুলেছিল। ওটা বেরিয়ে গেছে, এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ।' সুমন তোমার ভেতরে যা আটকে আছে সব বের করে দাও। উগরে দাও। ভমিট আউট। ভেতর দিয়ে বাইরেটাকে অসুস্থ করে তুলো না।"

অধ্যাপক বোসের সেই গল্পে ক্লাসের সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই কবিতাটিও আবৃত্তি করেছিলেন। আবেগপ্রবণ মানুষ। শেষে নিজেই কেঁদে ভাসালেন। কবিতাটা সঙ্গে সঙ্গে সুমনের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তোমার হৃদয়ের বেদনা তাঁকে বোলো না কারণ তিনি যে বলছেন।
তাঁকে খুঁজো না, কারণ তিনিই যে খুঁজছেন।
ছোট্ট একটা পিঁপড়ে, তার স্পর্শও তিনি বুঝতে পারেন,
অতল জলের তলায় একটা পাথর গড়িয়ে গেলেও তিনি জানতে পারেন।

একটি ছোট্ট কীট, অনুর থেকেও যা সূক্ষ্ম
বিশাল এক পাহাড়ের গায়ে, তিনি সেই কীটানুকেও দেখতে পান
তার বন্দনা, তার গভীর কোনও অনুভূতি
তিনি জানেন, তাঁর অজানা কিছুই নেই।
ক্ষুদ্র এক কীট, তারও বাঁচার আয়োজন তিনি করে রেখেছেন
আর তোমার জন্যে প্রশস্ত করে রেখেছেন অসীম জ্ঞানের পথ॥
তোমার হৃদয়ের বেদনা তাঁকে বোলো না কারণ তিনি যে বলছেন।

অধ্যাপক বোসের উপদেশ সুমন অনুক্ষণ মনে রাখার চেষ্টা করে; কিন্তু বীভৎস একটা চতুষ্পদ প্রাণীর মতো সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় মনে [illegible] সে এক পাপী। পূর্বজন্মে এমন একটা কিছু করেছিল, যার ফলে তার এই অবস্থা। সুমন হাসে এই ভেবে, ভূমিকে তার মতো কেউ চিনবে [illegible]কোনও দিন। মেঝের প্রতিটি ফাটল, ঘুরে বেড়ানো কীটপতঙ্গ, তার

মতো কেউ পর্যবেক্ষণ করবে না কোনও দিন। তার একেবারে নাকের কাছে সিঁড়ির ধাপ। ধাপের পর ধাপ। সিঁড়ির সুদৃশ্য হাতলে তাকে কোনওদিন হাত রাখতে হবে না। মাথা তুলে দেখার সুযোগ হবে না দেয়ালে ঝোলানো একের পর এক ছবি। তার পূর্বপুরুষরা ঝুলিয়ে গিয়েছিলেন বিদেশী শিল্পীর আঁকা ভাল ভাল ছবি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে দেখতে দেখতে উঠতেন।

সুমন দোতলায় উঠে এগিয়ে যায় তার ঘরের দিকে। এই সময়টা নিজেকে শিম্পাঞ্জির মতো মনে হয়। বসে বসে এগিয়ে চলেছে তর তর করে। হাতের ভর দিয়ে শরীরটাকে তুলে দেয় চেয়ারে। এই পরিশ্রমে সে ঘেমে গেছে। দূরে দেয়ালে সুইচবোর্ড। ফ্যানটা চালাতে হবে। নিজের ক্ষমতায় হবে না। সুমন জানে, এখুনি তার জ্যাঠাইমা আসবেন। এসে পাখাটা চালাবেন। সে এ-ও জানে, সামনে কেউ না থাকলেও আড়াল থেকে তার ওপর নজর রাখা হয়েছে। সেইটাই বড় অস্বস্তির, বড় অপমানের। আপনজন হলেও, তাঁরা তো দ্বিতীয়জন।

জ্যাঠাইমা এসে পাখাটা চালিয়ে দিলেন। তোয়ালেটা এগিয়ে দিলেন হাতে। ভীষণ ভালবাসেন সুমনকে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবেন, হঠাৎ মারা গেলে কি হবে। অখণ্ড পরমায়ু চাই তাঁর শুধুমাত্র সুমনের জন্যে। বনেদী জমিদার বাড়ির মেয়ে। চেহারা, চালচলন, দুটোই সেইরকম। এই সময়টায় তিনি সুমনের সঙ্গে একটিও কথা বলেন না। তিনি জানেন এই মুহূর্তে সুমন নীরব থাকাই পছন্দ করে। নিজেই কথা শুরু করবে নিজের পছন্দ মতো সময়ে। জ্যাঠাইমা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সুমনকে এখন একলা থাকতে দিতে হবে। কারোর সাহায্য নেবে না। নিজেই কাপড় জামা ছাড়বে। তোয়ালেটা নিয়ে বাথরুমে যাবে। বাথরুমের সামনে চাকা লাগানো একটা পিঁড়ে আছে। বাথরুমে স্নান সেরে ভিজে তোয়ালে পরে ওই পিঁড়িতে বসে, গড়াতে গড়াতে চলে আসবে। বসে বসেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে পোশাক বদলাবে।

সুমন বাথরুমে খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। কয়েকটা ব্যাপারে সে বুঝতেই পারে পশুর সঙ্গে তার আর একেবারেই পার্থক্য থাকে না। সুমন জল খেতে ভয় পায়। সারাদিন কলেজে সে বাথরুম ব্যবহারই করে না। করা যায় না। সকালের দিকে সে সামান্যই খায়। মনে মনে হাসে, এই

করতে করতে সে একদিন যোগী হয়ে যাবে।

জামাকাপড় বদলে সে হলঘরের দিকে যেতে যেতে, 'হরিদা' বলে ডাক দিল। হরিদা সিঁড়ির ধাপে বসেছিলেন, এই ডাকেরই অপেক্ষায়। হলঘরে কার্পেট বিছানোই ছিল। একদিকে খোল আর একদিকে করতাল। আজ সুমন নিল খোল, হরিদা করতাল। শুরু হয়ে গেল নাম সংকীর্তন। জ্যাঠাইমা এসে বসলেন গলায় আঁচল দিয়ে। একটু একটু করে ভজন কীর্তন সাংঘাতিক জমে উঠল। এক একদিন এই রকম হয়। দু'জনেরই প্রবল ভাব এসে যায়। দুনিয়া ভুল হয়ে যায়। সুমনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরীর মন্দির। কানে বাজে সমুদ্রের গর্জন। ভাঙা ঢেউয়ের চরণ ছোঁয়া কান্না। যখন সে গাইতে থাকে—ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে, চরণতলে লুটি যাইছে কোঁচা—তখন সে যেন দেখতে পায়, বিশাল, আঁধার আকাশ ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের হাসি, দীর্ঘ এক পুরুষ দু' হাত তুলে ভাবাবেশে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছেন জলের দিকে। এই দৃশ্যটি দেখামাত্রই সুমন কেঁদে ফেলে। ঠিক যেমন করে হঠাৎ বৃষ্টি নামে তোড়ে, সুমন ঠিক সেই ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিছুক্ষণের মতো সে একটা অচেতন অবস্থায় চলে যায়। তখন জ্যাঠাইমা এসে মাথাটা তুলে নেন কোলে, হরিদা বুকে হাত বোলাতে বোলাতে মৃদুস্বরে বলতে থাকেন, 'প্রভু প্রভু।'

সুমন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে, পারে না। সে জানে তার পাড়ার লোক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। তার কানে এসেছে এমন কথা, কানাখোঁড়াদের অমন হয়। কেউ শ্যামাসংগীত করতে করতে ফিট হয়ে যায়। কারোর কীর্তন করতে করতে দাঁত লেগে যায়। জানিস তো কানা-খোঁড়া তিন গুণ বাড়া। সুমন শোনে, কিছু মনে করে না। জীবনটায় সে শুধু শুনতে এসেছে। শোনাতে আসেনি।

যখন তার চার বছর বয়স, মা তখন ছেলে স্বাস্থ্যবান হবে বলে খুব দুধ খাওয়াতেন। তাঁর তো কোনও দোষ ছিল না। এ-দেশের মানুষ তখন স্বাস্থ্যবিদ্যার কতটুকুই বা জানত। পোলিওর ভ্যাকসিনও তখনও চালু হয়নি, এখন যেমন হয়েছে। অসুখটা এল এই দুধ থেকেই। প্রথমে হল জ্বর। ভীষণ দুর্বল। হঠাৎ পা দুটো কেমন যেন হয়ে গেল। কোনও শক্তি নেই। শেষে ফুলহাতা জামার হাতার মতো লটরপটর করতে লাগল। পা দুটো

একেবারে শুকিয়ে গেল। কত রকমের মালিশ, টোটকা, দৈব। কিছুতেই কিছু হল না।

সেই চার বছর বয়সের ছবির দিকে সুমন তাকিয়ে থাকে। সুস্থ সবল একটি শিশু। হাফপ্যান্ট পরা। ফর্সা, গোল গোল দুটো পা। মোজা। বুট জুতো। মাঝে মাঝে ছবির অ্যালবামটা বের করে সুমন দেখে। যা ছিল, এখন যা নেই।

রবিবারের দুপুর। সুমন তার ঘরে বসে লেখাপড়া করছে। দক্ষিণের দুটো জানালাই খোলা। নিচে রাস্তা। হঠাৎ চেঁচামেচি। কিল, চড়, ঘুসির শব্দ। সুমন বসে বসে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। ব্রজেন তিনটে ছেলেকে বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে। সুমন, 'হরিদা, হরিদা' বলে চিৎকার করে উঠল। পাশের ঘরেই হরিদা ছিলেন, ছুটে এলেন।

হরিদা ছুটে গেলেন নিচে; কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রজেন ওপরে উঠে এল পাঞ্জাবির হাতা ঠিক করতে করতে। মুখ দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, একটু আগেই তিনটে ছেলেকে, সে বেদম ধোলাই দিচ্ছিল। যেন কিছুই হয়নি। কখনই কিছু হয়নি। লাল মেঝের ওপর ধপাস করে বসে পড়ল। দৈহিক কোনও কিছু দেখলে সুমনের ভীষণ ভয় করে। গলা শুকিয়ে যায়।

ব্রজেন বললে, 'ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি। একে বলে হাতেনাতে কর্মযোগ। আমার কর্মযোগ আর ও তিন বাঁদরের দুষ্কর্মযোগ। গোটাকতক দাঁত নড়বড়ে করে দিয়েছি। দিন সাতেক একটু লিকুইড ডায়েটের ওপর থাকতে হবে। আর ঘোড়ার মতো লম্বা লম্বা তিনটে মুখ একটু চাঁদের মতো গোলগোল হয়ে থাকবে দিন তিনেক। আর মনে থাকবে, কি বলতে আছে, আর কি বলতে নেই।'

'কি বলেছিল?'

'সে আমি তোকে বলব কেন? দেনা-পাওনা সব মিটিয়ে দিয়ে এসেছি। ডেলিভারি অ্যান্ড পেমেন্ট।'

সুমন হেসে বললে, 'জানি কি বলেছিল? ল্যাংড়াদের বাড়ি। ওই

ছেলে তিনটে আমাকে দেখলেই ল্যাংড়া ল্যাংড়া বলে চেঁচায়।'

'আর চেঁচাবে না। আজ একেবারে ফুল পেমেন্ট করে দিয়েছি। প্রয়োজন হলে তিন জোড়া ঠ্যাংই খুলে নেবো।'

'দেখবি, ওরা এর পর আরও বাড়াবাড়ি করবে।'

'তখন আমি আরও আরও বাড়াবাড়ি করব। প্রয়োজন হলে এখানেই আমার চৌকি বসাবো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। ছাড় ওই প্রসঙ্গ। এখন আমার ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য চাই। ঠিক ক্ষুধার্ত নই, লোভার্ত, আর প্রকৃত অর্থে তৃষ্ণার্ত।'

ব্রজেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাঠাইমাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে এ-গালে ও-গালে গোটাকতক চুমু খেয়ে বললে, 'হাম খেলুম, এইবার গরমাগরম কচুরি খাবো। শুকনো আলুরদম সহযোগে, সঙ্গে আচারের টাকনা। হরিদা, তুমি আমার দীনতারিণী তারা, দিনে দিনে দিন গত হল দিন, আর কত দিন রব কচুরি ছাড়া। আগেই বলে রাখছি পেটচুক্তি খাওয়া। আমি সিগন্যাল না দেওয়া পর্যন্ত দিয়ে যাবে। বারান্দায় বসে মা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে সাত্ত্বিক মনে আমি আহার করব। আহার নয়, আহূতি। আহার করো মনে করো আহূতি দি শ্যামা মাকে।'

ব্রজেন কুস্তিগীর। পাঁচশো ডন আর হাজার বৈঠক মারে। যেমন তার শরীর, সেইরকম তার আহার। সুমনের জ্যাঠাইমা আর হরিদা মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসেন। সুমন ইচ্ছে করেই খায় না। একবার বাথরুমে যেতে তার জীবন বেরিয়ে যায়। হরিদা আর জ্যাঠাইমা মহা উৎসাহে চলে গেলেন ব্রজেনের আহারের ব্যবস্থা করতে।

ব্রজেন বললে, 'চল বারান্দায় গিয়ে বসি। সামনে মা গঙ্গা আর তুই বসে আছিস ঘরে। রাখ তোর বই। এইবার একটু পৃথিবীর দিকে তাকা।'

সুমন বললে, 'তুই গিয়ে বোস, আমি আসছি।'

'তোমার চালাকি আমি বুঝেছি। আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কিসের। সত্যি কথা বলব, তোকে আমি নিজের ছেলে বলে মনে করি। চল।'

ব্রজেন সুমনকে পাঁজাকোলা করে তুলে বারান্দার আরামচেয়ারে বসিয়ে দিল। একটা ছোট জলচৌকি এনে সুমনের পায়ের কাছে রেখে,

তার পা দুটো তুলে দিল। সুমন হাত জোড় করে নমস্কার করল।

ব্রজেন বললে, 'নমস্কার করলি কেন?'

'তুই যে আমার পায়ে হাত দিলি।'

'বললুম না, তুই আমার ছেলে।'

'ছেলে যখন, বাবাকে নমস্কার করতেই পারে।'

'রেখা আসতে পারে। আসবে বলেছে।'

'রবিবার তার পক্ষে আসা অসম্ভব। ওদের অনেক আত্মীয়স্বজন। ববিবার ওদের একেবারে ফুল হাউস।'

'দেখা যাক। বলেছে আসবে।'

'সুস্থ জগৎ ছেড়ে সে কেন অসুস্থ জগতে আসবে বল।'

ব্রজেন হঠাৎ উদাস হয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশ গোলাপি লাল। পাখির একটা মালা উড়ে চলেছে, পূব থেকে পশ্চিমে। তাদেব কিচকিচ শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ব্রজেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তোদের এই বাড়িটার দশ লাখ টাকা দাম হওয়া উচিত।'

'এখানে বসলে মনে হয় বেনারসের কোনও আশ্রমে বসে আছি।'

'বেনারসে গেছিস?'

'কোথায় যাবো আমার এই পা নিয়ে।'

'তা হলে প্রস্তুত হও, এই শনিবার আমাদের কলেজ বন্ধ হচ্ছে। রবিবার আমরা পুরী যাব।'

'আমরা তিনজনে। তুই আমি আর রেখা।'

'পাগল হয়েছিস? পথে নারী বিবর্জিতার মতো পথে পঙ্গু বিবর্জিত।'

ব্রজেন গম্ভীর মুখে চেয়ার চেড়ে উঠে পড়ল, 'তুই বোস, আমার একটা কাজ আছে।' হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

ব্রজেনের গম্ভীর মুখ আর কথা বলার ধরন দেখে, সুমন 'সে কী।' বলে তাড়াতাড়ি উঠতে গেল। ভুলেই গেল যে, তার পা দুটো অচল। বেকায়দায় হুড়মুড় করে কাত হয়ে পড়ল এক পাশে। আরামকেদারার হাতলে ডান হাতটা ঘষে গিয়ে বেশ অনেকটা জায়গায় ছাল উঠে গেল। সুমন 'উঃ' করে উঠল। ব্রজেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সুমনকে সোজা করে বসাতে গিয়ে দেখল বিজ্ বিজ্ করে রক্ত ফুটে উঠছে সাদা জায়গাটায়।

ব্রজেন 'ইস' করে উঠল। 'তুই হঠাৎ ওইভাবে উঠতে গেলি কেন? দেখ তো হাতটার কি অবস্থা হল। ছিঃ ছিঃ।'

'তুই হঠাৎ চলে যাবো বললি কেন?'

'রাগ করে। তুই পঙ্গু বললি কেন নিজেকে?'

ব্রজেন ছুটছিল, ওষুধ আর তুলো আনতে। এমন সময় রেখা উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে। ব্রজেন বললে, 'যা বেটি, তোর কাজ বাড়িয়ে বসে আছি। জ্যাঠাইমার কাছ থেকে তুলো আর কাটার ওষুধ নিয়ে আয়। কোনও প্রশ্ন করবি না। যাবি আর আসবি। দৌড়ো।'

সুমন বললে, 'কেন ব্যস্ত হচ্ছিস। সারাদিনে আমার অমন ঠুকঠাক কত লাগে। আমার জীবনের এইটাই তো পুরস্কার।'

'চুপ। একটাও কথা বলবি না।' বলেই ব্রজেন ফেঁদে ফেলল, 'আমার জন্যেই হল।'

'কেন তুই অমন করছিস।'

'চুপ, তুই কেন অমন করছিস?'

সুমন হাহা করে হেসে বললে, 'পাগলা। কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বললে, সে কি সত্যিই পদ্মলোচন হয়।'

রেখা তর তর করে ওপরে উঠে এল। হাতে তুলো আর লাল ওষুধ। রেখাকে আজ অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। নীল ফিনফিনে শাড়ি। চুল শ্যাম্পু করেছে। এক ঢল সিল্কের চামরের মতো চওড়া পিঠে পাশ ফিরছে। সোনার ফ্রেম যেন আজ আরও সোনালি। সুমন এক ঝলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। মাঝে মাঝে একটু দুর্বলতা এসে যায়। যতই হোক পুরুষ তো! নিজেকে শাসন করে, 'তুমি পঙ্গু। তোমার আবার প্রেম কি! পৃথিবীর কোনও মেয়ে নিতান্তই বাধ্য না হলে তোমাকে স্বামী করবে না। এক যদি তোমার অঢেল পয়সা হয়, তা হলে পয়সার লোভে কোনও মেয়ে স্ত্রীর অভিনয় করার জন্যে এগিয়ে আসতে পারে।'

রেখা চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সুমনের হাতটা দেখতে দেখতে বললে, 'বাঃ বেশ করেছ। তোমার কোনও তুলনা নেই। তোমার তুলনা তুমিই। একটু যে জ্বালা করবে সোনা। সহ্য করো। কি করে করলে।'

সুমন বললে, 'ভুলে গিয়ে।'

'ভুলে গিয়ে হাতের ছাল ছাড়িয়ে ফেললে। হাতটাকে কি সবেদা

ভেবেছিলে?'

'আরে না, ভুলে গিয়েছিলুম, আমি একটা অথর্ব পঙ্গু। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেলুম কাটা কলাগাছের মতো।'

ব্রজেন দু হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বললে, 'এই পঙ্গু শব্দটা শুনলে আমার মাথায় খুন চেপে যায়। আই ফিল সিক।'

কচুরি ভাজার গন্ধে বাড়ি ভরে গেল। ব্রজেনের মনও প্রসন্ন হয়ে উঠল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে গাইতে লাগল—'লাইফ ইজ নাথিং বাট ফ্লোটিং কচুরিপানা। মাইনাস পানা, এ বড়িয়া খানা, ডিললিসাস কচুরি। মাইনাস ক ইট ইজ চুরি। দি ওয়ার্লড ইজ এ গেম অফ চুরি।—ও চুরি, ও মাই কচুরি। ট্রালা, লালা। জিভে আসে লালা। খেয়েদেয়ে পালা। ট্রালা। লালা।'

রেখা বললে, 'এটা তোমার কচুরির গান?'

'ইয়েস। সেট ইন রাগ তিলক-কামোদ। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে কচুরি সহযোগে গাইবার বিধান।'

রাত সাড়ে আটটায় সুমন একেবারেই বেঁকে বসল, 'পুরী আমি যাবো না। তোদের আনন্দ আমি নষ্ট করতে পারবো না কিছুতেই। সবচেয়ে বড় কথা, হুইলচেয়ার ছাড়া আমি একেবারেই অচল। একগুঁয়েমি করলে তো হবে না। বাস্তবটা একবার দেখ।'

ব্রজেন বললে, 'তুই একটা গর্দভ। হাওড়া স্টেশান অব্দি আমরা ট্যাক্সিতে যাবো। হুইলচেয়ারটা লাগেজ ভ্যানে বুক করে দোবো!'

'তুই আমার চেয়েও গাধা। হুইলচেয়ারটা হাওড়া স্টেশন অব্দি যাবে কি করে। ট্যাক্সির পেছনে ঢুকবে না! সেটা একবার ভেবে দেখেছ।'

ব্রজেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বেশ, তুমি তোমার এই বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে নিমতলার সামনে দিয়ে তোমার চেয়ার গাড়িতে যাবে। আমি তোমার পাশে পাশে সাইকেলে যাব। রেখা রেখার বাড়ি থেকে গাড়িতে চলে যাবে। স্টেশানে আমার আখড়ার ছেলেরা যাবে। আমার সাইকেলটা তাদের সঙ্গে ফিরে আসবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে কামরা, আমরা তোমাকে টুক করে তুলে দোব। সোজা ব্যাপার।'

'এত হাঙ্গামা করে কেন আমি যাবো বলতে পারিস?'

'এই কারণে যাবে, তুমি না গেলে আমাদের আনন্দ মাঠে-মারা যাবে। আমি ফার্স্টক্লাস টিকিট কাটবো। কামরায় বেশী লোক থাকবে না। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

রেখা সুমনের চেয়ারের পেছন দাঁড়িয়েছিল। চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, 'তোমাকে যেতেই হবে। এবার আর তোমাকে ছাড়ব না আমরা।'

'পুরীতে গিয়ে চুপ করে বসে থাকাও যা, আর আমাদের এই বারান্দায় বসে থাকাও তাই।'

ব্রজেন বললে, 'আজ্ঞে না। এক নয়। এখানে তোমার চোখের সামনে গঙ্গা, ওখানে তোমার চোখের সামনে সমুদ্র। সকালে তোমাকে তোমার গাড়িতে বসিয়ে, সমুদ্রের বালিতে নিয়ে যাব। তোর দু'পায়ের ওপর ঢেউ খেলে যাবে। চারপাশে ঝিনুক ছড়িয়ে যাবে। আমরা তো সমুদ্রের ধারেরই একটা হোটেলে থাকবো।'

ব্রজেন নেমে গেল নিচে জ্যাঠাইমার সঙ্গে খুনসুটি করতে। রেখা সুমনের চেয়ারের হাতলের পাশে বসে আছে হাঁটুগেড়ে লক্ষ্মীমেয়ের মতো। ফর্সা ধারালো মুখ। আলোয় চকচক করছে মুখ, জ্বলজ্বল করছে সোনালী চশমা। শাড়ির পবিত্র নীল রঙ। পিঠে দুলছে রেশমি চুলের কবিতা।

রেখা সুমনের লাল ওষুধ মাখানো হাতটা দেখতে দেখতে বললে, 'ইস্, কতটা জায়গা ছড়ে গেছে! তোমার কাছ ছেড়ে আমার আর যেতে ইচ্ছে করে না সুমন। তুমি বড় অসহায়। আমার ইচ্ছে করে তোমাকে ঘিরে থাকি। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সায়েবের সেই প্রার্থনা মনে পড়ে— Give us grace that we many cast away the works of darkness, and put upon us the armour of light. ইচ্ছে করে তোমার আরমার অফ লাইট হই।'

রাত তখন কত হবে? নটা। আনন্দের হাটবাজার ভেঙে ব্রজেন আর রেখা চলে গেল। হু হু করে একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা এল গঙ্গার দিক থেকে। সুমনের ঠিক পাশের ঘরে শোন হরিদা। ঘরে একটা খাট থাকলেও হরিদার ভূমি-শয্যা। মেঝেতে পাতলা একটা তোষক। তার ওপর কি শীত,

কি গ্রীষ্ম, একটা কম্বল। বিছানা পাতার ধুপধাপ শব্দ। জ্যাঠাইমা নিচেই থাকেন। একতলাতেই তাঁর সুবিধে। এবারে কাজের মেয়েটি আসে। দরজা খুলতে হয়।

হরিদা বিছানা পাতা শেষ করে সুমনের ঘরে এসে বললেন, 'আজ আর বেশি রাত করো না। অনেকক্ষণ ঠায় একভাবে বসে আছি। এইবার বিছানায় একটু লম্বা হও।' তারপর রোজ যা বলেন, সেই কথাটি বললেন, 'আমি পাশেই আছি। প্রয়োজন হলেই ডাকবে।'

সুমনের আজ পর্যন্ত একদিনও প্রয়োজন হয়নি। হলেও ডাকেনি কোনও দিন। সুমন জানে একদিন তার পাশে কেউই থাকবে না। নিজের অক্ষমতাই হবে তার চির-সঙ্গী। কেউ হয়তো করুণা করবে। দয়ার আর এক রূপ করুণা। সে খুব ক্ষণস্থায়ী। প্রজাপতির মতো ক্ষণজীবী। রঙিন ডানা মেলে উড়ে আসে, পরক্ষণেই উড়ে চলে যায়।

গঙ্গার ওপারে কোথাও একটা পেটা ঘড়ি আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজে। চলমান সময়ের বার্তা কাকে যে শোনাতে চায়। কোন মৃত্যুপথযাত্রীকে। নিজের সন্তানের মৃত্যুর খবর নিজেই শোনে কান পেতে। মুহূর্ত হল সন্তান। সেকস্‌পীয়ারের কটা লাইন সুমনের ভীষণ প্রিয়,

And so, from hour to hour we ripe and ripe/
And then from hour to hour we rot and rot/
And thereby hangs a tale.

ওপারের পেটা ঘড়ি জানিয়ে দিল, সুমন, রাত্রির মধ্যযাম। এইবার তুমি শুয়ে পড়। এই সময়টায় সুমনের মনে অদ্ভুত, অলৌকিক সব চিন্তা আসে। পূবদিকের দেয়াল ভেদ করে হঠাৎ যদি এক মহাপুরুষ এসে দাঁড়ান। আলোয় আলোকময় হয়ে। তিনি এসে ডাকছেন সুমনকে, 'উঠে এস। আমার কাছে এস।' সুমন অমনি খাট থেকে নেমে তর তর করে এগিয়ে যাবে। পা দুটো তার সুস্থ, সবল হয়ে যাবে নিমেষে। কোথায় কৃষ্ণ?

কুব্জার চিবুক ধরে সোজা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে গেলেন সুন্দরী সরলা। সে কি আর এ যুগে হয়!

সুমন তার পা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। চাদরের ওপর পড়ে আছে, শীর্ণ, শক্তিহীন। সুমন নিজের পায়েই নিজে হাত বুলোয়। কত মালিশ! কত ব্যায়াম! কিছুতেই কিছু হবার নয়। তবু সুমন এই সময়টায় অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করে। প্রার্থনায় তো কত কিছুই হয়, বিশ্বাসেও তো কত কিছু হয়! মহামানবরা বলে গেছেন। আন্তরিক কান্নায় না কি ঈশ্বর সাড়া দেন। এই দেহ তো তাঁর। কোনও ডাক্তারবদ্যির নয়। সে যদি একটু হাঁটতে পারত। তার পৃথিবীটা কত বড় হয়ে যেত!

সত্যি সুমন কেঁদে ফেলে। বুকের কাছে তার হাত দুটো জোড় হয়ে আছে। দু'গাল বেয়ে জল ঝরছে! ঈশ্বর! তুমি যদি কোথাও থাকো, আমার এই প্রার্থনায় সাড়া দাও। ধন নয়, জন নয়, মান নয়। দুর্বল হলেও চলাফেরার মতো দুটো পা কেবল চাইছি। বাকিটা আমি নিজেই অর্জন করে নোবো। এক দার্শনিক বলেছিলেন ঃ Does it matter fosing your legs For people will always be kind তোমার কথা মানতে পারছি না, সাসুন সিগফ্রায়েড। তোমার পৃথিবী আর নেই।

সুমন বহুক্ষণ ধরে তার দুটো পায়ে হাত বোলাল। হঠাৎ অলৌকিক একটা কিছু যদি হয়ে যায়। প্রবল একটা ইচ্ছাশক্তি চারিয়ে দেবার চেষ্টা করল নিজের শীর্ণ পা দুটোয়! সৃষ্টিও তো তাঁরই ইচ্ছা। তিনি একদিন বললেন, 'লেট দেয়ার বি লাইট, দেয়ার ওয়াজ লাইট।'

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো'

সুমন রবীন্দ্রনাথের গোটা কবিতাটা আবৃত্তি করল। তারপর খাটের পাশে পা দুটো ঝুলিয়ে, খাট ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল বারে বারে। মনে মনে বলতে লাগল, 'পারবে তুমি পারবে। তোমাকে পারতেই হবে। এক ঝলক রক্ত, শিরা বেয়ে নেমে যাও পায়ের দিকে। একবার মাত্র, একটি স্রোত। তাহলেই হয়ে যায়। আমি তাহলে দরজা খুলে বেরিয়ে টকটক করে চলে যাব বারান্দায়। সিঁড়ি ভেঙে ছাদে যাবো। আমি নাচবো।

আমার ভীষণ নাচতে ইচ্ছে করে ভগবান। কাল সকালে ট্রাম ধরে আমি নতুন বাজারে যাবো। ইচ্ছে মতো বাজার করব। মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে চা খাবো। পুরীর সমুদ্রে গিয়ে বেলাভূমিতে ছোটাছুটি করব।' সুমন গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে। শেষে আর পারল না। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল খাটে।

অবশেষে সুমন বসে বসেই এগিয়ে গেল রাস্তার দিকের জানালার ধারে। দু'হাতে গরাদ ধরে উঠে দাঁড়াল। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। তবু সুমন দাঁড়িয়ে রইল। নিচে রাস্তা। কেউ কোথাও নেই। একজন মাতাল, সুমন লোকটিকে চেনে। পা টেনে টেনে কোনওরকমে টাল খেতে খেতে কোথাও একটা যাবার চেষ্টা করছে। মাতালটার অবস্থা তার চেয়ে সামান্য ভাল। তবু সে দাঁড়াতে পেরেছে। সুমন আর পারল না। বসে পড়ল ধপাস্ করে।

সামনে খোলা জানালা। মিশকালো আকাশে গোটা গোটা তারা। জায়গায় জায়গায় সাদার ছোপ। আকাশের গায়ে অলৌকিক আলোর রহস্য সুমনের জানা নেই। একটুপরেই ভোর হবে। কই, কোনও পাখি তো তার মতো বিকলাঙ্গ হয় না। কোনও কাঠবেড়ালি। কি রাস্তার কোনও কুকুর?

কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পর সুমন নিজের ভাগ্যকে মেনে নিল। এইবারটা এই ভাবেই তাকে কাটিয়ে যেতে হবে। সুমন আবার বসে বসেই ফিরে এল খাটে। শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে। ভাবতে চেষ্টা করল সেই দিনের কথা, হরিদা নেই, জ্যাঠাইমা নেই। সে একা। কে যাবে ব্যাঙ্কে। কে যাবে বাজারে। কে ছুটবে রেশনের দোকানে। কে রাঁধবে। প্রচুর টাকা চাই! মাইনে করা লোক রাখতে হবে। অধ্যাপক সে হয়তো হতে পারবে। অনামী অখ্যাত কোনও কলেজের। কিন্তু ক্লাস নেবে কি করে! তারপর ছেলেদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। বলবে, ল্যাংড়া স্যার।

সুমন খানিক এ-পাশ, ও-পাশ করে উঠে পড়ল। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে পড়তে বসে গেল। অসাধারণ ফল করতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সুমনের মনে হল দৃশ্যটা অসাধারণ। সে চলেছে, তার দুপাশে দুই সাইকেল আরোহী। ব্রজেন আর ব্রজেনের এক বন্ধু অসীম। খানাখন্দ, জ্যাম সব পেরিয়ে অবশেষে হাওড়া স্টেশান। সেখানে অপেক্ষা করছে ব্রজেনের বিশাল বাহিনী। যেন কোনও মহারাজা বিদেশ ভ্রমণে চলেছেন। রেখাও এসে গেছে। শাড়ি নয়, সালোয়ার-কামিজ পরেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে কোনও বিদেশিনী। স্টেশান আলো করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবির মতো সব কাজ হয়ে গেল। সুমনকে কম্পার্টমেন্টে তুলে দিয়েই সবাই ছুটল লাগেজভ্যানে গাড়ি বুক করতে। সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। ট্রেন ছাড়ল পাঁচ মিনিট লেট করে। কম্পার্টমেন্টে ওরা তিনজন। চতুর্থজন মুখ ভারি, এক হোমরা-চোমড়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচয় বেরল, তিনি একজন চিত্রপরিচালক। পুরীতে লোকেশান দেখতে চলেছেন তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে। উল্টোদিকের আসনে বসে একটা ইংরিজি নভেল পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। পারছিলেন না। না পারার কারণ রেখা। রেখার রূপ যে-কোনও মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। তায় ভদ্রলোক আবার চিত্রপরিচালক। চিত্রজগতের মানুষদের নারীপ্রীতি একটা অসুখের মতো। দেখার চোখটা বড় বেশি তো।

ব্যর্থ চেষ্টা ফেলে অবশেষে তিনি নিজেই আলাপ জুড়লেন। মনুষটি তেমন খারাপ নন। সুসংস্কৃত, ভদ্র। রসিক। নিরহঙ্কারী। আলাপ জমে উঠতে খুব একটা সময় লাগল না। হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি। এই মেয়েটির মধ্যে নায়িকা হবার সমস্ত গুণ আছে। প্রথম হল রূপ। সরাসরি তো তাকানো যায় না। বইয়ের আড়াল থেকে প্রোফাইলটা দেখছিলুম। সাংঘাতিক ফোটোজেনিক ফেস। দ্বিতীয় হল শিক্ষা। তৃতীয় হল উচ্চারণ। আমি অনেককে নায়িকা করেছি। তাদের এর সিকির সিকি গুণ ছিল না। মেকআপ আর ক্যামেরার কারসাজিতে নায়িকা। অভিনয় মোটামুটি। সাহস করে যে কথাটা বলতে চাই, তুমি আমার এই ছবিতে নায়িকা হবে? বলো। তাহলে এই ট্রেনে এখুনি এগ্রিমেন্ট হয়ে যাক।

আর একটা ভয়ঙ্কর আশ্চর্য ব্যাপার, সুমনের মতো একজন চরিত্র আমি হন্যে হয়ে খুঁজছিলাম।'

ব্রজেন বললে, 'তার মানে? রেখাকে খোঁজার একটা মানে হয়। ও হল আমাদের স্বপ্ন। ফিল্মে আপনারা যাকে বলেন ড্রিমগার্ল। সুমন তো ঠিক সেইরকম নয়।'

'আরে যোগাযোগটা তো ভারি অদ্ভুত। আমার স্টোরিটা তো ফ্যান্টাস্টিক। থিমটা হল প্রেম। এক ক্রিপল্ড পেন্টার ও একটি মেয়ে। মেয়েটি তার গুণমুগ্ধ প্রেমিকা। লোকেশান হল সমুদ্রের ধারের ছোট্ট একটি কটেজ।'

সুমন বললে, 'আমার কোয়ালিফিকেসান হল ক্রিপল্ড।'

ভদ্রলোক জিভ বের করে বললেন, 'ছি ছি, অমন কথা বলো না। তোমার ওই গ্রিসিয়ান কাট ফেস, তোমার ওই ব্যক্তিত্ব, তোমার কালচার ক'জনের আছে। রেয়ার কম্বিনেশান।'

'আপনার ছবির পর আমি আর ছবি পাবো?'

'দ্যাটস এ কোয়েশ্চেন। পর পর রোল পাওয়া মুশকিল হবে। এক যদি পর পর স্টোরি লেখানো যায় সেইভাবে।'

ব্রজেন বললে, 'ভিলেনের কোনও রোল নেই?'

'হিন্দি হলে থাকতো, বাঙলা তো! বাঙলায় ভিলেনি তেমন আসে না। বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী। ভীষণ ট্র্যাজিক।'

'মানে নায়ককে খতম করে দিলেন।'

'ভাই খমত শব্দটা ব্যবহার করো না, যেমন আনরোমান্টিক, তেমনি ভালগার। প্রেমিকের মৃত্যু কি রকম জানো, একটা সুন্দর ফুল নিঃশব্দে ঝরে পড়ল সবুজ ঘাসের ওপর। ফুলটা আবার কি ভাবে পড়ে গেল! একটি ভ্রমর এসে বসতে গেল। সেই শূন্যতায় ভ্রমরটি কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করে চলে গেল। এই হল মৃত্যু। আমার স্টোরির শেষটা ফ্যান্টাস্টিক। তোমরা ভাবতে পারবে না। বিয়ন্ড ইম্যাজিনেশান। সি-বিচে একটা ইজেল। ইজেলে ফ্রেমে আঁটা একটা ক্যানভাস্। আমার নায়ক হুইলচেয়ারে বসে ছবি আঁকছে। সময়টা ভোরের একটু পর। সোনালি আকাশ। সবুজ সমুদ্র সমানে ফুঁসছে। ফেনায় ভোরের হাসি ভাঙছে। শিল্পী সেই চপল সমুদ্রকে ধরার চেষ্টা করছে। আকাশ নেমেছে। দিগন্তে পিঙ্ক রঙ চাপানো হয়ে

গেছে। সবুজ সমুদ্রে ঢেউ, তাও হয়েছে। ছবি প্রায় সম্পূর্ণ। শিল্পী তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিক। বাতাসে মাঝে মাঝে জলকণা এসে চোখে মুখে লাগছে। একটা ঘোর। একটা আচ্ছন্নের ভাব। বিশালের সামনে ক্ষুদ্র এক মানব। তাও আবার অক্ষম। যার সারাটা জীবনই কাটে হুইলচেয়ারে। হঠাৎ হাতের তুলি ফেলে শিল্পী তার হুইলচেয়ার নিয়ে জলের দিকে এগোতে লাগল। কাছে, আরও কাছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে চেয়ারের চাকায়। শিল্পী জলে নেমে যাচ্ছে যেন নেশার ঘোরে। হঠাৎ বিশাল এক ঢেউ এসে শিল্পীকে গ্রাস করে নিল। সমুদ্রের জোয়ার এসেছে। ইজেল উলটে গেল। ছবিটাকে নিয়ে খেলা করছে ঢেউয়ের ফেনা। সমুদ্রের কোলে সমুদ্রের ছবি দোল খাচ্ছে। দৃশ্যটা একবার ভাব তুমি।'

ব্রজেন বললে, 'অসাধারণ, তবে প্রশ্ন আছে কয়েকটা। এত সব কাণ্ড হল, সমুদ্রসৈকতের কেউ তাকে বাঁচাতে গেল না!'

'এটা হল প্রাইভেট বিচ। তার কটেজের পেছনে। ভোরবেলা সাধারণত কেউ যায় না সেদিকে।'

'বেশ, তা আত্মহত্যা করল কেন? প্রেমে ব্যর্থতা?'

'না, সেও এক অসাধারণ ব্যাপার। প্রেমের সাফল্যে সে বেছে নিল মৃত্যুকে।'

'সে আবার কি!'

'ওই তো! ওইটাই গুতো আমার স্টোরির বিউটি। সুন্দরী নায়িকা শিল্পীকে বিয়ে করবেই। করবেই করবে। শিল্পী তার প্রেমিকাকে সত্যিই ভালবাসে। সে তার জীবন নষ্ট হতে দেবে না। বিকলাঙ্গ একটি মানুষকে বিয়ে করা মানেই লজ্জা। সে তো বুক ফুলিয়ে তার স্বামীর পরিচয় দিতে পারবে না। স্বামী হবে তার জীবনের লজ্জা। প্রেমিকার পথ থেকে সরে না গেলে তার মোহ তো কাটবে না। শিল্পী তাই স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিল।'

রেখা বলল, 'এইরকম হয় না কি?'

'এই তো হচ্ছে। ছবিটা বেরলেই দেখতে পাবে। হিট তো করবেই। করতে বাধ্য। বারোখানা গান আছে। প্রায় পনের মিনিটের একটা শট আছে, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের ফুটবল খেলার। মিউজিক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।'

ব্রজেন বললে, 'এর মধ্যে ফুটবল আসে কি করে! এই তো বললেন,

প্রেমের ছবি।'

'ওই পনের মিনিট একটা সাংঘাতিক জায়গা। বাইশটা খেলোয়াড় সবল পায়ে বল নিয়ে ছুটছে, আর নায়ক তার অক্ষম পা নিয়ে বসে আছে গ্যালারিতে। মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশব্যাকে তার শৈশব আসছে; যখন তার পা দুটো ছিল। স্কুলের মাঠে বল নিয়ে ছুটছে সেন্টার ফরোয়ার্ড লাইনে। এই শট থেকে আমরা কাট করে চলে যাচ্ছি, দক্ষিণ ভারতের বিশাল এক মন্দিরের সামনে। ধাপে ধাপে উঠে গেছে চওড়া সিঁড়ি। তার সামনে হুইলচেয়ারে নায়ক। এই দৃশ্যে সাংঘাতিক একটা স্তোত্রসংগীত আছে। মন্দিরের ভেতর থেকে আসছে। হঠাৎ মন্দিরের সিঁড়ির ধাপে পর পর এসে দাঁড়াল একদল সুঠাম চেহারার নর্তকী। ক্যামেরার চোখ বেশিরভাগ সময়েই থাকবে তাদের পায়ের ওপর। পা হল ছন্দ, গতি, কবিতা।'

সুমন বললে, 'এইবার আমরা শুয়ে পড়ি।'

রেখা জানে, সুমনের এই আলোচনা ভাল লাগছে না। ভাল লাগার কথাও নয়। প্রসঙ্গটা ঘুরেফিরে ওই জায়গায় চলে এসেছে। কারোরই দোষ নেই। অদ্ভুত এক যোগাযোগ। ভদ্রলোক যে ছবিতে হাত দিতে চলেছেন সেই ছবির নায়ক সুমন। কেউ জানে না, নায়িকা কিন্তু রেখাই। ছবির পরিণতির মতো সুমনের পরিণতি হবে না তো! রেখা একটু অস্বস্তি বোধ করল। বাড়িতে যত আপত্তিই হোক, সে সুমনকেই বিয়ে করবে। এই সঙ্কল্প থেকে তাকে কেউ টলাতে পারবে না। মানুষের ভেতরটাই তো সব। সুমনের ভেতরটা মন্দিরের মতো। সেখানে সব সময় বিষাদের একটা আরতি চলেছে।

স্টেশানে ট্রেন ঢুকল। খুব কায়দা করে সুমনকে নামিয়ে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসানো হল। নামাবার সময় রেখা আড়াল করে রইল। লোকজন তাকালে সুমন একটু অস্বস্তি বোধ করে। বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করে করে সে এই মানসিকতায় এসে পৌঁছেছে। সুস্থ, সক্ষম মানুষের অসভ্য অহঙ্কারে ভরা পৃথিবী থেকে সে দূরে থাকতে চায়। কোন গুহা কি অরণ্যবাসী হতে পারলে সে সুখী হয়। রেখা সুমনের পাশে বসল। ব্রজেন চলে গেল তার হুইলচেয়ার ছাড়াতে।

পরিচালক ভদ্রলোক যাবার আগে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ হোটেলে

উঠছ?’

রেখা বললে, ‘সমুদ্রের ধারে আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি। ব্রজেনই ঠিক করেছে। কোথায় কোনদিকে, সে ও-ই জানে।’

‘দেখা হওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল। আমার ঠিকানাটা জেনে রাখ, ভিক্টোরিয়া লাভ। অবশ্যই দেখা করবে। আমার অনুরোধ। আগেই বলে রাখি, আমি চোর-জোচ্চর-লম্পট-বদমাশ নই। মেলামেশা করলেই বুঝতে পারবে, সিনেমা আমার একটা প্যাশান।’

ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সুমন বললে, ‘মানুষটা ভালই। আর গল্পটা আমার জীবনেরই গল্প।’

রেখা বলল, ‘শেষটা বদলাতে হবে। এসকেপিস্ট। নায়ক মরতে পারে না। প্রেম মানুষকে বাঁচতে শেখায়। লাভ ইজ লাইফ ফোর্স।’

‘আমার মতে শেষটা খুব সুন্দর। কারণ প্রেম মানুষকে মরতে শেখায়। দেশপ্রেমে তাজা প্রাণ শহীদ হয়। ভালবেসেই মানুষ আত্মহত্যাও করে। কখনও হত্যাও করে। মৃত্যুকে ভালবাসতে না পারলে প্রেমিক হওয়া যায় না।’

ব্যস্ত লোকজন। হইচই। সুমন মুখে একটা আক্ষেপের শব্দ করে বললে, ‘সবাই কেমন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে, আমিই কেবল পরাধীন। আমার জন্যে তোমরাও আটকে গেলে। এতক্ষণে তোমরা কোথায় চলে যেতে।’

‘সুমন, আমি কিন্তু এইবার সত্যিই রেগে যাচ্ছি। তোমার মনটাকে তুমি পা থেকে মাথায় তুলবে কি না! জীবন যা দিয়েছে তাই নিতে শেখ না সুমন।’

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর সুমনের চেয়ার নিয়ে ব্রজেন এল। ফর্সা মুখ লাল। চেয়ারটা সামনে রেখে বললে, ‘কি অব্যবস্থা! অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে আর কিছু নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় সব ব্যাটাকে আড়াই প্যাঁচ মেরে উলটে ফেলে দি। মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুব কঠিন কাজ।’

বাড়িটা ভারি সুন্দর। দোতলা। পেছনে পাঁচিল। বাতাসে সমুদ্রের বালি উড়ে উড়ে এসেছে। বছরের পর বছর। বাইরে পাঁচিলের সমান উঁচু বালিয়াড়ি তৈরি হয়েছে। পাঁচিল উপচে চলে এসেছে ভেতরের জমিতে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একতলাটা প্রায় বালির তলায় চলে গেছে। জানালা

খোলার উপায় নেই। সারাদিন ঝুরঝুরু শুধু বালির শব্দ। অদূরে সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস। অনেক দূর থেকে ছুটে আসা ক্লান্ত ঢেউ দেহভার ছুঁড়ে দিচ্ছে বালির বিছানায়।

ব্রজেন আর রেখা বাজারে গেছে কেনাকাটা করতে। ফিরে এসে রান্না চড়াবে। সুমন একা বসে আছে সমুদ্রের দিকের বারান্দায়। পা দুটো তার নিশপিশ করছে। দূরে নীল আকাশের তলায় ঝলমলে রোদে শিশুর মত নাচছে সমুদ্রের সাদা ঢেউ। কেবলই মনে হচ্ছে, বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ছুটে চলে যায় সমুদ্রের কাছে। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিহি নূপুরের শব্দের মতো বালি ঝরার শব্দ।

কলকল, খলখল শব্দ করতে করতে রেখা আর ব্রজেন ফিরে এল মালপত্রের লটঘট নিয়ে। রেখা সুমনের কোঁকড়া চুল নেড়ে দিয়ে বললে, 'জানি, কি ইচ্ছে করছে? চা চা করছে তোমার মন। দাঁড়াও, এখুনি করে দিচ্ছি, আগে রেলগাড়ির কাপড়টা বদলাই।' রেখা হুটপাট করে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ব্রজেন একে একে সব জিনিসপত্র বাজারের ব্যাগ থেকে নামাতে শুরু করল। বেশ গুছিয়ে বাজার করেছে। চাল, ডাল, ঘি, তরিতরকারি, কাঠ। ব্রজেন এইসব খুব ভাল পারে। দুইবোনের বিয়ে ব্রজেনই দিয়েছে। বাড়ির বড়কর্তা হবার সমস্ত গুণই তার আছে।

রেখার স্নান হয়ে গেছে। তারে কাচা কাপড় মেলছে। দু হাত তুলে, পেছনদিকে তোয়ালে ঘুরিয়ে সপাৎ সপাৎ করে ঝুল ঝাড়ল। নীল রঙের তোয়ালেটা তারে মেলে দিতেই সমুদ্রের পটভূমিতে যেন মিশে গেল। ভিজে চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। সাদা ব্লাউজের পিঠটা অল্প অল্প ভিজে উঠেছে। কানের পাশে জড়িয়ে আছে ভিজে চুল।

রেখাকে এমন ঘরোয়া সাজে সুমন এই প্রথম দেখল। আঁচল কোমরে জড়ানো। শাড়িটা একটু উঁচু করে পরা।

রেখা দূর থেকে সুমনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'অমন করে কি দেখছ?'

সুমন উত্তর দিতে পারল না। চোখে জল এসে গেছে। রেখা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, এ কি, তুমি কাঁদছ কেন?'

সুমন ঢোঁক গিলে অতি কষ্টে বললে, 'ভীষণ সুন্দর কিছু দেখলে আমার ঈশ্বরকে মনে পড়ে যায়। সৃষ্টিকর্তাকে।'

'সত্যিই তোমার কোনও তুলনা নেই।'

ব্রজেন ফোড়ন কাটল, 'এক কথায় অতুলনীয়।'

আঁচল দিয়ে চোখ মোছাতে মোছাতে রেখা বললে, 'এই ছেলেকে নিয়ে আমি কি করব।'

ব্রজেন বললে, 'বালতি বালতি সমুদ্রের জল এনে মাথায় ঢালব কি!'

রেখা বললে, 'ব্রজেন, তুই বেশ আমার যোগাড়ে। চল, চাটা আগে চটপট করে ফেলি।'

চা আর বিস্কুট খেয়ে সুমন বললে, 'আমাকে কিছু কাজ দে ভাই। বেকার বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

রেখা বললে, 'আমি তোমাকে এখুনি কাজ দিচ্ছি, এই নাও এক থালা চাল, বসে বসে বাছো।'

খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর সবাই মিলে মেঝেতে একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে ঘুমোবার আয়োজন হল।

ট্রেনের ঘুম তেমন সুবিধের হয়নি। সুমন বললে, 'আমাকে একটা চাদর দেবে পায়ে চাপা দোবো।'

রেখা পাশেই শুয়েছিল, ওপাশে ব্রজেন। রেখা আধশোয়া হয়ে উঠে বসল। 'জানো, তোমার একটা বিশ্রী অবসেসান এসে গেছে। সর্বক্ষণ কেবল পা আর পা। মনে করো মানুষের পা বলে কিছু নেই। জানো, সভ্যতা একদিন আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে পায়ের ব্যবহার আর থাকবে না। তুমি ঘুমোও। আমার দিকে আরো সরে এসো। আমাকে পাশবালিশ করো। আমার কাছে তোমার যেন কোনও লজ্জা না থাকে। তোমার বাইরেরটা আমি দেখি না। তোমার ভেতরটাই আমার কাছে সব।'

ব্রজেন বললে, 'হ্যাঁ রে, তোরা কি প্রেম করছিস মা? আমি কি স্থানত্যাগ করব?'

'আজ্ঞে না, এখানে দৈহিক প্রেম হচ্ছে না, হচ্ছে আত্মিক প্রেম। তুমি নির্বোধ বালকটির মতো শুয়ে থাকো শান্ত হয়ে। বিচলিত হবার কোনও

কারণ ঘটেনি বৎস।'

মাথার কাছের জানালা দিয়ে বয়ে আসছে সমুদ্রের হুহু বাতাস। অক্লান্ত ঢেউয়ের পাশ ফেরার শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজনে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে রেখা পাশ ফিরেছে। তার একটা পা সুমনের পেটের ওপর। ফর্সা নিটোল একটা হাত শুয়ে আছে সুমনের বুকে। গভীর প্রশান্তি। ঝুরু ঝুরু বালি উড়ে উড়ে এসে জমা হচ্ছে জানালার পাশে। দেওয়ালের কোণে কোণে। সমুদ্র যেন কবিতা লিখছে সূক্ষ্ম ছন্দে।

রেখা বড় কাজের মেয়ে। পাঁচটার সময় ব্রজেনকে ধরিয়ে দিল এক থালা ময়দা, 'শুকনো শুকনো করে ঠাস ময়ান দিয়ে একচামচে কালো জিরে দিবি।'

নিমিষে এক থালা নিমকি ভাজা হয়ে গেল মুচমুচে। সঙ্গে সোনালি চা। এইবার তারা সমুদ্রে যাবে। যার জন্যে ছুটে আসা।

ব্রজেন সুমনের হুইলচেয়ার ঠেলছে। রেখা চলেছে পাশেপাশে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে।

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে।'

চাকার স্পোকে স্পোকে বালি জড়িয়ে ছিরছিরে জলের মতো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রজেন কখনও বলছে, শ্রীকৃষ্ণের রথ চলছে, কখনও বলছে অর্জুন। কখনও বলছে, কালের যাত্রাধ্বনি শুনিতে কি পাও। যা মনে আসছে তাই বলে যাচ্ছে হই হই করে। এদিককার নির্জন সৈকতে বড় একটা কেউ আসে না। হোটেলপাড়ার দিকের সৈকতে অজস্র মানব বিন্দু। দূরের আকাশ ক্রমশ বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হয়ে আসছে।

সুমন এই প্রথম বিশাল সমুদ্র দেখছে। স্তম্ভিত। কি বিশাল তর্জন গর্জন। ঢেউয়ের কি নৃত্য। তারা একেবারে জলের কিনারায় চলে গেল। দুধের মতো ফেনা ফুটে ফুটে আসছে। ছেঁড়া টুকরো বাতাসে উড়ছে। সব কথা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিল সমুদ্র সফেন।

সুমন তার চেয়ারে বসে আছে রাজা ক্যানিয়ুটের মতো, তার একপাশে

বালিতে ব্রজেন আধশোয়া আর একপাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে রেখা। ঢেউ শুধু ঢেউ। ঢেউ-ভাঙা ফেনা মাঝেমাঝে বৃত্ত রচনা করে তাদের পা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ব্রজেন সুমনকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে একবার বলো?'

'অসাধারণ! নেশা ধরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি যে চোখের সামনে সাদা একটা পর্দা নেমে আসছে। তোদের হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আমার হচ্ছে।' রেখা বললে।

ব্রজেন বললে, 'আমি তো একভাবে তাকাচ্ছি না। ছটফটে নজরে সবই দেখছি। তাই ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তোরা একটু ঘুরেফিরে বেড়া না। আমি একা একটু বসি।'

ব্রজেন বললে, 'আজ্ঞে না চাঁদু। তুমি গল্প হয়ে যাবার তালে আছ।'

রেখা বললে, 'কি যে বাংলা বলিস, বোঝা দায়। গল্প হয়ে যাবে মানে?'

'মানে! ট্রেনে আমাদের সেই ডিরেক্টারের গল্পের শেষটা মনে আছে নিশ্চয়। নায়ক হুইলচেয়ার সমেত সোজা নেমে গেল জলে। ভুলে গেলি না কি।'

রেখা সুমনের ডান হাতটা চেপে ধরে বললে, 'এই। তোমার মাথায় এইসব মতলব খেলছে বুঝি। তাই আমাদের উঠে যেতে বলছ।'

সুমন শব্দ করে হাসল। শীতল একঝলক হাসি।

ব্রজেন বললে, 'তোকে আমি সাফ কথা বলছি, তুই যদি এইরকম করিস, তাহলে তোর চোখের সামনে আমি আত্মহত্যা করব। কোন সৈকতে আমার দেহ তুলে দিয়ে যাবে সমুদ্র, তুই জানতেও পারবি না। আমি সব পারি সুমন। আমার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তোকে আমার লাস্ট ওয়ার্নিং।'

ভীষণ অন্ধকার। তামসী অন্ধকার। অন্ধকার আকাশের তলায় সমুদ্রের চেহারা বদলে গেল। নিষ্করুণ জলধি। ঢেউয়ের উদ্দামতা আরও বাড়ল। ক্ষণে, ক্ষণে জলকণার ঝাপটায় মুখচোখ ভিজে যেতে লাগল। অকস্মাৎ এক বলিষ্ঠ ঢেউ আচমকা ছুটে এসে তিনজনার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। ব্রজেন আর রেখা পিছলে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল সামনে। সুমনের চেয়ার কাত হয়ে পড়েছে একপাশে। সুমন ছিটকে পড়ে আছে অদূরে।

ব্রজেন এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সুমনকে কোলে তুলে নিরাপদ জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এল। রেখা হুইলচেয়ারটাকে তুলে সোজা করল। পেঁছিয়ে নিয়ে এল সুমনের কাছে। ভিজে শাড়ি লেপটে গেছে সারা শরীরে। শাড়ির তলাটা জড়ো করে নিঙড়ে নিল। নোনা গন্ধ। কানের পাশে বালি কিচকিচ করছে। লম্বা চুলে বালি জড়িয়ে গেছে।

ব্রজেন বললে, 'এসেই সমুদ্রস্নান করা হয়নি তো, তাই সমুদ্র রাগ করেছিল। চলো এইবার আমরা ফিরি।'

'সুমন ভিজে গেছে। হাওয়ায় শীত করবে।'

আঁচল নিঙড়ে, রেখা সুমনের চুল আর মাথা, মুখ, ঘাড় যতটা পারে মুছিয়ে দিল।

সুমন বললে, 'তোরা আমাকে সাহস করে একবার জলে ফেলে দে না। ঢেউয়ের ধাক্কায় আর তোলাপড়ায় পা দুটো ভালও হয়ে যেতে পারে। হয় সারবো না হয় সরে যাবো।'

ব্রজেন বললে, 'আবার পা! আয় অ্যাম ফেডআপ।'

সুমন বললে, 'রেখা, তুমি সত্যই সুন্দরী। পরমাসুন্দরী। ওই ডিরেক্টার ভদ্রলোকের অফারটা নিয়ে নাও।'

'আমার স্টার হয়ে দরকার নেই, আমি ঘরের কোণের প্রদীপ হব।'

'দিন পরে যায় দিন।' দেখতে, দেখতে বছর ঘুরে গেল। কলেজ ছেড়ে তিনজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুমন গত একযুগের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। সুমন যখনই যা কিছু পড়তে যায়, মনে হয় আগে কোথাও পড়েছে। এই কথাটা সে রেখাকে একদিন বলেছিল। রেখা বলেছিল, 'পূর্বজন্মের ফল, বুঝেছ! তুমি নিয়ে এসেছ। এইরকম হয় অনেকের। আমরা বিশ্বাস করি না।'

সুমন শেষ পরীক্ষার শেষ পেপার দিয়ে বেরোচ্ছে, সামনেই হরিদা। সুমন একটু থতমত খেয়ে গেল। রেখা আর ব্রজেনেরও একই অবস্থা। হরিদা বললেন, 'বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আজ আর তোমার গাড়ি থাক। ওটার ব্যবস্থা ব্রজেন করবে।'

'কেন হরিদা? কোনও বিপদ?'

'তুমি চলই না। দেরি করো না।'

রেখা বললে, 'আমিও যাব।'

ব্রজেন বললে, 'আমারও যাওয়া উচিত, কিন্তু গাড়িটাই হল সমস্যা।'

সুমন বললে, 'কোনও সমস্যা নেই। তুই ধীরে ধীরে চালিয়ে চলে আয়। আমি জানি কি হয়েছে, জ্যাঠাইমা চলে যাচ্ছেন। জানি না শেষ দেখা হবে কি না।'

সুমনের হুইলচেয়ারে বসে, ব্রজেন প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেল। কলকাতার বিশাল ব্যস্ত রাস্তা। খোলামেলা, মন্থরগামী চক্রযান। গাঁক গাঁক করে পাশ দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। বাতাসের ঝাপ্টা মেরে। ব্রজেন খুড় খুড় করে চলেছে আর ভাবছে, প্রতিদিন সুমনের এই অভিজ্ঞতা হয়।

সন্ধে হয়েছে। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছে। সুমনদের বাড়ির শাঁখ আজ নীরব। নিচের তলার দক্ষিণের ঘরে সাদা ধপধপে বিছানায় জ্যাঠাইমা শুয়ে আছেন শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো। সুমন ঠিক পাশটিতে বসে আছে চেয়ারে। ঘরের চার দেয়ালে ঝুলছে যত দেবদেবীর ছবি। রেখা দাঁড়িয়ে আছে পায়ের কাছে। ব্রজেন ঠিক মাথার কাছে। হরিদা সুমনের মুখোমুখি খাটের ওপাশে। খাটের পাশে চেয়ারে বসে ডাক্তারবাবু। তাঁর হাতে জ্যাঠাইমার নাড়ি। ওঠানামা করছে। কখনও কবজির কাছে, কখনও কনুয়ের কাছে। জ্যাঠাইমার বুকের ওপর তুলসীর মালা। অদ্ভুত এক প্রতীক্ষা। যাবেন। যে কোনও মুহূর্তে যাবেন। জীবন আর মৃত্যুর সীমানায় দুলছে প্রানের পেন্ডুলাম। বুকের মৃদু ওঠাপড়া। তুলোর মতো নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস। সময় এগোচ্ছে। দূরে মদনমোহনের মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজল।

ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই যেন তিনি অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ নাড়ি নেমে এল কবজির কাছে। ক্ষণিকের জন্যে। একবার মাত্র চোখ তুলে তাকালেন সকলের দিকে। অস্ফুটে কিছু একটা বললেন। বোঝা গেল না। মনে হল, রেখা, বললেন। রেখা পা দুটো ধরে আছে। শীতল দু-টুকরো বরফ! রেখা বললে, 'কি বলছ মা? এই তো আমি।'

জ্যাঠাইমা মৃদু হাসলেন। তাঁর চোখ কিছু একটা খুঁজছে। মহাপ্রভুর ছবিতে গিয়ে স্থির হল। ঠোঁটের হাসিটি আর একটু দীর্ঘ হল। সঙ্গে সঙ্গে

চোখদুটো পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'একে প্রয়াণ বলে না, বলে মহাপ্রয়াণ। এত শান্ত মৃত্যু আমি খুব কমই দেখেছি।'

তিনি দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন, 'জপ ধ্যান সত্যই সার্থক হয়েছে।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন, 'কি অদ্ভুত হিসেব। সুমনের পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখলেন।'

সুমন তার মাথাটা জ্যাঠাইমার বুকে রাখল। হৃদয়ের শব্দ আর শোনা যাবে না কোনওদিন। ব্রজেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রেখা মাথা রাখল পায়ে।

হরিদা বললেন, 'এ বাড়ির দেবী চলে গেলেন।'

সুমন মাথা তুলে বললে, 'আমাকে একটু বাইরে নিয়ে চলো।'

দেড়ঘণ্টার মধ্যে শবযাত্রা শুরু হয়ে গেল। সুমন তার হুইলচেয়ারে পেছনে পেছনে চলেছে। চাপা মৃদু হরিধ্বনি। ধূপের গন্ধ। ফুলের গন্ধ। রেখা রয়ে গেল বাড়িতে। হরিদা একাই খঞ্জনি বাজিয়ে নাম গান করতে করতে শববাহীদের আগে আগে চলেছেন। মিছিলটা বেশ বড়ই হয়েছে। সুমন জানে, তার মতো অনেকেই অনাথ হয়ে গেল। এ পাড়ায় কে আর এমন আছে যে নিজের খাবার অন্যের মুখে তুলে দেবে।

সারাটা রাত রেখা একভাবে বসে রইল জ্যাঠাইমার ঘরে। কাজের মেয়েটিও আর সে-রাতে বাড়ি ফিরে গেল না। নিঃশব্দ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত হল। ভোরের দিকে সবাই ফিরে এল শ্মশান থেকে। একজন কম। চিরকালের জন্যে কম। রেখা হিন্দুপ্রথা সবই জানে। আগুন, নিমপাতা, লোহার চাবি সবই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। হরিদা উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখলেন, এক দেবী গেলেন, আর এক দেবী এলেন। যেন কতকালের এক সুগৃহিণী সব কিছুর তত্ত্বাবধান করছে।

রেখা কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ি গেল ব্রজেনের সঙ্গেই। ব্রজেন বলে গেল, 'আমিই সব কেনাকাটা করে আনছি। আপনারা দু'জনে একটু বিশ্রাম করে নিন।' বারোটার আগেই ব্রজেন আর রেখা ফিরে এল। প্রচুর ফলপাকড়, আতপ চাল, ডাল, ঘি, মালসা, পাটকাঠি সব নিয়ে। ব্রজেন তাদের পারিবারিক অস্টিন গাড়িটা আজ নিয়ে এসেছে। ব্রজেনদের

তিনখানা গাড়ি। বাড়িটাও বিশাল। দোল, দুর্গোৎসব হয়। সুমন শুনেছে। যায়নি কোনওদিন। সুমন তার পায়ের লজ্জায় কারোর বাড়িতেই যায় না। তার দিকে তাকালেই সে অস্বস্তি বোধ করে।

রেখা বললে, 'বাড়ির পাট আমি একেবারে চুকিয়ে দিয়ে এলুম।'

ব্রজেন বললে, 'তার মানে?'

'মা, আর বাবাকে বললুম, আমি ঋষির আশ্রমে চললুম। ইচ্ছে হলে ফিরব, না হলে ফিরব না। এই দ্যাখ আমার স্যুটকেস।'

'কোনও আপত্তি হল না?'

'কেন হবে? আমি যে ঋষিকন্যা!'

'সত্যি, পৃথিবীতে তোর বাবামায়ের মতো মানুষ আমি দেখিনি। আমার ইচ্ছে করে পা দুটো জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি। তোর মায়ের সোদপুরের অনাথ আশ্রম কেমন চলছে?'

'বিশাল হয়েছে। দেশে তো একটা সংখ্যাই বাড়ছে, অনাথের সংখ্যা।'

'বাবা আবার কবে বিদেশে যাচ্ছেন?'

'এই তো এলেন।'

'এবার কোথায় গিয়েছিলেন?'

'ভিয়েনা। হেপাটাইটিসের ওপর একটা পেপার পড়ে এলেন।'

সুমন বললে, 'রেখা, তোমাকে আমি কেমন করে বোঝাই ইমপালসে কোনও কাজ কোরো না, পরে ভীষণ অনুশোচনা হয়।'

'বারোটা দিন তুমি কোনও কথা বলবে না। আমরা বলব তুমি শুনবে। আমাকে একদম রাগিয়ে দেবে না।'

হরিদা বললেন, 'মা, আগের জন্মে তুমি আমাদের কেউ ছিলে। আমি এইরকম দেখিনি কোথাও।'

রেখা এক কথায় পুরো সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে নিল। কোথায় কি আছে। কোথায় কি থাকবে। হরিদাকে দিয়ে কুলোপুরোহিতকে ডাকিয়ে আনল। বারান্দায় মাদুর পেতে বসে; প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে নিল, কি করতে হবে। হবিষ্যি কি ভাবে হবে। ঘাট কামানো হবে কবে। শ্রাদ্ধের দিন জেনে নিল। একটা ফর্দও করে দিতে বলল। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, রুক্ষ চুলে এলো খোঁপা। জ্বলজ্বলে চোখে ঝলমলে চশমা। মধুর-ব্যক্তিত্ব।

পুরোহিত মশাই বুঝতে পারছেন না, মেয়েটি কে! আগে তো দেখেননি।

চলে যাবার সময় হরিদাকে একপাশে ডেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কে! এইরকম মেয়ে তো সহসা দেখা যায় না।'

হরিদা এক কথায় সেরে দিলেন, 'দেবী, দেবী। পরে জানতে পারবেন।'

বৃদ্ধ পণ্ডিত মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন। চোখে মুখে বেশ একটা মুগ্ধতার ভাব। সন্ধেবেলা জ্যাঠাইমার ঘরে নামসংকীর্তন বসল। রেখা বলল, 'খঞ্জনিটা আমার হাতে দিন হরিদা।'

'তুমি বাজাতে পারো মা?'

'দেখুন না। পারলেও, পারতে পারি।'

হরিদা ধরলেন খোল। সুমন নিল হারমোনিয়াম। দেখতে দেখতে সঙ্কীর্তন সাঙ্ঘাতিক জমে গেল। রেখার খঞ্জনি বাজানো শুনে সুমন আর হরিদা দু'জনেই অবাক। গানের গলাও অপূর্ব। দু'ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে চলে গেল। সঙ্কীর্তন শেষ হয়ে যাবার পর হরিদা বললেন, 'ভগবান তোমাকে আর কি কি গুণ দিয়েছেন মা?'

'মানুষের স্নেহই মানুষকে গুণী করে হরিদা। আমাকে স্নেহের চোখে দেখছেন তো, তাই আমি গুণী।' কিছুক্ষণের মধ্যেই রেখা ফল কাটতে বসে গেল। জামবাটিতে সাবু ভিজছে। আজ আর অন্য কিছুই খেতে নেই। পুরোহিত মশাই বলে গেলেন, তিনজনেরই অশৌচ।

সুমন বারান্দায় বসে ছিল উদাস হয়ে। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অজস্র চিন্তা। জ্যাঠাইমার কথা ভেবে মাঝে মাঝে জল এসে যাচ্ছে চোখে। পরক্ষণেই রেখার চিন্তা এসে ঢুকছে। অত বড়লোকের সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে কি করতে চাইছে? জীবন নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার! কেন বুঝতে চাইছে না, আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব। বিকলাঙ্গ আমি। লোকে কি বলবে। বছর না ঘুরতেই রেখার মোহ কেটে যাবে। প্রেম পুড়ে যাবে সংসারের উত্তাপে। সুন্দরী মেয়ে। সুস্থ সবল নায়কের মতো কোনও পুরুষ তার জীবনে আসবেই আসবে। আসতে বাধ্য। মেয়েদের মন ঘুরে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। আমি তো এমনিও আহত, তখন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে রেখা সরে পড়বে। এইটাই নিয়ম। সেইটাই স্বাভাবিক। আমি কি

করব ভগবান। আমার মাথায় যে কিছুই আসছে না। আবার আমারও যে খুব লোভ হচ্ছে ভগবান। ত্রিভুবনে যে আমার কেউ নেই। আমি একপা হাঁটতে পারি না। বড় অসহায় আমি। রেখার সেবার যে কোনও তুলনা নেই। তার মুখের দিকে যখনই তাকাই মনে হয় প্রভাতের প্রসন্ন আকাশ।

মেঝেতে খড় বিছিয়ে তার ওপর শতরঞ্চি। তার ওপর কম্বল। সুমনের আজ ভূমিশয্যা। রেখা'ও তাই। সুমন বললে, 'রেখা, তুমি কেন কষ্ট করবে! তোমার ঘুম হবে না। তুমি আমার খাটে শোও।'

'শোবো, ঠিক একবছর পরে।'

'একবছর পরে কেন?'

'যখন তোমার সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক বিয়ে হবে।'

'তুমি কি বলছ? তোমার কি সত্যিই মাথার গোলমাল হয়ে গেল! নিজের জীবন কেউ এইভাবে নষ্ট করে!'

'সে চিন্তা তোমার নয়। সে চিন্তা আমার। অসংখ্য পেরেকের মতো এই পৃথিবীতে তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারব না। বাস্, আর কিছু শুনতে চাও? কোনও কথা নয় আজ। লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে পড়। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে আমাদের।'

রেখা জ্যাঠাইমার ঘরে গিয়ে বিশাল প্রদীপে সারারাত জ্বলার মতো তেল ঢেলে দিল। জ্বালিয়ে দিল একগোছা ধূপ। খাটের মাথার দিকটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। শূন্য বিছানায় শুয়ে আছে সাদা একটি মালা। ঘরের সমস্ত ছবি তাকিয়ে আছে খাটের দিকে। কেউ আর কোনও দিনও বলবেন না, 'আয় রেখা, পেছন ফিরে বোস। চুলটা বেঁধে দি। কি হয়ে আছে, যেন পাখির বাসা। এরপর কোনদিন কাকে ডিম পেড়ে দিয়ে যাবে।'

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে রেখা দোতলায় উঠে এল। বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। সে কি সত্যিই পাগলামি করছে! সে যে সুমনকে সত্যিই ভালবাসে। মন যে অন্য কিছু মানতে চায় না। ভালবাসে এই বাড়িকে। ঢোকামাত্রই মনে হয়, এসে গেছে নিজ নিকেতনে। প্রতিটি ঘর তার চেনা। এর বাতাস মনে হয় তার শ্বাস-প্রশ্বাস। মনে হয় আগেও সে ছিল এখানে। এখানে এলেই তার মনে হয় কেন, সে তীর্থে এসেছে। কেন তার মনে হয় সুস্থ মানুষের পৃথিবী

বড় শব্দময়, বড় নিষ্ঠুর, বড় কদর্য, বড় লোভী, অতিশয় নোংরা।

রেখা খস্‌খস্‌ একটা শব্দে ফিরে তাকাল। দূরে, আলোছায়ার পথ ধরে বসে, বসে শরীর টেনে টেনে এগিয়ে আসছে সুমন। রেখা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কোথায় যাবে তুমি?'

'তোমার কাছে।'

'আমাকে তুমি ডাকলে না কেন?'

'তোমাকে আমি দেখাতে চাই, আমার এই চতুষ্পদ অবস্থা।'

'সুমন'—রেখা এটা আর্তনাদের মত শব্দ তুলে সুমনের পাশে বসে পড়ল। 'তুমি কি বলছ! কি বলতে চাও তুমি। আমার চোখে তুমি চতুষ্পদ নও, বহুপদ নও, দ্বিপদ নও। আমার চোখে তুমি ব্রহ্মপদ। শোনো আমাকে ফেরাবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে, আমাকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হও। চলো শোবে চলো।'

'কেন লাগবে রেখা! তুমি হেঁটে হেঁটে যাবে, আমি তোমার পায়ের পাশে পাশে যাবো ঘষড়ে, ঘষড়ে একটা পোষা কুকুরের মতো।'

রেখাস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেঝেতে পড়ে। পা মুড়ে পাশ ফিরে পড়ে আছে রেখা। চাপা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। ঝলকে ঝলকে বাতাস আসছে গঙ্গার দিক থেকে। মাধবীলতা দুলে, দুলে উঠছে।

হঠাৎ হরিদা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। হরিদা সম্প্রতি গোঁফদাড়ি রাখছেন। ঋষির মতো দেখাচ্ছে। প্রশস্ত বুকে মোটা, সাদা পৈতে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন দু'জনের দিকে। মেঝেতে বসে পড়লেন। রেখার চুলে হাতের আলতো স্পর্শ রেখে বললেন, 'ওঠো, মা, ঠাণ্ডা মেঝেতে মানায় না। আমি সুমনকে শাসন করব। ও বড় আত্মসচেতন, আবার দেহসচেতন। দেহটাকে ভোলাতে হবে।'

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। যা আশা করেছিল সবাই, তাই হল। গত দুই দশকে সুমনের মতো নম্বর কেউ পায়নি। কলকাতার শিক্ষাজগৎ স্তম্ভিত।

রেখা আর ব্রজেন দু'জনেই ফার্স্টক্লাস পেয়েছে। এক থেকে দশের মধ্যে রেখার স্থান হয়েছে। সুমন তার হুইলচেয়ারে বসে আছে কলেজের লনে। সবাই এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপকরা সবাই ঘিরে ধরেছেন। প্রিন্সিপ্যাল সায়েব বলছেন, 'সুমনকে আমি অক্সফোর্ডের ক্রাইস্টচার্চ কলেজে পাঠাব।' সুমনের মনে হচ্ছে, পা বড় না মাথা বড়।

এক সময় কলেজ খালি হয়ে গেল। ওরা তিনজন। প্রিন্সিপ্যাল সায়েব বসে আছেন সিঁড়ির ধাপে। তিনি বললেন, 'পুরনো কলেজ আর অধ্যাপকদের তোমরা যে মনে রেখেছ, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ, অভিভূত। চলো দিনটাকে আমরা সেলিব্রেট করি। লেট আস গো টু মাই ডেন। সেখানে আমরা একটা কিছু ভাল রান্নার চেষ্টা করি। চেষ্টায় কি না হয়। রেখা ইজ দেয়ার। আই হ্যাভ এভরি ফেত ইন হার কালিনারি আর্ট।'

ব্রজেন 'হুররে' বলে লাফিয়ে উঠল। শুধু লাফাল না, ছুটে গিয়ে সায়েবকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সাদা লংকোটের বুকে মাথা রেখে আদর জানাল। সায়েব তাকে জড়িয়ে ধরলেন সন্তানের স্নেহে। সুমন বললে, 'স্যার, আমারও ইচ্ছে করছে; কিন্তু আমি হেল্পলেস।'

প্রিন্সিপ্যাল হাত তুলে বললেন, 'তোমার সোলটাকে আমার বুকে পাঠিয়ে দাও। ফরগেট দি বডি।'

সন্ধ্যা তলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। পাখির কিচরিমিচির সব থেমে গেল। চারজনে গিয়ে ঢুকল প্রিন্সিপ্যাল সায়েবের কোয়ার্টারে।

পরিচ্ছন্ন আয়োজন। ঝকেঝকে আসবাব। হালকা হলুদরঙের পর্দা। বড় বড় দুটো সোফা। ছোট্ট একটা বিছানা। ড্রয়ার, দেওয়ালে যীশুর ছবি। তলায় টেবিল। টেবিলে খোলা বাইবেল। ঝকঝকে একটা মেটাল ক্রশ দিয়ে চাপা দেওয়া। খাবার ঘর। কিচেন।

রেখা বললে, 'স্যার, স্টোরে কি আছে বলুন, আর মেনুটা আমাকে জানান। আপনারা বসে বসে চা খান। বাকিটা আমার দায়িত্ব।'

'তোমাকে আমরাও সাহায্য করতে চাই।'

'স্যার, আপনি আমাকে জিনিসগুলো দেখিয়ে দিন। আগে আমি চা করি। তারপর আপনি একটু অরগ্যান বাজান। শুনতে, শুনতে রান্না করি।'

তাঁর অপূর্ব বাংলা উচ্চারণে সায়েব বললেন, 'যথা আজ্ঞা কন্যা।'

চা এসে গেল, অপূর্ব পেয়ালায়। দু'রকমের বিস্কুট, নাইস আর কটেজ

ক্রিম। খাওয়া হয়ে যাবার পর ব্রজেন সব তুলে নিয়ে গেল ধুতে। রেখা বললে, 'দেখো, কুস্তির প্যাঁচ মেরে সব চুরমার করে ফেলো না!'

অর্গান বেজে উঠল। সকলের মনে হতে লাগল, তারা বুঝি বিদেশের কোন চার্চে বসে আছে। রেখা রান্নায় ব্যস্ত। ব্রজেন মাঝে মাঝে সাহায্য করতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে আসছে। রাত নটার সময় খাবার টেবিলে সাদা চাদর বিছানো হল। রেখা আর ব্রজেন সব খাবার বয়ে বয়ে নিয়ে এল, সুপ, ছোট ছোট ফুলকো রুটি, চিকেন কারি, ফ্রায়েড ফ্রেঞ্চ পোট্যাটো। ফ্রুট স্যালাড।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'এটা স্বীকার করতেই হবে, জোর খানা। রেখা খুব সুন্দর রেঁধেছে।'

সবাই বললে, 'কোনও সন্দেহ নেই। কোনও সন্দেহ নেই।'

প্রিন্সিপ্যাল জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের ফিউচার প্ল্যানটা কি?'

ব্রজেন বললে, 'আমারটা ভেরি সিম্পল। বাবার বয়েস হল, ব্যবসায় বসে পড়তে হবে। ফিলজফিক্যালি বিজেনস চালাব।'

সুমন বললে, 'স্যার, আমার কোনও ফিউচার নেই। আমি এখন একেবারেই একা। আমার জ্যাঠাইমা মারা গেছেন।'

'সান, ওটা তো একস্ট্রিম ফিউচার অফ ম্যান। দূর ভবিষ্যৎ। কাছেরটা বল?'

'জানি না স্যার।'

'রেখা তোমার?'

'আমি বিয়ে করব স্যার।'

প্রিন্সিপ্যাল চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আই সি, তুমি সংসারী হবে? দ্যাট্স নাইস। ছেলেটি কে?'

'আপনার সামনে বসে আছে স্যার। সুমন। আপনি শুধু ওকে একটু বুঝিয়ে দিন। ও কিছুতেই বিয়ে করবে না।'

'কেন করবে না? সুমন হোয়াই নট?'

'স্যার, আপনি রেখাকে একটু বুঝিয়ে দিন। ও ভীষণ অবুঝ। ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না আমাকে বিয়ে করা মানে জীবনটা নষ্ট করা। সুন্দরী, শিক্ষিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যান্ড করা একটা মেয়ে, আমার মতো একজন ক্রিপল্‌ডের বউ হবে। ও কোনও মানুষের সামনে গর্ব করে

আমার পরিচয় দিতে পারবে? ওই যে আমার স্বামী, শিম্পাঞ্জির মতো যে বসে, বসে চলে, জীবনে যে কোনওদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। একটা চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে যার কোনও তফাত নেই।'

রেখা একটু রেগেই বললে, 'দ্যাট্স মাই বিজনেস।'

সুমন হেসে বললে, 'বাট দ্যাট্স মাই বিজনেস। তোমাকে ভালবাসি বলেই, তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করতে পারব না। তোমার একটা ভীষণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। আমার মতো একটা পঙ্গুর সঙ্গে জড়িয়ে গেলে তুমিও পঙ্গু হয়ে যাবে। বিদেশে যেতে পারবে না, অধ্যাপনা করতে পারবে না; তাহলে লেখাপড়া শিখলে কেন?'

'তোমাকে সাহায্য করব বলে।'

'আচ্ছা, বেশ, মানলুম তোমার কথা। দু'দশ বছর পরে তুমি বিরক্ত হয়ে যাবে। তোমার জীবনে অন্য পুরুষ আসতে বাধ্য। তখন তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। এমনিই আমি একটা আঘাতে কাবু, যেচে আর একটা আঘাত নিতে আমি প্রস্তুত নই।'

'সুমন, জেনে রাখো, আমি চট্টগ্রামের মেয়ে। আমার মন অত ঠুনকো নয়। আমি যা ধরি একবারই ধরি। আমি যে সিদ্ধান্ত নিই, সেটা আমার স্থায়ী সিদ্ধান্ত। তুমি যা বললে, সেটা তোমার ভয়, ভবিষ্যৎ নয়।'

প্রিন্সিপ্যাল হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার একটা লিট্‌ল প্রশ্ন, রেখা, তোমার বাবা, মা কি বলছেন? তাঁদের মত আছে?'

'বিয়ে আমি করব। সংসার আমার, তাঁদের মত অমতের কি দাম আছে? এইটা এক নম্বর। দু' নম্বর হল তাঁদের সম্পূর্ণ মত আছে। সুমনের জন্যে তাঁরা গর্বিত। আমি সেইরকম মেয়ে নই যে বিদ্রোহী হব!'

সুমন হঠাৎ বলে বসল, 'এটা তোমার প্রেম না করুণা!'

রেখা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ উঠে চলে গেল জানালার কাছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে রেখা। পিঠের দিকটা ওঠা-পড়া করছে। অধ্যক্ষ উঠে গিয়ে রেখার পিঠে বাঁ হাতটা রেখে বললেন, 'মা তুমি কাঁদছ?'

ব্রজেন সুমনকে বললে, 'ভেবে ভেবে বেশ একটা বিচ্ছিরি কথা বললি তো!'

'মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে হঠাৎ। আমি কি করব!'

অধ্যক্ষ রেখাকে ধরে এনে সুমনের সামনে দাঁড় করালেন। অনেকক্ষণ রান্না করেছে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে। ঘাম-তেলে মুখটা চকচক করছে। কপালে আটকে আছে চূর্ণ চুলের গুচ্ছ। চশমার তলা দিয়ে চোখের জল নেমেছে গালে। অধ্যক্ষ বললেন, 'সুমন, তুমি আমার মেয়েকে কাঁদিয়েছো। ক্ষমা চাও।'

রেখা সরে যাবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'না, না, আমার পাওনা আমি পেয়ে গেছি।'

সুমন তার হাত দুটো ধরে বললে, 'আমার মনে যা ছিল আজ স্যারের সামনে সবই তোমাকে বলে দিলুম।'

ব্রজেন বললে, 'বেশ করেছ। আমার সোনা ছেলে লক্ষ্মী ছেলে। এখন বল কবে পার্মানেন্টলি চার হাত এক হচ্ছে?'

অধ্যক্ষ বললেন, 'সুমন দি বেটার, বিফোর আই লিভ ফর ইংল্যান্ড।'

সুমন ফিরে এল তার নির্জন, নিরালা বাড়িতে। এসেই বললে, 'হরিদা, আসুন, আমার বাবা নেই, মা নেই, জ্যাঠাইমা নেই, কেউ নেই, আপনিই আমার সব। পায়ের ধুলো দিন। আজ আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে।'

'জানি। আমি আগেই খবর পেয়েছি। তোমার খোঁজে তোমার বন্ধুরা সব এসেছিল। আমি তাদের প্রত্যেককে মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছি। সাধনা বলে একটা মেয়ে এসেছিল আলাদাভাবে। মনে হল অবাঙালি। সে তোমার জন্যে অনেক খাবার, আচার, সুন্দর একটা মালা এনেছিল। অনেকক্ষণ ওপরের ঘরে বসে আমার সঙ্গে গল্প করল। বেশির ভাগই তোমার গল্প। অনেকক্ষণ ছিল। শেষে বললে, কাকু, অনেক দূর যেতে হবে আমাকে। বলে, এই কিছুক্ষণ আগে গেল। মালাটা তোমার গলায় পরিয়ে দিতে বলেছে আমাকে বিশেষ করে।'

'মালাটা মহাপ্রভুর গলায় পরিয়ে দিন।'

'একটা ব্যাপার হয়েছে সুমন, মেয়েটি চলে যাবার পর দেখি কার্পেটের ওপর এই আংটিটা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে খুবই দামী। পাথরটার যা ঝিলিক, হীরে বলেই মনে হয়। কি হবে সুমন?'

'ওটা হীরেই হরিদা। সাধনারা গুজরাতি। ওর বাবার হীরের ব্যবসা আছে বোম্বাইতে। কিন্তু আংটিটা ফেলে গেল কি বলে! যত্ন করে রাখুন।

আবার আসবে বলেছে তো! হয়তো কালই আসবে। না এলে পাঠিয়ে দেবো রেখাকে দিয়ে।'

'এত দামী একটা জিনিস ফেলে রেখে চলে গেল। কি মেয়ে রে বাবা!'

'হরিদা মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপার বোঝার চেষ্টা করবেন না। পাগল হবে যাবেন।'

'তুমি এই কথাটা বললে কেন জানি। তবে একটা কথা বলি তোমাকে, রেখা তোমার পূর্বজন্মের কেউ ছিল। কোনও সন্দেহ নেই।'

'হরিদা, আমি যে ওই সব বুঝি না। ঈশ্বরকে আমি একটা শক্তি বলে মানতে রাজি আছি; কিন্তু কোনও সংস্কার আমার মাথায় আসে না।'

হরিদা বললেন, 'গরম গরম রুটি আর প্লেন আলুর দম করি?'

'হরিদা আমি আজ একটা অপরাধ করে এসেছি, আমার কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে খেয়ে এসেছি।'

হঠাৎ সন্ধেবেলা বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। হরিদা শব্দ পেয়েই দরজা খুলে দেখতে গিয়েছিলেন, কার আগমন? সুন্দর অভিজাত চেহারার এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা সামনে। ভদ্রলোক হাত জোড় করে নমস্কার করে বললেন, 'নিশ্চয়, আপনিই হরিবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমরা রেখার বাবা আর মা। আমরা আপনার কাছেই এসেছি।'

'আসুন, আসুন।'

কর্তাদের আমলের বৈঠকখানায় সবাই বসলেন। ভদ্রলোক চোখ ঘুরিয়ে পুরো ঘরটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'এই বাড়িতে একসময় কেউ কি আইনজীবী ছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সুমনের পিতা। খুব নামকরা ব্যবহারজীবী ছিলেন, ঈশ্বর প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।'

'ও, তিনি তো আমাদের একটা মামলা জিতিয়ে দিয়েছিলেন। সিভিল

সাইডে একেবারে এক নম্বর ছিলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সুমন? সুমন কোথায়?'

'তার সামান্য জ্বর হয়েছে। মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।'

'খুব বেশি জ্বর?'

'না, না, এই একশোর মতো। ডাক্তারবাবু এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন।'

'আপনার কাছে আমরা একটা প্রস্তাব এনেছি। সুমনের সঙ্গে রেখার বিয়ের প্রস্তাব।'

'এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য, কিন্তু!'

'জানি কি বলবেন। কিসের কিন্তু, কিন্তু। সুমনের পা? ওটা গৌণ।'

'আপনার আত্মীয়স্বজনরা যদি বলেন এক বিকলাঙ্গের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।'

'প্রথমত, আমাদের আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই, তা ছাড়া, কেউ যদি বলে বলবে। মেয়ে আমাদের। আপনার অমত নেই তো?'

'আমার অমত। রেখা সুমনকে ভীষণ ভালবাসে। সুমনের পরম সৌভাগ্য।'

'আপনাকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে। সুমনকে রাজি করাতে হবে। তার ভীষণ আপত্তি।'

'সেটা ওর মনের বিকার। আমি প্রভুকে বলব।'

'প্রভু! প্রভু কে?'

'আমার গৌর।'

'গৌরাঙ্গদেব?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

'আমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাই। আমরা দুজনেই বছরখানেকের জন্যে বিদেশে যাবো।'

'আপনারা আয়োজন করুন। সুমনকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার।'

'আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা তাহলে আসি?'

'তা কি হয়! শুধু মুখে আপনাদের যেতে দোবো না।'

'আজ থাক, কেন জানেন, আজ আমাদের একটা নিমন্ত্রণ আছে। কলকাতার একেবারে সেই ও-প্রান্তে। এই তো শুরু। এর পর কত খাওয়া-

দাওয়া হবে!’

সুমনের সঙ্গে দেখা হল না। সুমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শরীরটা বেশ কাহিল হয়েছে একদিনের জ্বরে। কাল রাতে প্রায় তিনের কাছে চলে গিয়েছিল। ওষুধ পড়ার পর, দুপুরের দিকে ঘাম দিয়ে একটু নেমেছে।

গাড়িটা চলে গেল। হরিদা কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপচাপ। উঠোন। তুলসীমঞ্চ। দাওয়া। ঘোরানো সিঁড়ি। সার, সার ঘর। বাড়িতে মানুষের প্রয়োজন। অনেক মানুষ।

সুমনের জ্বর ছাড়ল তিন দিন পরে। খুবই দুর্বল। এই তিন দিনে তার কাণ্ডকারখানা দেখে হরিদার চোখে জল এসে যেত। সে কারোর সাহায্য নেবে না। সব কাজ নিজে করবে। বসে, বসে ঘষড়ে, ঘষড়ে বাথরুমে যাবে। ভীষণরকমের পরিচ্ছন্নতার বোধ। নিজের জামাকাপড় কাচবে। শরীর পরিষ্কার করবে। হাত থেকে মগ পড়ে যাবে, বালতি উল্টে যাবে। যে জামাকাপড় পরে বাথরুম থেকে বেরোবে সেটা আধভিজে। সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেলে বলবে, এখন আমার ভরা যৌবন। এরপর তো বার্ধক্য আসবে, তখন তো সাহায্য ছাড়া চলবেই না। সেই দিনের কথা ভাবুন হরিদা। সেই সময়কার কসরতের কথা।

দুর্বল সুমন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

হরিদা বললেন, ‘তোমাকে এখন দিনকতক ভালমন্দ খেয়ে শরীরে একটু জোর আনতে হবে। আজ আমি গরম গরম সুজির রুটি করছি। বেশ ভাল করে ঝালঝাল একটা ঝোল। ডাক্তারবাবু মাগুর মাছ বলেছেন। ওইটা আমি পারব না।’

‘মাছ, মাংস, ডিম এ-বাড়িতে ঢুকবে না। আমার জ্যাঠাইমার ট্রাডিশান ভাঙা চলবে না।’

‘শরীরের জন্যে প্রয়োজন হলে কি করবে?’

‘গরু কি করে! গরুর জ্বর হলে ছেড়ে-যাবার পর কি পথ্য করে হরিদা। শরীর খারাপ হয়, শরীর অপানিই ঠিক হয়। একটু সময় লাগে। সময়ের ব্যাপার।’

হরিদা হেসে বললেন, ‘মানুষের সিস্টেম আর গরুর সিস্টেম এক নয় সুমন। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করছি না। তুমি জ্ঞানী। তোমার কথা আজ

কে না জানে?'

'আমি আপনার ওপর রাগ করবো! ভাবলেন কি করে হরিদা? আমার শরীরে রাগ নেই। একটু আধটু অভিমান থাকতে পারে। চলুন আপনাকে রান্নায় সাহায্য করি।'

'আজ নয়। একটু সুস্থ হও, তারপর।'

দুপুরে আহারাদির পরে, হরিদা কথাটা পাড়লেন।

'ওঁরা এসেছিলেন।'

'জানি। আমি গাড়ির আওয়াজ ওষুধের ঘোরের মধ্যেও পেয়েছি।'

'বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে।'

'বিয়ে আমি করব না হরিদা। ওটা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি অক্ষম, পঙ্গু। নিজের দায়িত্বই নিতে পারি না, সংসারের দায়িত্ব?'

'সংসার তোমার দায়িত্ব নেবে। আমি আর বেশি দিন নেই। তোমাকে আমি রেখার হাতে দিয়ে যেতে চাই।'

'আর রেখাকে আপনি কার হাতে দিয়ে যেতে চান?'

'তোমার হাতে।'

'আপনি জানেন, হাতের সঙ্গে পায়ের যোগ না হলে, হাত অকেজো।'

হরিদা অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপচাপ। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

'কি হল? কোথায় চললেন?'

'না যাই। আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম, তোমার ওপর আমার একটা স্নেহের অধিকার আছে। এমন কথাও আমি সেদিন বলতে পেরেছিলুম, যান, আপনারা সব আয়োজন করুন, সুমনকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার। নিজের বোকামিতে নিজে অপমানিত হলুম।'

'আপনি কথা দিয়েছেন?'

'দিয়েছি।'

এইবার সুমন মাথা নিচু করে বসে রইল। হরিদা ঘরে উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

সুমন মুখ তুলে বলল, 'আপনার কথা আমাকে রাখতেই হবে।'

হরিদা ছুটে এসে সুমনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'দেখবে, তোমার ভাল হবে। তুমি সুখী হবে। পূর্ণ হবে।'

'এইবার আমার একটা শর্ত আছে। আমি টোপর মাথায় সং সেজে বিয়ে করতে যেতে পারব না।'

হরিদা মুখোমুখি বসে বললেন, 'সে কি? হিন্দুমতে বিয়েতে তো ছেলেকেই যেতে হয় মেয়ের বাড়ি।'

'এইবার চোখ বুজিয়ে চিত্রটা ভাবুন। গাড়ি থেকে দু'জন ঝাঁকা মুটে বর নামাচ্ছে। সপ্তপদী হচ্ছে। কনে ঘুরছে, তার পায়ের পাশে চেনে বাঁধা কুকুরের মতো, গাঁটছড়া বাঁধা বর চার পায়ে শরীর টেনে টেনে ঘুরছে। যত নিমন্ত্রিতরা হাততালি দিচ্ছে মনে, মনে, বাহা, বাহা। এত বড় একটা অপমানের মধ্যে আমাকে ফেলবেন?'

হরিদা মাথা নিচু করে আবার ভাবতে বসলেন। দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। শেষে বললেন, 'বেশ ইংরিজি মতে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হবে। পরে এই বাড়িতে এসে অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হবে, তা না হলে বিয়ের পবিত্রতার বোধটা তোমার আসবে না।'

বিকেলবেলা রেখা এল। ভয়ে ভয়ে ঢুকছে। সামনেই হরিদা। তুলসীমঞ্চে মাটি লেপছিলেন। রেখা প্রণাম করে, চাপা গলায় বললে, 'আছি? না গেছি?'

'রাজি করিয়েছি।'

রেখা হরিদাকে পেছন থেকে দু'হাতে জাপটে ধরল। সাধকের শীতল শরীর। ধূপ-ধুনো, কর্পূরের গন্ধ।

'শর্ত আছে একটা। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হবে। হিন্দুমতের ধকল ও নিতে পারবে না। এই বাড়িতে এসে সেইদিনই হিন্দুমতে একটা অনুষ্ঠান হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কেউ নিমন্ত্রিত হবে না। কোনও জাঁকজমক করা চলবে না।'

'আমাদেরও ঠিক ওই মত। সুমন বড় সচেতন। ওর যাতে অস্বস্তি না হয় দেখতে হবে।'

সুমন বসে বসে বই পড়ছিল। সুমন যখন পড়ে তখন সে এতই তন্ময় হয়ে পড়ে, গায়ে আগুন লেগে গেলেও টের পাবে না। সুমন বসে ছিল চেয়ারে। রেখা এসে তার পায়ের কাছে বসে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সুমনের চোখ পড়ল রেখার দিকে, 'আরে তুমি কখন এলে? মাটিতে

বসলে কেন? ওঠো, ওঠো।'

'আমি আমার জায়গা ঠিক খুঁজে নিয়েছি।'

'তুমি জানো, আমি তোমাকে তুলে চেয়ারে বসাতে পারবো না। কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ!'

রেখা উঠে দাঁড়ালো। চশমাটা খুলে টেবিলে রাখল। তারপর সুমনকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। একের পর এক।

সুমন আতঙ্কের গলায় ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল, 'এ কি করছ? একে তো বলে চুমু। এ তো প্যাসান। হরিদা এসে পড়বেন। রেখা এ কি করছ?'

রেখার চোখে জল। সুমনের চওড়া বুকে মাথা ঘষতে, ঘষতে বললে, 'তুমি আমার। তোমার সব কিছু আমার।'

রেখার বুক থেকে আঁচল খুলে মেঝেতে লুটোচ্ছে। উদ্ধত বুক দেখে সুমন ভয় কাঁপা গলায় বললে, 'এ কি? তোমার যে সব খুলে গেল!'

রেখা বললে, 'আমার সব কিছু তোমার, তোমার।'

সুমনের ভীষণ গরম লাগছে। তার সারা শরীর কাঁপছে। সে ফিসফিস করে বললে, 'রেখা, প্লিজ, আমার শরীর কেমন করছে। আমি বুঝতে পেরেছি, আমি এক সুস্থ মানুষ। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। হরিদা দেখে ফেললে খুব লজ্জা হবে।'

রেখা উঠে দাঁড়াল। আঁচল ঠিক করছে। সুমন হঠাৎ আচমকা বলে ফেলল, 'কি সুন্দর।'

রেখা টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুমন এই প্রথম অনুভব করল, মানুষের শরীরও সেতারের মতো বাজতে পারে। অক্ষর জগতের বাইরে, পাশাপাশিই রয়েছে, সুন্দর এক নিরক্ষর জগৎ।

দু'জনের জীবনের ওপর দিয়ে দীর্ঘ একটা সময় খেলা করে গেল। নভেম্বরের এক শীতের রাতে হরিদা চলে গেলেন।

চলে যাবার তিন দিন আগে রেখাকে বলছেন, 'তোমার মতো মেয়ে লক্ষে একজনও আছে কিনা জানি না। নিজের সমস্ত অহঙ্কার বিলিয়ে দিয়ে এমন সেবা আমি দেখিনি। এবারের মতো আমার খেলা শেষ। আমি আসি। পারো তো, তোমাদের সন্তান করে আবার আমাকে ফিরিয়ে এনো।'

হরিদা হাঁপাচ্ছেন। রেখার হাত দুটো তাঁর বুকের ওপর। সাদা দাড়ি। সাদা চুল। একপাশে রেখা, একপাশে সুমন। এক হাতে ধরেছেন সুমনের হাত, আর এক হাতে রেখার। দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। হরিদা বললেন, 'তোমরা হলে সাক্ষাৎ হরগৌরী। তোমাদের ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। যেতে নাহি চাই তবু যেতে হবে। ডাক এসেছে আমার সে-দেশ থেকে। এবারে জীবনটা বড় শুকনো গেল। সামনের বার আমার এই মায়ের কোলে যেন ফিরে আসি আবার। ওই তুলসীমঞ্চ এই ঘর। উঠোন। সিঁড়ি ঠাকুরঘর। গঙ্গা। বাবার কাছে পড়ব। মায়ের হাত ধরে বেড়াবো। ওই ছাতে গিয়ে খেলব। জীবন যে কি আকর্ষণ তা বোঝা যায় মৃত্যুর সময়।'

সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হরিদা চির নীরব হয়ে গেলেন। বাড়ির শেষ পূর্ব প্রতিনিধি চলে গেলেন ফুলের সমারোহে অগ্নিশয্যায়। প্রিন্সিপ্যাল সায়েব প্রায় জোর করেই সুমনকে সুমনেরই কলেজে অধ্যাপক করে দিয়ে ফিরে গেছেন স্কটল্যান্ডে। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেই সুমন বলেছিল, 'আমার দেহ স্বাভাবিক নয়। বিকল। আমি দাঁড়াতে পারি না। বসে বসেই আমাকে পড়াতে হবে। ইচ্ছে করলে তোমরা সবাই আমাকে ল্যাংড়া স্যার বলে ডাকতে পার। আমি কিছুই মনে করব না।' ছেলে আর মেয়েরা ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। পরে তারা সুমনের পড়ানো দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই সুমনের বাড়িতে আসত। রেখা আবার তাদের পড়াত। মুখরোচক খাওয়াত। একালের একটা গুরুকুল তৈরি হয়েছিল। ব্রজেন সেই সময় বিদেশে। হরিদাকে শ্মশানে নিয়ে গেল সুমনের ছাত্ররা। শেষ হয়ে গেল একটা যুগ।

এক রাতে রেখা সুমনকে বললে, 'তোমার একটা আশঙ্কা তো কেটেছে। আমি তোমার পরিচয় দিতে লজ্জা পাবো। উপেক্ষা করব ঘৃণা করব। সুযোগ পেলেই অন্য কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করব।'

'আমাকে লজ্জা দিও না আর।'

'তাহলে একটা অনুরোধ। আমাদের সন্তান চাই। তা না হলে দুজনেই বড় অসহায় হয়ে যাব। যৌবন গিয়ে জরা আসবে। আমাদের বংশ লোপাট হয়ে যাবে না কি! শুধু জ্ঞান নিয়ে থাকা যায়!'

'রেখা, এখানেও দুটো কথা আছে। আমাদের সন্তান এলেই লোকে বলবে, দেখেছ, ল্যাংড়ারও ছেলে হয়। জাতে মাতাল, কিন্তু তালে ঠিক। অশ্লীল সব ইঙ্গিত করবে রেখা। সে বড় আশ্চর্য। অসহ্য। দ্বিতীয় হল, তুমি আমাকে নিয়ে লজ্জা না পেলেও আমাদের ছেলেরা পাবে। জ্ঞান হয়ে যখন দেখবে আর সব ছেলেদের বাবা সুস্থ, সবল, সুন্দর, তাদের হাত ধরে বেড়াতে যাচ্ছে, ছোটাছুটি করছে, তখন তারা নিজেদের অবস্থা মেলাবে। আমি তাদের সামনে আসতে লজ্জা পাবো। আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। অন্তরালে নির্বাসন নিতে হবে। রেখা এ আমরা বেশ আছি। নিজেদের লজ্জা সামলে বেশ আলতো, আলতো বেঁচে থাকা। আমি নার্সিংহোমে যেতে পারবো না। তোমাকে কোন ভাবেই সাহায্য করতে পারবো না। যে বাবা কোন কাজেই লাগবে না,—সে বাবার কি দাম আছে রেখা। ব্যাপারটা তুমি ঠাণ্ডা মাথায় একবার চিন্তা করে দেখো।'

'এটাও তোমার আর একটা আশঙ্কা। দেখবে এটাও তোমার ভুল বলেই প্রমাণিত হবে। ভয়াৎ ভয়ঙ্করং নাস্তি। ভয়ের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু নেই।'

রেখা সুমনকে নিয়ে হরিদ্বারে যাবে, যাবেই যাবে। পর পর মৃত্যু মনে যে ছায়া ফেলে গেছে সেই ছায়া থেকে বেরোতে রেখা সুমনকে নদী আর পাহাড়ের মিলনস্থলে নিয়ে যাবে। সুমন রেখার হাত দুটো ধরে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সুন্দর একটা মুখ। কপালের মাঝখানে চাঁদের মতো টিপ। কুচকুচে কালো চোখের মণি। সুমন হেসে বললে, 'এইবার বুঝতে পারছ কেন একজন সুস্থ মানুষকে বিয়ে করা প্রয়োজন। আমারও ইছে করে বাইরে যেতে। কতকগুলো টেকনিক্যাল প্রবলেম তুমি খেয়াল রাখো না। ট্রেনের দীর্ঘ ভ্রমণে আমার প্রধান সমস্যা বাথরুম।'

রেখা বহুক্ষণ ভাবল। সত্যই সুমনের প্রধান সমস্যা, সকলের সামনে হাঁটাচলা করা। বসে থাকতে বললে এমন অভ্যাস করে ফেলেছে সারাদিন বসে থাকতে পারবে।

রেখা বললে, 'সত্যি আমি ভেবে দেখিনি। তোমাকে আর কখনও

এমন অবুঝের মতো কথা বলবো না।'

'খুবই দুঃখের, কিন্তু এইটাই আমাদের জীবনের বাস্তব।'

শীত গিয়ে বসন্ত এল। চুটিয়ে অধ্যাপনা করছে সুমন। আর চুটিয়ে সংসার করছে রেখা। নির্জন বাড়ি। দুপুরটা যেন আর কাটতেই চায় না। রাতে দু'জন শুয়ে আছে বিছানায় পাশাপাশি। সব জানালা খোলা। অফুরন্ত চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। দূরে কোথাও জলসা হচ্ছে। ঠুংরি গাইছেন কোনও বড় ওস্তাদ। সুরের মোচড়ে, মোচড়ে মনের বাঁধে ভাঙন ধরে যাচ্ছে। বাণী বোঝা যায় না; কিন্তু নায়িকার মিনতিটুকু স্পষ্ট বোঝা যায়। রেখা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কপাল ঢাকা কালো চুল সিল্কের মতো চকচক করছে। মোমের মত মসৃণ মুখ চাঁদের আলোয় স্ফটিকের ভাস্কর্যের মতো দেখাচ্ছে। সুমন পাশ ফিরে রেখার বুকে হাত রাখল। নারকেল গাছের পাতা রূপোর তবকের মতো ঝিকিমিকি করছে। রাত বড় রোমান্টিক। রাত বড় দুর্বল। সব মানুষকেই হঠাৎ দুঃসাহসী করে তোলে। তখন সব সূক্ষ্ম হিসেব ভুল হয়ে যায়।

সেই রাত থেকে পঁচিশটা বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। ব্রজেন তখন তার ব্যবসার কাজে প্যারিসে। ব্রজেন সাধনাকে বিয়ে করেছিল। বউ আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্রজেনের সুখের সংসার। সেই সাধনা যে হীরের আংটিটা সুমনদের বাড়ির কার্পেটে ফেলে রেখে গিয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর আগে। আংটিটা সে সুমনের আঙুলে পরাতে চেয়েছিল। সাহস পায়নি। মনে মনে সেও সুমনকে ভালবেসেছিল। সেই আংটিটা সে পরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল রেখার আঙুলে। ব্রজেনের সঙ্গে সুমনের বিচ্ছেদ হয়নি। দেখা হওয়ার উপায় ছিল না বিশাল দূরত্বের জন্যে; কিন্তু সপ্তাহে একটা করে চিঠি এ-দেশ ও-দেশ করত।

ব্রজেনকে লেখা সুমনের চিঠি দিয়ে এই কাহিনীর ইতি হোক।

ব্রজেন বন্ধুবরেষু,

আজ আমার মস্ত বড় একটা দ্বিধার অবসান হল। গুটি কেটে রেশমকীটের বেরিয়ে আসার মতো আমিও বেরিয়ে এলুম আজ রাতে এই একটু আগে। ঘটনাটা না জানিয়ে আমি বিছানায় যেতে পারছি না। তুমি জানো, রেখা আমাকে একগুঁয়ে একটা মেয়ের মতো জীবনে গ্রহণ করেছিল। ভেবেছিলুম এক দ্বিপদ প্রাণী কোন হঠকারিতায় এক চতুষ্পদকে পথ করে নিল। সংশয়ে ছিলুম, কখন ছোঁ মেরে নিয়ে যায় এক বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। সে সংশয় আমার কেটে গেল। রেখা ছেলে চেয়েছিল। হরিদা আসতে চেয়েছিলেন। এক চাঁদের আলোর রাতে, মানুষী দুর্বলতায় আমি পিতা হলুম। সুস্থ, সবল এক সন্তানের জনক। একবার দেশে এসে তুমি তাকে দেখে গেছ। আমি যেমন দুর্বল, সে সেই রকম সবল। সে যত বড় হতে লাগল, আমি মনে মনে তার সামনে তত ছোট হতে লাগলুম। দূরে সরতে লাগলুম, নিজের অক্ষমতাকে লুকোতে লাগলুম। স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিলুম। কোনও ভাবেই কেউ আমার সংশয় দূর করতে পারেনি, যে চন্দন আমাকে উপেক্ষা করে না, ঘৃণা করে না, আমার দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকায় না। চন্দন স্পোর্টসম্যান, চন্দন ভাল ছাত্র, চন্দনের জগৎ বিশাল। তার কাছে আমি একটা পরিচয় মাত্র। আমি তার বন্ধুবান্ধবের সামনে কখনও বেরোয়নি পাছে সে লজ্জা পায়। তার সামনে কখনও বসে-বসে চলিনি। কি কঠিন সাধনা আমার। তবে হুইলচেয়ারে নিজেকে খুব একটা ছোট মনে হত না। বেশ রোমান্টিক, বেশ রাজকীয় মনে হত। মনে হত আমি এক যুদ্ধক্ষত সৈনিক।

আজ কিছু আগে চন্দনের বান্ধবীর পিতা এসেছিলেন বিয়ের কথা পাকা করতে। আমি স্বভাবতই ত্রিসীমানায় ছিলুম না। ছিলুম মেয়েদের মতো চিকের আড়ালে। সব কথাই হচ্ছিল রেখার সঙ্গে। চন্দনের মতো রূপবান ব্রিলিয়ান্ট ছেলের বাবা পঙ্গু এর চেয়ে বড় শক আর কি হতে পারে। আমি পাশের ঘরে বসে বসেই শুনছিলাম। সমস্ত কথাবার্তা হয়ে যাবার পর চন্দন হঠাৎ বললে, 'সব কথাই তো মায়ের সঙ্গে হল। আমার বাবার সঙ্গে কথা না হলে, কোনও কথাই তো পাকা হবে না।'

ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'তিনি তো ক্রিপল্‌ড।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দন গর্জন করে উঠল, 'কি বললেন? আপনি আসতে

পারেন। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।'

একটু আগেই একটা জীবন্ত নাটক হয়ে গেল, আর আমি বেরিয়ে এলুম আমার দ্বিধা আর সংশয়ের গুটি থেকে। এত বড় একটা খবর যা প্রায় আমার পূর্বজন্মের মতো, তোমাকে সবার আগে না জানিয়ে আমার দিন শেষ করতে পারছি না। সুস্থ পৃথিবী এই ছাপান্নটা বছর আমাকে শুধু হুল ফুটিয়েছে। ভাল যা-কিছু পেয়েছি সবই একটা করুণার মোড়কে। আজ যা পেলুম তা স্বাভাবিক, স্বোপার্জিত।

চিঠি শেষ করে সুমন শুতে গেল। আজও সেই চাঁদের আলোর বাসন্তী রাত। সেই রুপোর তবক মোড়া নারকেল গাছের ঝিরিঝিরি পাতা। চাঁদ পোহাচ্ছে নিস্তব্ধ পৃথিবী প্রকৃতি। সমুদ্রের খাঁড়ির জলের মতো শুভ্র চাদরে শুভ্র চাঁদের আলো। সুমন রেখার মুখের দিকে তাকাল। এতদিনে কি বয়সের একটা ছোপ ধরেছে। সুমন আলতো একটা হাত রাখল রেখার বুকে। রেখার লম্বা-লম্বা আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। হীরের আংটি মাঝে মাঝে তীব্র আলোর তীর ছুঁড়ছে। সুমন মাথাটা হেলিয়ে দিল রেখার কাঁধে। নরম চুলের স্পর্শ।

সুমন ডাকল, 'রেখা!'

'বলো।'

'তোমাকে আমি এতদিন বলিনি। আমারও একটা শখ ছিল।'

'কি শখ! আমি চেষ্টা করব পূর্ণ করবার।'

'একটা মেয়ের শখ। ভাই আর বোন ছাড়া সংসার ঠিক খোলে না। বোন ডাকবে, দাদা, শোন্। ভাই ডাকবে সুমি। নামটাও আমি ভেবে রেখেছিলুম, সুমিতা।'

রেখা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, চাঁদের দিকে চেয়ে। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আর তো হবার নয়। বয়স চলে গেছে। এই সাধটা তোমার এবার অপূর্ণ রয়ে গেল। সামনের বার আবার যদি আমরা এই আকাশের তলায় কোথাও সংসার পাতি তখন তোমাকে আমি একটা ছেলে আর একটি মেয়ে দেবো, ঠিক দু'বছরের ব্যবধানে। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে।'

গঙ্গায় একটা স্টিমারের ভোঁ শোনা গেল। সুমন বললে, 'দেখতে কি

পাচ্ছ নাবিক?'

'কী?'

'তীর! তীর কি দেখতে পাচ্ছ? যাত্রা কি শেষ হল?'

'কালের যাত্রাধ্বনি শুনিতে কি পাও? পাই না। জীবনের হাটে বাজারে নিজেকে বেচে দিয়েছি। বড়, মাঝারি ছোট যন্ত্র-দানব, যান্ত্রিক মানুষের কানফাটান কলরব। ঘর্ঘর, ঝর্‌ঝর্। সভ্যতা ক্ষেপে গেছে। মানবের বুকে দানবের ধেই নাচ। জীবন-যজ্ঞের পুরোহিতরা বলির খাঁড়া হাতে ছাগলের সন্ধানে। বৃদ্ধ মেষ আর কচি পাঁঠায় লোভ।

তবু প্রকৃতি মানুষকে ভোলে না। গাছের মাথায় মাথায় ডাকঘর। হলুদ পাতার চিঠি। আসছি আমি শীত। কচি পাতার বার্তা— নতুন জীবন নিয়ে এসেছি প্রেমিক বসন্ত। পাকা সবুজে গ্রীষ্মের শ্বাস। প্রান্তরে ধূলার ঘূর্ণীতে দেবাদিদেবের নৃত্য— এসো বৈশাখ!

ঋতুরাজ গ্রীষ্ম

একটি সিঁদুরে আম, এক ঝলক ফোসকা পড়ানো রোদ, একটা ডুমো মাছির বুজুর বুজুর সঙ্গীত, একখণ্ড লাল মেঝে, একটা কাকের শুকনো ডাক, আর স্থিরপত্র বৃক্ষরাজি, আর কি চাই? গ্রীষ্মের চিত্র সম্পূর্ণ। গাছের ছায়া, তা-ও যেন গরমে গলে গেছে। একটা গরু চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে শুতে পারছে না, পাছে গায়ে ছেঁকা লেগে যায়।

ঋতুদের মধ্যে গ্রীষ্ম হল পুরুষ। গ্রীষ্মের দাপটে বর্ষা কেঁদে ফেলে। শরৎ আসে কাশ ফুলের উপহার নিয়ে বর্ষার অভিমান ভাঙাতে, হেমন্ত আনে শিশিরের গয়না। শীত ঢেকে দেয় কুয়াশার আঁচলে। ক্ষণ-বসন্ত দখিনা বাতাসের ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেয় সেই আঁচল। ঋতুরাজ গ্রীষ্ম জ্বলন্ত সন্ন্যাসীর মত ফিরে আসেন প্রব্রজ্যা শেষ করে। এই আবর্তনের সাক্ষী আমরা।

গ্রীষ্মকে আমি ভালভাবে দেখেছি। গ্রীষ্ম আমার প্রাণের বন্ধু। আমার শৈশব উন্মিলিত হয়েছিল গঙ্গার ধারের ছোট্ট এক ঢলঢলে গ্রামে। বাড়িটাও ছিল গঙ্গার ধারে। আর আমার পরিবার-পরিজনও ছিলেন রসিক মানুষ। অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু, সবই ছিল। ও-সব কেউ গ্রাহ্য করতেন না। স্পার্টান চরিত্রের মানুষ ছিলেন সব। একটাই কথা ছিল প্রেমসে বাঁচো। প্রকৃতির কণ্ঠলগ্ন হয়ে বাঁচো। বাংলায় তেমন সুবিধে করা যাবে না ভেবে, ইংরেজিতে বলতেন—All you have is your time on this earth. Use it while you can. পৃথিবীতে এসেছো নাঙ্গা হয়ে। সঙ্গে কিছুই আনোনি বাপু। একটি সম্পত্তি সঙ্গে করে এনছো, সেটা হল সময়। সময়ের মালিক তুমি। সেই সময়ের ব্যবহার করো যখনই সময় পাবে। আমের মতো, জামের মতো, জামরুলের মতো, কাঁঠালের মতো রসালো হয়ে বাঁচতে শেখো। আবার ইংরিজি. Live with nature.

বৈদ্যুতিক পাখার প্রবেশ নিষেধ। কারণ পাখা, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ-বাতাস-রাত্রিকে চরিত্রহীন করে তোলে। দিবাদ্বিপ্রহরে দোতলার ঘরের সব জানালা খুলে দাও। বৈশাখের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করো। আকাশ যেন

স্টিলের চাদর। পাখি ডানা মেলতে ভয় পাচ্ছে, যদি পালক পুড়ে যায়! টিনের চালে রোদ ঝলসাচ্ছে। পাড়ার ডাকসাইটে হুলো ভুলো সেই চালে পা ফেলে, ছ্যাঁকা খেয়ে তরতরিয়ে পালাল। উত্তাপ সে আন্দাজ করতে পারেনি। তার লক্ষ্য ছিল ক্লান্ত এক চড়ুই। ছোট্ট ঠোঁট দুটি ফাঁক করে সে একটু বাতাসের প্রত্যাশায় ছিল। বেড়ালের দ্রুত পলায়ন দেখে পাখি ডাকল—চিরাপ, চিরাপ। যেন বলতে চাইল, চিয়ার আপ, চিয়ার আপ।

দক্ষিণের ঋজু, ঋজু সাবেক আমলের লম্বা লম্বা গরাদ লাগানো জানালা দিয়ে ফিনফিনে বাতাস আসবে। গরম বাতাস। মাঝ সূক্ষ্ম তারের মতো একটু ঠাণ্ডার বুনোন। নিমের পাতা যেন কাঁপতে গিয়েও প্রলোভন জয় করে স্থির হয়ে যাবে। লাল মেঝেতে একটা মাদুর। তার ওপর ক্লান্ত একটি শরীর। দিবানিদ্রার ব্যর্থ চেষ্টা। দরদরে ঘাম। একটি হাতপাখার ক্লান্ত চলন। মাঝে মাঝে উফ্ আফ্ শব্দ। জমজমাট গ্রীষ্মের সে কি আনন্দ! প্রান্তরের বুক চিরে পথ চলে গেছে ক্লান্ত পথিকের মতো। রবীন্দ্রনাথ সেই পথ শুধু দেখেননি, অনুভব করেছিলেন, 'কী প্রখর রৌদ্র। উহু-হুহু। এক একবার নিঃশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্ত ধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে।' রাজপথের তপ্ত নিশ্বাস। একমাত্র কবিই পারেন সেই নিশ্বাসের স্পর্শ নিতে।

গ্রীষ্ম না থাকলে জলের মর্ম কে বুঝত! শান্ত দীঘি। গাছের ছায়া। একপাল্ হাঁস। একপাশে একটি বেড়া। কয়েকটি চালা বাড়ি। পায়ে চলা পথ। ধারে ধারে আগাছা। ঘাসের শীর্ষে স্থিরপক্ষ ফড়িং। আকাশ নেমেছে নির্জন প্রেমে। ঝরা ফুল ভাসছে জলে। বৃহৎ কোনো মাছ মাঝে মাঝে ঘাই মারছে। যেন গরম জল আর ঠাণ্ডা জল মেশাবার দায়িত্বটা তারই ওপর বর্তেছে। গাছের ডালে চামচে-ঠোঁট, একনিষ্ঠ মাছরাঙার অসীম প্রতীক্ষা। অদূরে গাছের ছায়ায় একদল শালিকের মহা উত্তেজিত আমসভা। যেন ভেঙে যাওয়া পার্লামেন্টের নতুন নেতা নির্বাচিত হচ্ছে। চন্দ্রশেখর না রাজীব! দূরে দেবীলাল ঝিম মেরে আছেন তৃষ্ণার্ত বায়সের মূর্তি ধরে। কোথাও কোনো ঝোপের আড়ালে একজোড়া ঘুঘুর হেঁচকি। গোটা ভারত-ভিটেয় কবে তারা চরতে পারবে, এই আফসোস।

হঠাৎ মশ করে একটা সরস শব্দ হবে। এক ঝলক তরল হাসি। গ্রীষ্মের ভরা দুপুরেই তো গ্রামের পরীরা আসে জলের ধারে। ঝকঝকে দাঁত

বসছে সাদা জামরুলের শরীরে। দংশিত হওয়ারও কি সুখ। ডুরে শাড়ি। বুকের ওপর গামছা ফেলা। নিটোল শীতল শরীর উত্তাপ ছড়ায় যত বাইরে। ঘাটের ছায়ায় সখীদের একান্ত মিলন। জামরুল আর ভীমরুল ছাড়া গ্রীষ্ম যেন মানায় না। ভীমরুলের ভোঁ ভোঁ ঝিমধরানো ডাক। যেন ভারিক্কি চালের কর্তা আমবাগান পাহারা দিচ্ছে। রোদের কুঁচো যেন এক একটি বোলতা। মৌমাছি যেন গ্রীষ্মের নেশা। চাকের খোপে খোপে মুখ জুবড়ে পড়ে আছে। লুঠেরার দল, আমফুল, জামফুল, লিচুফুল, নিমফুল, যেখানে যত মধু আছে সব এনে জড় করছে চাকের সরাইখানায়। পিঁপড়ে যেন তীর্থযাত্রীর দল। পিলপিলিয়ে চলেছে এক চটি থেকে আর এক চটিতে। বড় ব্যস্ত কাঠঠোকরা। সারাটা দুপুর গাছেগাছে তার ঠকঠকানি। মানুষের হৃদয়ে যেন হাতুড়ি পিটছে। পক্ষী জগতের নিলামবালা। ফড়িং হল প্রাণিজগতের হেলিকপ্টার।

জীবন যখন শৈশবের কোল ছেড়ে, কৈশোরের ধাপ ধরে যৌবনকে ছুঁতে চাইছে, সেই সন্ধিক্ষণে গ্রাম অথবা আধাশহরের গ্রীষ্ম বড় মধুর। একটু কষ্ট দেয় অবশ্যই, তবে সেই বয়সে মানুষ হাঁসের মতো কষ্ট ফেলে আনন্দটাকে গ্রহণ করতে পারে। তরুণ জীবন টাটকা ব্লটিং পেপারের মতো বেঁচে থাকার রসটুকু শোষণ করে নেয়। যে দাবদাহে মানুষ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অর্থ আর বিত্তবাসনায় জীবনতরুর দিনের পাতা ঝরাতে থাকে একটি একটি করে, তখন তার জীবনের কৈশোর পরোয়া করে না কোনো কিছুর। বাঁচতে ভাল লাগে বলে বাঁচার উন্মাদনা। মরতে ভয় করে বলে নেশার জগতে বাঁচা নয়। বেহিসেবী না হলে গ্রীষ্মের মহিমা বোঝা সম্ভব নয়। রোদ লাগলে সানস্ট্রোক হবে। ফল খেলে কলেরা হবে। জল খেলে জন্ডিস হবে। এই সব ডিফেনসিভ খেলায় জীবনের ফুটবল তেমন জমে না। গোল করো, গোল খাও।

গ্রীষ্ম হল কিশোরের, গ্রীষ্ম হল শিশুর। বেপরোয়ার ঋতু। গ্রীষ্ম হল তপস্বীর। কষ্টের বোধ থাকলে গ্রীষ্মকে পাওয়া যাবে না। আমরা যখন কিশোর তখন মনে আছে, দুরন্ত দ্বিপ্রহরে আমরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতুম, কখন বড়রা ঘুমিয়ে পড়বেন। যতক্ষণ না ঘুমোচ্ছেন ততক্ষণ ভীষণ মনোযোগী ছাত্র। হঠাৎ জানালার বাইরে তার আবির্ভাব। আমার মতোই আর এক কিশোর। আমার আগেই সে হয়তো নিজেকে মুক্ত করতে

পেরেছে। ফাঁকি দিতে পেরেছে শাসক শ্রেণীকে। একালে যাঁরা আরো প্রবল রূপ ধারণ করে কৈশোরটাকেই হত্যা করে বসে আছেন।

গণিতের খাতা, অনুবাদের বই, ব্যাকরণ, সব তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে গেল। চোরের মতো পা টিপে টিপে ভর দুপুরে পলায়ন। পাকা মানুষের, বিষয়ী মানুষের কল্পনার বাইরে। গরমে রোদে যখন দমবন্ধ হয়ে আসে, মাটিতে পা ফেলা মাত্রই যখন ফোস্কা পড়ার মতো অবস্থা, ছাগলেও যখন ছায়া খুঁজছে, সেই সময় দুই উন্মাদ কিশোর গ্রীষ্মের অভিসারে চলেছে। জীবনের পাঠশালা থেকে রুদ্রের পাঠশালায়। চৈত্রের ভৌতিক বাতাসে প্রান্তরের যত্রতত্র ধুলোর ঘূর্ণি বাউলের মতো নেচে উঠছে। ঝরাপাতা ওড়ার শব্দে অদৃশ্য মানবীর আঁচলের উপস্থিতি কল্পনাকে একটু প্রসারিত করলেই দেখতে পাওয়া যায়, আমবাগানের নিরালা ছায়ায় একটি কূপ, সেই কূপে জল তুলছে যে সে আমাদের বাতাসী নয়, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি। ভিক্ষু আনন্দ স্বয়ং গ্রীষ্ম। তৃষ্ণার্ত? তাঁর গম্ভীর প্রার্থনা ঃ

জল দাও আমায় জল দাও।
রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ, হা
আমায় জল দাও।
আমি তাপিত পিপাসিত
আমায় জল দাও।
আমি শ্রান্ত, হা
আমায় জল দাও।।

শীত আমাদের মোলায়েম একটু রোদ্দুর ছাড়া কি-ই বা দিতে পেরেছে। আর রঙবেরঙের বাহারী কিছু ফুল। ফুল নিয়েই সন্তুষ্ট। ফল সব বাইরের। না আপেল, না কমলা।

গ্রীষ্ম তো ওই একটা জায়গায় টেক্কা মেরে গেছে শীতকে। চৈত্রের আমবাগানে মধ্যদিনে ঢুকলে নেশা ধরে যাবে। আম্রমুকুলের মাতাল করা গন্ধ। সর্বত্র মধু বর্ষণের পুটপুট শব্দ। ফলসার চ্যাটালো পাতায় কচি সবুজ। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নাকছাবির মতো হলুদ হলুদ ফুল। ফল আসছে। গাছের তলায় দাঁড়ালে, মাথায় ঝরে পড়বে কুঁড়ি-ফাটা পাপড়ি। জামের উঁচু উঁচু ডালে, শিল্পীর আঁকা ছবির মতো লিটির লিটির জামের মুকুল। পেয়ারা গাছে মিল্কপাউডার খাওয়া ছুঁচোর মতো ছ্যাতরানো ফুল। বেলগাছ ছেয়ে

গেছে সবুজ ত্রিপত্রে। পাতার খাঁজে খাঁজে সবুজ পান্নার মতো বেলের থোলো। যেন মটরমালা। বকুল নেমেছে আসরে। টগর যেমন সাদা, জবা তেমনি লাল। কলকে হলুদ, গেরুয়া। রোদের কাছে সবাই ঋণী।

দুই কিশোর হাতে গাবভেরেন্ডার ডাল নিয়ে মেটে পথ ধরে চলেছে। কোথাও ছায়া নেই। ফুস করে বাতাস ফুঁ মারল। ছাইগাদা থেকে সাদা পাউডার লেজের ঝাপটা মেরে গেল। রাস্তার প্রতিটি বালি আর কাঁকরের দানা জ্বলছে; কিন্তু গাছের পাতা সতেজ, সবুজ। রোদ শুষছে। সূর্যই যে সবুজের কারণ। রাস্তা চলেছে সামনে, চালা-আটচালার ভেতর দিয়ে।

আমাদের নাকে হঠাৎ একটা সুগন্ধ এসে লাগবে। গুড় আর চিনি একসঙ্গে পাক হচ্ছে। এই হল গোপালদার বাতাসার কারখানা। তিনজন ভারিক্কি চেহারার মানুষ যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত বেশবাসে, চ্যাটাইয়ের ওপর অদ্ভুত কায়দায় একের পর এক বাতাসা পেড়ে চলেছেন। বিস্ময়কর দক্ষতা। ফুটো পাত্র থেকে মোটা রসের ধারা নেমে আসছে। হাত যেন ঘুরছে দক্ষিণী নাচের মুদ্রায়। আর একদিকে কাঠের গোল বারকোশে পাতা হয়েছে সাদা সুতো। বিশাল কড়ায় ফুটছে চিনির রস। কারিগর তাওয়া মেরে দেখছেন পাক কেমন হল। হিসেব বড় সাংঘাতিক। এক সুতো, দু সুতো, সাত সুতো, কোন্ পাকে মিছরি জমবে, মিছরির ওস্তাদই তা জানেন। রস ঢালা হবে কাঠের ওই গোল থালায় সুতোর জালির ওপর। রস ঠাণ্ডা হলেই জমে যাবে দানা মিছরি। চালার ভেতরের বাতাস উনুনের গরমে থিরথির কাঁপছে। বাইরের জমি এত উত্তপ্ত, কে এক খুরি জল ছুঁড়ল, তৃষ্ণার্ত বসুন্ধরা নিমেষে টেনে নিল। এই গ্রীষ্মে মিছরি আর বাতাসের কাটতি খুব বেশি। ফুল বাতাসার এক একখানা জলে ভিজিয়ে গালে ফেলো, পিত্তনাশ হবে! কাঠের ওপর খড়ির দাগ টেনে গোপালদা হিসেব রাখছেন, ক'থালা মিছরি নামল।

আমরা গুড়-চিনির গন্ধ নাকে নিয়ে, গায়ে খানিক উত্তাপ মেখে এগিয়ে যাবো সামনে। আরো কতো বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। বাঁই বাঁই করে চাক ঘুরছে। কুমোরপাড়া। লাল লাল হাঁড়ি, কলস, খুরি, ভাঁড় রোদে শুকোচ্ছে। চাকে তৈরি হচ্ছে মাটির গেলাস। অভয়দার হাতের কেরামতিতে আমরা হাঁ হয়ে যাবো।

মাটির গন্ধ, জল-কাদার একটা ভিজে ভিজে ভাব। কিছু দূরেই শেয়াল কাঁটার ঝোপ। দেখলেই মনে হয় সূর্য দিয়ে তৈরি। রসের ছিটেফোঁটাও নেই। অভয়দার চালার ওপর লতিয়ে উঠেছে লাউ গাছ। সকালের ফোটা ফুল দ্বিপ্রহরে চুপসে গেছে। ছাইয়ের গাদায় একটা ধুঁধুলের চারা চোখ মেলেছে। ধুলোর গাব্বুতে চড়াই নেমেছে চান করতে।

আমরা দুজন এদিক ওদিক তাকাই। একজনকে আমরা প্রায়ই খুঁজি। আমাদের বিশ্বাস এই জায়গাটাই সেই জায়গা। এইখানেই আমরা পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুণকে খুঁজে পাবো। বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে। গোঁসাই পাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।' কোনো এক দাওয়ায় আমরা ঠাকরুণকে দেখতে পাবো। রোজ সন্ধের পর একটু একটু জ্বর হচ্ছে। সর্বজয়া বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বুড়িকে। পরের দাওয়ায় শুয়ে আছেন তিনি ছেঁড়া মাদুরে। মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। আমাদের গভীর বিশ্বাস ভাঁড়টা তৈরি হয়েছিল অভয়দার চাকে। পেতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যেই চার আনায় বাঁধা দিয়ে চাল কেনা হয়েছে। ঠাকরুণ জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় থেকে খাচ্ছেন।

চৈত্র সংক্রান্তির সঙ্গে এক অসহায় বৃদ্ধা, জল, জ্বর, তৃষ্ণা, মেলা, চড়কের ঢাক সব এক হয়ে একাকার কল্পনা। আর একটু এগোলেই বাঁড়ুজ্যেদের পোড়ো ভিটে। আমরা দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকি প্রতীক্ষায়। একটু পরেই দুর্গা আসবে, সঙ্গে আসবে বেহারী চক্কতির মেয়ে রাজী। তারা ফিরছে গাজনের মেলা থেকে। সন্ধেবেলা ফোটে সন্ধ্যামণি, নয়নতারা। কোনো ভুল হয় না, তাহলে দুর্গা আর রাজীব কেন আসবে না! এই ছিল দুই কিশোরের যুক্তি। 'খুকীর পরনে ফর্সা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা।' আমাদের কল্পনার চোখের সামনে ঘটছে সেই নাটক। বাস্তব বলতে, বাঁড়ুজ্যেদের পোড়ো ভিটে, একটা আঁচলের মতো মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। তালের কাঁদি পড়েছে। সবই শাঁস। টলটলে জলে ভরা হৃদয়ের মতো। রুদ্র গ্রীষ্ম পারে না সেই অন্তঃকরণের জল শুষে নিতে।

বসাকদের সেই মজা ডোবা আমাদের কাছে ছিল কিং সলোমন'স

মাইনের মতো। কাদা শুকিয়ে ফাট ধরেছে। বৃদ্ধার ত্বকের মতো। আর সেইখানে সামান্য খোঁচাখুঁচি করলেই বেরিয়ে পড়ে একটি আনি কি দু-আনি, নিদেন কয়েকটি ডবল পয়সা। তখনো একালের হাল্কা ধরনের ফক্কিকারি নয়া পয়সার চল হয়নি। এক আনায় সেকালে অনেক কিছু পাওয়া যেত। একটা বড় তালশাঁস সন্দেশ। চারটে আলুর চপ। আটটা গুলি লজেন্স। কর্পদকহীন দুই কিশোরের কাছে সেই অর্থ ছিল সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির মতো। আমাদের গবেষণার বিষয় হত, কোথা থেকে আসে এই অর্থ! এ কি ধরিত্রীর দান! বর্ষায় ডোবাটা যখন টইটম্বুর পুকুর হয়ে যায়, তখন হয়তো পাড়া-প্রতিবেশী মহিলারা সন্তানের মঙ্গল কামনায় মানসিক করা এই অর্থ জলকে দান করেন। আমাদের তখন আফসোস হত, সমুদ্র কেন শুকোয় না। আমরা একবার একটা সোনার দুল পেয়েছিলুম; সেটাকে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছিলুম। অন্যের অলঙ্কার আমরা নিতে পারি না। সে হবে চুরির মতো।

আমরা হাঁ করে খেজুর গাছের খড়খড়ে পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। গ্রীষ্মের হাপর থেকে ফুস্ বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। অধ্যবসায়ী কাক ঠোঁটে পাতা কামড়ে ঝুলছে। তার একটা সোঁটা চাই। আর কয়েকদিন পরেই সে মা হবে, বোশেখী কাক। এই তো বাসা বাঁধার সময়। দিশি খেজুরের থোলো নেমেছে। কিছু সবুজ, কিছু পেকে লাল। টুপটাপ ঝরছে। মহানন্দে আমরা কুড়িয়ে চলেছি। এমন কিছু সুস্বাদু নয়। আঁটি আর চামড়া। সামান্য কষা। তা হোক। একেবারে গাছ-পড়া। আর কৈশোর হল সর্বভুক। ভেসে যেত সাবধান-বাণী, খাসনি, পেট কামড়াবে।

আরও একটা আকর্ষণ তো ছিলই। অস্পষ্ট ভাল লাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। আমাদের এই দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত এক কিশোরী। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা। সে-ই ছিল আমাদের কল্পনার দুর্গা। তার হাতে সত্যই একটা নারকেলের মালা। 'সেটা সে নীচু করিয়া দেখাই, কতকগুলি কচি আম কাটা।' বসাকদের জমিদারির একপ্রান্তে বিশাল আমবাগান। আমাদের কল্পনার অযোধ্যা। গাছের মাথায় হনুমানের লম্ফঝম্পটা ছিল নির্ভেজাল বাস্তব। নিচে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আমাদের কল্পনা। অশোক বনও ছিল। আমাদের এই কিশোরী বান্ধবীর নাম ছিল মালা। তার উদ্ভাবনী বুদ্ধির

অভাব ছিল না। আর ছিল অপর্যাপ্ত শাসন। বৈশাখের দুপুরে ভূতুড়ে বাতাস বইত হঠাৎ হঠাৎ। বোধহয় আমাদেরই কারণে। লিকলিকে বোঁটায় দুলছে কচি কচি আম। বাচ্চা হনুমানের মুখের মতো। বাতাসে দু' একটা ঝরবেই। তেল, নুন, লঙ্কা সহযোগে নারকেলের মালা থেকে কচি আমের টুকরো আর কোন্ ঋতু আমাদের মুখে তুলে দেবে! পোড়ো দেবালয়ের ইট বার করা রকে আমরা বসেছি। মাঝখানে মালা। সবে নাক বিঁধিয়েছে, ফুটোয় একটা বেল কাঁটা। দু কানে দুটো সুতো। নারী হয়ে ওঠার আয়োজন।

এই সেই বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

এমনই এক দ্বিপ্রহরে দেবদাসের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। শুরুটা হয়েছিল এইভাবে, 'একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুয্যেদের দেবদাস পাঠশালা ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল। এবং নিমেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়।' আমরাও একজোড়া দেবদাস। আমাদের পার্বতী ছিল মালা। তবে আমাদের কারও পিতাই জমিদার নারায়ণ মুখুয্যে ছিলেন না। জমিদারির আমবাগানও ছিল না। পরের বাগানেই আমাদের দ্বিপ্রাহরিক লীলা। জমিদারনন্দন দেবদাসের মতো ছোট হুঁকোয় আমরা তামাকও টানতুম না। আর আমাদের পার্বতী মালা, আমাদের কতটা ভালবাসত তা জানার সুযোগ হয়নি। কারণ গ্রীষ্ম বারে বারে ফিরে আসে, জীবনের কৈশোর নদীর স্রোতের মতো একমুখী চলেই যায়, চলেই যায়। তবে এইটুকু বুঝেছিলুম মেয়েরা হলো গ্রীষ্মের তালশাঁস। অত গরমেও টলটলে শীতল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মালার সঙ্গী-সাথীরা এসে যেত। শুরু হত তাদের এক্কা-দোক্কা খেলা। আমরা তখন সেই মায়া ছেড়ে এগিয়ে যেতুম সামনে। একটু দূরেই ভিখুর কামারশালা। একজন হাপর টানছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে ফুরফুর করে। লাল লোহার ওপর দমাস দমাস হাতুড়ি পড়ছে। দুটো মানুষ দরদরিয়ে ঘামছে। গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরানো হবে। সেটাকে আগুন জ্বেলে উত্তপ্ত করা হচ্ছে।

একটু পরেই লেগে যাবে চাকায়, সঙ্গে সঙ্গে জল ঢালা হবে। এক জোড়া চাকা মানে এক জোড়া বলদ। পিচগলা রাস্তায় ধুঁকতে ধুঁকতে মাল বোঝাই গাড়ি টানা। কবি লিখবেন ঃ

বন্ধু, কাবার হতেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আন্‌চান্‌ আইঢাই।
পীচে ও পাখায়, ঘরে কি ফাঁকায়, বাতাসে হুতাশে হায়,
প্রাণের পরণে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।

রোদের উত্তাপ, আগুনের উত্তাপ গায়ে মেখে আমরা আরো এগোব। কাঠ চেরাই হচ্ছে বংশীদার গোলায়। ফার্নিচার তৈরি হবে। ভিজে কাঠের মিষ্টি গন্ধ। বেড়ার ধারে ছাগলছানা কচি গলায় মাকে ডাকছে। খামোখা একটা গরু হাম্বা রবে চমকে দিতে চাইছে থমথমে দুপুরকে। এই দুপুরও কবিতার দুপুর,

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর;
আকাশ উপুড় করে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ক কণ্ঠ কাক!
গান নয়, সুর নয়
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

গ্রামের সীমানা শেষ হল, আদিগন্ত চষা ক্ষেত, ফুটিফাটা। ঘাসের বোঝা রোদে পুড়ে ঝিরকুট। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে চালা একপাশে। বাঁখারির কঙ্কাল। এই কি সেই গফুর জোলার বাড়ি! এই গ্রামের নামই কি কাশীপুর? কাহিনীর শুরু কি এইখানেই?

'সম্মুখে দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিমঝিম করে—যেন নেশা লাগে।'

গ্রীষ্মের কি নিষ্ঠুর রূপ, 'গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা

একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়।'

এই ভিটেতেই গফুরের বলদ মহেশ আমিনার ঘট ভেঙে জল খাবার অপরাধে প্রাণ দিয়েছিল। গ্রীষ্ম, তুমি অপরাধী? না দারিদ্র্য অপরাধী, না কি জাতপাত বিভাজনকারী উচ্চ বর্ণের মানুষ অপরাধী! আজও কি গফুর নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে মুখ তুলে বলছে না, 'আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো মাপ করো না।'

দু'সার বাবলা গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ধোঁয়াটে পথ। অতি কাতর এক বাছুর মাতালের মতো টলতে টলতে চলেছে। ডোমপাড়ায় চ্যাটাই বুনছে দশবারোজন মেয়েমদ্দ। তিনটে শূকর ঘুরছে ঘোঁত ঘোঁত করে। পথ বাঁক নিয়ে চলে গেছে গঙ্গার ধারে। জলে গুলেছে মধ্যদিনের সূর্য। বাতাস নেই। আকাশে নীল ঝরছে শুকনো গুঁড়োর মতো। শিবমন্দিরের লিঙ্গেশ্বর শুকিয়ে কাঠ। শুকনো বেলপাতা খসে পড়ে গেছে। কোনোমতে গোটা দুই আকন্দ ফুল পাথরের লিঙ্গের মাথায় ভারসাম্য বজায় রেখে স্থির হয়ে আছে। দেয়ালে উৎকীর্ণ মহাবীরের মূর্তি। কালো একটা কুকুর একটু ঠাণ্ডার খোঁজে আশ্রয় নিয়েছে বেদীর তলায়। বাঁধানো বট। ছায়া ফেলেছে তলায়। একদল মৎস্যজীবী বসে আছে। কেউ জাল বুনছে, কেউ শুধু উদাস চোখে জলের দিকে তাকিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। জল নেমে গেছে বহু দূরে। পাঁতায় সার সার চিৎ হয়ে আছে জেলে ডিঙি। সকলেই অপেক্ষায়। হঠাৎ একজন চিৎকার করবে, জোয়ার এসেছে, নৌকো ভাসা। সে যেন এক যুদ্ধ। অলস মানুষগুলি এক ঝটকায় নিজেদের তুলে ফেলবে বটের ছায়াবেদী থেকে। ডিঙিগুলো পিছলে নেমে যাবে জলে, এক একটা কেঠো কুমীরের মতো। জোয়ারের জলে মাছ আসবে সমুদ্র থেকে।

এই কি সেই শান্ত, শীর্ণ নদী। যার ভাষা-দর্শন পাওয়া যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনায় ঃ 'স্বল্পতোয়া ক্ষুদ্র নদীটি শৈবালাদি জলজ

উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ, কেবল স্নানের ঘাটটি পরিষ্কার। তীরে বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুই-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে কালো বালির সঙ্গে ঝির-ঝির করিয়া অতিঠাণ্ডা নির্মল জল উঠিতেছে। নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের প্রান্ত দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। অনেক দূর হইতে তাহার তীরবর্তী বাঁশঝাড়, বটগাছ ও বাঁশ-জলের বাঁশের উচ্চ অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।

সে নদীর নাম হয়ত শীলাবতী। তাতে কিছু যায় আসে না। একই দৃশ্য, 'কলসগুলি ভাল করিয়া মাজিয়া রমণীগণ স্নানান্তে কলস ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে। কাহারও কলসীর মুখে পিতলের ছোট একটা তেলমাখা বাটি, তাহার উপর একটা কাঁচা আম। কলসীটি কক্ষে লইয়া তাহারা অতিকষ্টে রৌদ্রতপ্ত ধূলিবর্জিত বিজনগ্রাম্যপথ দিয়া চলিতেছে। কলসে জল ছল্ ছল্ করিয়া বাজিতেছে, জলসিক্ত পদাঙ্ক দেখিতে দেখিতে মাটিতে শুকাইয়া যাইতেছে।

এমন দৃশ্যে শিল্পী কেন প্রলুব্ধ হবে না! একপাশে মাথায় তোয়ালে চাপা দিয়ে হাঁটুতে বোর্ড রেখে তন্ময় হয়ে আছেন শিল্পী মানিকদা। রঙভরা তুলি। চোখের সামনে নিজন-বিজন গ্রীষ্মলীলা, 'শান্ত নদীটি, পটে আঁকা ছবিটি/ঝিম্ ধরেছে, ঝিম্ ধরেছে গাছের পাতায়/পাল গুটিয়ে থমকে আছে ছোট্ট তরীটি।' আর কোথাও কি বসে আছেন শিল্পী হেমেন মজুমদার? সিক্তবসনা সুন্দরীর দেহপটে নিমগ্ন হয়ে! বসন্তলাল দুপুরে বাড়ির স্টুডিয়োতে বসে তেলরঙে আঁকবেন স্টিল লাইফ গ্রীষ্মের উপাদানে। ধবধবে সাদা আচ্ছাদনে আবৃত গোল টেবিল। একটি ফুলদানি! যত রোদ, তত সাদা, কমলা, নীল আর লাল ফুল। একটি গেলাস। ভেতরে ঠাণ্ডা পানীয়, বাইরে জলকণা জমে শিশিরের বিন্দু। একটি দ্বিখণ্ডিত লাল তরমুজ। আড় করে রাখা ইস্পাতের ছুরি। দ্বিখণ্ডিত পেঁপে। এক থোলো কালোজাম, জামরুল আর বুটিদার লিচু। কয়েকটি সিঁদুরে আম। এটা হলুদ বোলতা। পেছনে প্রায় সাদা সামান্য নীলচে একটা পর্দা। একগুচ্ছ লাল গোলাপ কোথাও রাখা যেতে পারে। গ্রীষ্মের স্থির চিত্র সম্পূর্ণ।

আমিও গফুর জোলার মতো আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে পারি, 'আল্লা, এই কংক্রিট সভ্যতার বিচার করো। যারা গ্রাম কেড়ে নিয়ে বলেছিল শহরের সুখে তোমাকে রাখব, পীচের মসৃণ পথ, কল ঘোরালেই জল, বোতাম টিপলেই আলোর ভেল্কি দেখাবো অথচ তা হল না। আমার

গ্রামও গেল শহরও গেল। আমার সেই ছবি আমি ফিরে পেতে চাই। নিয়ে যাও তোমার নগরসভ্যতা। আমার বাগান কোথায়?' যার 'বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ধূসর আকাশ হইতে সূর্যদেব জ্বালাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এলোমেলো বাতাসে পথের ধূলা ও গাছের শুষ্কপত্র উড়িয়া যাইতেছে। রৌদ্রকাতর উত্তপ্ত প্রকৃতির নিদাঘক্লান্তিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটা কোকিল নিদাঘ-মধ্যাহ্নেও ঘনপল্লবদলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কুহু কুহু শব্দে কুহরিয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য বালকেরা বিশ্রামসুখ পরিত্যাগপূর্বক ছুরি ও নুন লইয়া আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কণ্টকময় বঁইচি-বনে ঘুরিয়া সুপক্ক কালো বঁইচি-ফলের গুচ্ছ খুঁজিতে খুঁজিতে কুহুস্বরের প্রতিধ্বনি করিতেছে। কোকিল বুঝি তাহাতে অপমানিত হইয়া কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিয়া পঞ্চম হইতে সপ্তমে তুলিতেছে, শেষে ক্লান্ত হইয়া নীরব হইতেছে। কেহ কোন রাখালের পাঁচনখানি চাহিয়া লইয়া গাছের উচ্চশাখা হইতে কাঁচা আম পাড়িতেছে। বাগানের নিবিড়তর অংশে একটা শৃগাল উপুড় হইয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে এবং কোনোও দিকে সামান্য একটু শব্দ হইলেই মাথা তুলিয়া উদ্যতকর্ণে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।'

বাগান কেটে বসত হয়েছে। ঘিচিঘিচি মানুষের খুপরি খুপরি আস্তানা। নতুন শব্দ কানে ঢুকছে, 'প্রোমোটার'। যাঁরা অতীত গুঁড়িয়ে বর্তমান তৈরি করবেন। ফলে গ্রীষ্মের শোভা গেছে। সব অলঙ্কার অপহৃত। কষ্টটাই আছে রোমাঞ্চটা নেই। তবু জীবন যেখানে শুরু হয়েছিল দূর অতীতে, সেখানে খাঁড়ির জলের মতো অতীত কোথাও কোথাও রয়ে গেছে। কারোর তেমন নজরে পড়েনি এখনো। ঘাপটি মেরে বসে আছে পলাতক অপরাধীর মতো। আমার অন্বেষণের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নিশীথে' গল্পে লিখছেন, 'আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নিচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরো বাগান বানাইয়াছিলেন। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া

রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।'

সেই বাগান আজও আছে। মনে হয় সেই বাগানই। একটু জীর্ণ হয়েছে। সমঝদার মানুষেরা সব চলে গেছেন, এসেছেন ব্যবসাদারেরা। একাল সেকালকে ভাঙতে চায়। তবু আছে। হাতবদল হয়েছে। বিশাল গেট ঠেলে অনুমতি নিয়ে ঢোকা যায়। মোরাম বিছানো পথ। সেই বকুল। বাঁধানো বেদী। তাকিয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে উঠে আসেন দক্ষিণাচরণবাবুর রুগ্না স্ত্রী। 'আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলার প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। দুটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ।' হঠাৎ চেতনা আসে, দক্ষিণাচরণবাবুর মতো আমিও হ্যালুসিনেশানে আক্রান্ত। হয়তো কেউ শুয়ে আছে। শুয়ে আছে অসুস্থ বর্তমান। গ্রীষ্মের বাতাস পলিউশানে ভারি। 'ঘনসুগন্ধপূর্ণ' নয়, ডিজেলগন্ধী। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে কলের ধোঁয়া। চাঁদ ওঠে। রুপোলি আলোর বদলে পাই পিত্তবর্ণের আলো। এখন ভয় করে। এখন আর আনন্দে নয় বলি মহাআক্ষেপে, মরিয়া হয়ে, কবি যা বলেছিলেন সাধকোচিত বীরত্বে, 'নাই রস নই, দারুণ দাহনবেলা/খেলো খেলো তব ভৈরব খেলা।।/যদি ঝড়ে পড়ে পড়ুক পাতা/ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা/থাক জনহীন পথে পথে মরীচিকা জাল ফেলা।। শুষ্ক ধুলায় খসে-পড়া ফুলদলে/ঘূর্ণী-আঁচল উড়াও আকাশতলে/প্রাণ যদি কর মরুসম তবে তাই হোক—হে নির্মম/তুমি একা আর আমি একা কঠোর মিলনমেলা।।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের বৈরাগ্য-মুগ্ধ ছিলেন। মৌনীতাপস, স্বয়ং রুদ্র হলেন গ্রীষ্ম। কি তার ব্যাপ্তি! কি তার তেজ। বিশ্বমন্দিরের বাঘছালের আসনে এসে বসেছেন দিব্যকান্তি সাধক। শ্বাস বইছে সুষুম্নায়। মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছেন কুম্ভকে; তখন গাছের পাতা নড়ছে না, নৌকোর পাল ঝুলে পড়ছে। এই রুদ্রের কাছেই প্রার্থনা, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে/এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।।'

বিচিত্র এই যন্ত্রসভ্যতা। একদিকে বাড়িয়ে চলেছে উত্তাপ, অন্য দিকে তৈরি করছে ঠাণ্ডিঘর। মানুষে আসছে নতুন বিভেদ। শীতল ঘরে বড় মানুষ। মানুষ কিন্তু জাত আলাদা। আর খেটে খাওয়া ঘর্মাক্ত মানুষ। একদল অসহিষ্ণু, অন্যদল সর্বংসহ। এই নিয়ে যত আন্দোলন, বিভেদ। ঝাণ্ডা আর ডাণ্ডা। উত্তাপই জীবন। শীতল ঘরের বন্দী মানুষ রেশম কীটের মতো বড় একা। নিজের ঐশ্বর্যের তন্তুতে আবদ্ধ। কোন কবি তাদের কথা বলবেন না; কারণ জীবন ওখানে জীবন্মৃত। বরং কবি বলবেন, 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের/ মুটে মজুরের/আমি কবি যত ইতরের/আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের।'

রবীন্দ্রনাথ জীবনে কর্ম আর ঘর্ম, দুটোকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। বোলপুরে প্রখর দারুণ অতি দগ্ধ দীপ্র দিনে তড়িৎব্যজনী ত্যাগ করে গরমটাকেই উপভোগ করতেন। 'তপ্ত বোশেখে আকাশে বসে কে আগুন ফোয়ারা হানে?' রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করে থাকতেন কখন আসবে কাঙ্খিত কালবৈশাখী। সৃষ্টির একপাশে বসে দেখতেন, ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে/ছুটে চলে চাষী/ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত/তীরপ্রান্তে আসি।।'

গ্রীষ্মকে নিতে হলে রিক্ত হতে হবে। বিরক্ত হলে চলবে না।

সহ্যের নাম গ্রীষ্ম। এই শহর জীবনে গ্রীষ্মকে মনে হতে পারে মৌনীতাপস নয় দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক। কেবলই চাবকাচ্ছে; কারণ সভ্যতার সঙ্গে গ্রীষ্মের অহিনকুল সম্পর্ক। গাছ নেই, শুধু রাজপথ। বিশাল বিশাল বাড়ি। ধাতুর চাদর মোড়া শম্বুকগতি যানবাহন। ঠাসা মানুষ। টেরিলিন, টেরিকটন। ধুলো-ধোঁয়া। দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসে। এ হল মানুষের কেরামতি। নিজেদের কলে পড়ে নিজেরাই মৃতপ্রায়। শিল্প শহরে গ্রীষ্ম যেন নিপীড়ক। লোহার খাঁচা, ইটের স্তূপ, ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুন, সিমেন্ট কারখানা, উত্তাপে বালি গলে কাঁচ হচ্ছে, লোহার গাড়ি লোহার লাইন ধরে ছুটছে। টেলিগ্রাফের তারে হতবাক শ্যামাপাখি। আমাদের চুল ধুলোয় পিঙ্গলবর্ণ। পিঠের জামা ঘামে ভেজা। মুখ পুড়ে বাদামী। দু' চোখে জ্বালা। কারো কারোর মাথায় ছাতার ব্যর্থতা। এরই মাঝে সিগারেটে দমভর টান। মোগলাই খানাঘরে প্রভূত মশলা সহযোগে রামপাখির ঠ্যাং ধরে টানাটানি। বোতলের বুড়বুড়ি কাটা নরম পানীয়। প্রেক্ষাগৃহে বসে বসে দরবিগলিত

ঘাম, পর্দায় বরফপ্রান্তরে নায়িকার নৃত্য। ময়দানের অন্ধকারে বাতাসভুক মানবমানবী। পেছনে অন্ধকারে নিমজ্জিত খাসা শহুর। কোলাঘাটে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ডিগবাজি। শেষ ট্রাম ধরে দমবন্ধ গলির, আটকাঠ বন্ধ আস্তানায় ফিরে আসা। একই ঘরে কয়েকজনের ঠাসাঠাসি। শুকনো কল। ঝাঁঝালো বাথরুম। এরই মধ্যে ক্যাসেটে বেগম আখতার, কোয়েলিয়া, গান থামা এবার। উদ্দাম হরিনাম সংকীর্তন। ভাড়াটে বাড়িঅলার খণ্ড যুদ্ধ। কাংস্য চিৎকার। ছাপাখানার ধড়াস ধড়াস শব্দ। গ্রিল কারখানায় লোহাপেটাই। মাতালের মধ্যরাতের গান, সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই মা তারা বলে/আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ/যত মদ-মাতালে মাতাল বলে!'

ছড়াস্ করে একটা শব্দ অতীত থেকে এসে কানে বাজে। কলকাতার রাস্তা তখন জল দিয়ে ধোয়া হত। আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে হেদোর উল্টো দিকে দাঁড়াতুম, আর তখনই কাণ্ডটা ঘটত। হোসপাইপের জলে জলে দিগ্বিদিক প্লাবিত। মাঝে মধ্যে আমরাও স্নাত হতাম। উত্তপ্ত রাস্তা জলে ভেজার সঙ্গে সঙ্গে শৈত্যের গন্ধ ছড়াত। ভিজে রাস্তার মাথার ওপর শহরের আকাশ হয়ে উঠত মন কেমন করা নীল। কোথা থেকে বেরিয়ে আসত রঙ-বেরঙের ফেরিঅলার দল। কেউ হাঁকছে বেলফুল, কেউ হাঁকছে মালাই, গোলাপী রেউড়ি, হরিদাসের বুলবুল বাজার ঘুঙুর পায়ের নাচ। বিখ্যাত শরবতের দোকান লম্বা লাইন। ভ্যানিলা, আইসক্রিম, আমপোড়া, ডাবের শরবত। দেখতে দেখতে মুচমুচে পাপর ভাজার মতো একটা দিন রাতের কোলে নেতিয়ে পড়ত। ফটফটে তারা, ভাঙা চাঁদ। দূরাগত সানাই। গ্রীষ্মের বিবাহ। রজনীগন্ধার মালার সুবাস। শোলার টোপরে অভ্রের কুঁচি।

গ্রীষ্ম আর বর্ষা এই তো আমাদের ঋতু। মুখচোরা শীত, ফিনকি বসন্ত ধর্তব্যেই আসে না। গ্রীষ্ম এক উদার প্রান্তর। দয়া, মায়া, সাধনা, নিষ্ঠুরতা মেশানো প্রখর এক ব্যক্তিত্ব। কত কাজ, কত কর্তব্য তাঁর। শীত জরায় রিক্তপত্র বৃক্ষশাখে সাজাতে হয় নবীন উদ্ভেদ। ফোটাতে হয় পদ্ম। সারাদিন জলকে বাষ্প করে চরাতে হয় মেঘের পাল। বাতাসকে উত্তপ্ত করে পৃথিবীর বুকে রচনা করতে হয় শূন্যতা, ছোটাতে হয় দামাল কালবৈশাখী। দখিনের জানালা খুলে বহাতে হয় দখিনা বাতাস। দুর্দম, নিশ্চিত, নূতন, নিষ্ঠুর-নূতন। এ সবই তাঁর বিশেষণ।

‘হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।’

কোই হ্যায়! আছে - তোমার সঙ্গে ঘুরছে তোমার ছায়া।। বড় একা লাগে! সে কি? তোমার ভেতর ত আর একটা আমি আছে। সে-ই ত বড়বাবু। কথা বলে না। কেবল শ্বাস ফেলে অবিরত। প্রাণে বায়ু সঙ্গী করে বেড়াও ঘুরে জগৎ-পথে। এই প্রাণ-পাখি ছাড়বে খাঁচা, অবশ্যই একদিন। সব রঙ্গ শেষ হবে ভাই, থাকবে পড়ে দেড় কেজি ছাই।

বলো হরি নেচে নেচে
দোসর কোথায় পাবে খুঁজে।

বসে আছেন তিনি!

ঠিক যেমন বসে থাকতেন গত শতাব্দীতে। বাইরেটা অনেক বদলে গেছে! বৈষয়িক জগৎ তো পাল্টাবেই। মোমের আলো, প্রদীপের বাতি, ছায়া অন্ধকার, নিঃসীম নির্জনতা, বাতাসের পত্রশালার দীর্ঘশ্বাস, হাতপাখার মন্থর আন্দোলন, ধীরগামী যানবাহন, শতাব্দী গুটিয়ে নিয়েছে। এখন চড়া আলো, কর্ণবিদারী শব্দ, ব্যবসা-বাণিজ্য, থই থই জনসমুদ্র। তবু তিনি আছেন। বাস্তবের খাটে, ভাবের জগতে, ভক্তির দৃষ্টিতে।

তিনি বসে আছেন, সব শূন্যতা পরিপূর্ণ করে। বসে আছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

'হ্যাঁগা, তোমার সমস্যাটা কী?'

'ঠাকুর আমার ভীষণ ভয়।'

'কিসের ভয়?'

'হারাবার ভয়।'

'কি পেয়েছ যে হারাবে? তুমি তো এসেছ। এসে পড়েছ। যা ছিল তার মধ্যে এসে পড়েছ। আবার একদিন সময় হলেই চলে যাবে। যা ছিল তা পড়েই থাকবে। তুমি আছ, তুমি থাকবে না। এর মধ্যে তোমার কোন্‌টা! একদিন তুমি তাকালে। আলো, আকাশ। ছোট ছোট কিছু প্রবৃত্তি। খিদে পায় কেঁদে ওঠে। অস্বস্তি হয় চিৎকার করো। গর্ভধারিণীকে খোঁজো। অসহায়, অজ্ঞান একটি শিশু। তখনো তোমার কথা ফোটেনি। বোধের বিকাশ ঘটেনি। জান না কোথায় আছ, কাদের মধ্যে আছ! তুমি কেমন আছ! তুমি ধনী না দরিদ্র! তোমার জাত কি! তোমার ভাষা কি! তুমি তখন শুধু গন্ধ চেন। মায়ের গায়ের গন্ধ। উষ্ণতা। সময় কিন্তু তোমাকে নিয়ে চলেছে। তুমি সময়ে বাড়ছ। এই সময় এক অদ্ভুত প্রবাহ। কেউ ফুটছে, কেউ ঝরছে। কারো শেষ হচ্ছে, কারো শুরু।'

'আমার যে সেই গানটা মনে পড়ছে ভগবান!

'মনে যখন পড়ছে তখন গেয়েই ফেল। আমাকে তো অনেকেই অনেক গান শুনিয়ে গেছে।'

'তাহলে শুনুন রবীন্দ্রনাথের গান ঃ

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা।।
তোমার জ্বলে বাতি, তোমার ঘরে সাথি
আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা।।
তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল
তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়, আমার হাতে ক্ষয়
তোমার মনে ভয়, আমার ভয় হারা।।'

'ওই তো আমি তোমাকে যা বলছিলুম, অনেকটা সেই ভাব। ঘুরছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। প্রবেশ, অবস্থান, প্রস্থান। সময় যখন তোমাকে চেতনার স্তরে পৌঁছে দিল, সে যেন হঠাৎ, আরে, ওই তো নীল আকাশ, ওই তো পাখি, সবুজ গাছের পাতা। এই তো রোদ, সকাল। চারটে দেয়াল, দরজা, জানলা, রক, বারান্দা। এ কে? আমার মা। ওই তো আমার বাবা, দাদা, কাকা, দিদি, পিসি। এরা সব ছিল, এই ভাবেই ছিল। তুমি এসেছ। একটা নৌকো, তুমি উঠেছো। জনমঘাট থেকে মরণঘাটের যাত্রী তুমি। ফিতের মতো পড়ে আছে লম্বা সময়। এপাশে একটা বাঁশ ওপাশে একটা বাঁশ। টানটান বাঁধা তার। বৃষ্টি হয়ে গেল। জলের ফোঁটা ঝুলছে তারে। একটা, দুটো, অনেক। জীবন। ফোঁটাগুলো তার ধরে এগোচ্ছে সড়সড় করে। এক একটা ফোঁটা এক এক দূরত্বে গিয়ে ঝরে পড়ছে। কোনোটা অনেকটা যাচ্ছে, কোনোটা ঝরে পড়ছে একটু গিয়েই। এই হল আয়ু। একটু বেশি, একটু কম। সেই যে পেনেটির মহোৎসব থেকে ফেরার পথে মতি শীলের বাগান-বাড়িতে ওরা সব ঝিল দেখাতে নিয়ে গেল, তুমি কি সেই দলে ছিলে?'

'হয়তো ছিলুম, আবার নাও থাকতে পারি! পূর্বস্মৃতি তেমন জোরালো নয়।'

'ওদের বলেছিলুম, জল দেখলে মন শান্ত হয়। নিরাকার ধ্যান ভাল

জমে। তাই নিয়ে গেল। সেদিন আমার শরীরটা সুবিধের ছিল না। সর্দি হয়েছিল। তার আগে পেনেটিতে মণি সেনের বাড়িতে খুব নাচানাচি হয়েছে। তবু গেলুম। বাগান, ঠাকুরবাড়ি, ঝিল, লোভ সামলানো যায়! তুমিই বলো না। সন্ধে হয় হয়। মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করে পূব দিকের ঝিলের ধারে গেলুম। মাস্টারকে বলেই রেখেছিলুম। নিরাকার ধ্যান কি ভাবে আরোপ করতে হয় শেখাব। তুমি ধ্যান করো। ধ্যান কাকে বলে জান?'

'আজ্ঞে ধ্যান কাকে বলে জানি; কিন্তু ধ্যান করতে পারি না। মন ছিটকে যায়। ফুটবলের মতো।'

'তা তো যাবেই। বিষয়ীর মন মাছির মতো। মন থেকে বিষয় ফেলে দিতে না পারলে ধ্যান হয় না। হ্যাঁ, যে-কথা হচ্ছিল, ঝিল। মতি শীলের বাগানবাড়ির ঝিল। জলে মাছ খেলা করছে। কেউ মাছ মারতে আসে না তাই নির্ভয়! মুড়িটুড়ি দিলে ঝাঁক বেঁধে আসে। সেই মাছের খেলা দেখতে দেখতে ওদের একটা কথা বলেছিলুম, তোমাকেও সেই কথাটা বলি— চিদানন্দ সাগরে ওই মতিশীলের ঝিলের শত-শত মাছের মতো আনন্দে বিচরণ করো। দিন ফুরলে মৃত্যু এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'মানে মুক্তি!'

'কে বলেছে বাপু মৃত্যু মানে মুক্তি। আসবে যাবে, আসবে যাবে, এই তো জীবের জীবন। মুক্ত হবার ইচ্ছে না থাকলে মৃত্যু কি মুক্তি দিতে পারে! কামনা-বাসনার টানা-পোড়েনে জীবনের নকশা। কামিনী আর কাঞ্চন। শিশ্ন আর উদর। বলছিলে না, তোমার ভয় করছে! হারাবার ভয়। ইট দিয়ে গাঁথা চারটে দেয়াল। মাথার উপর ছাত। এক চিলতে জানলা। কয়েকটি প্রাণী। তোমার স্ত্রীপুত্র পরিবার। উনুন জ্বলছে, কয়লা পুড়ছে। জীবন জ্বলছে। অভাব-অনটন। রোগ-শোক। দেনাপাওনা। জালে পড়ে আছ। আমার সেই উদাহরণটা তোমার মনে আছে? বলেছিলাম, সেদিন এই ঘরে কে কে ছিল? বিজয়, মানে তোমাদের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বলরাম মাস্টার আরো সব ছেলেরা। ওই কথাই হচ্ছিল, মৃত্যু আর মুক্তি। শরীর ত্যাগ করলেই জীবের মুক্তি হয় না। জীবের চার থাক—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য। সংসার হল জাল, জীব যেন মাছ। ঈশ্বর—যাঁর মায়া এই সংসার, তিনি জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ

জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এরা হল মুমুক্ষু জীব। মুক্তি খুঁজছে। যারা পালাবার চেষ্টা করছে, সকলেই পালাতে পারে না। দু-চারটে মাছ ধপাঙ শব্দ করে পালায়। তখন লোকেরা বলে, ওই মাছটা বড় পালিয়ে গেল! এই যে পালাল, এইরকম দু-চারটে লোক হল মুক্তজীব। কিছু মাছ এত সাবধানী যে, কখনো জালে পড়ে না। উদাহরণ, নারদ। এঁরা হলেন নিত্যজীব। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে, অথচ এ-বোধ নেই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। জালে পড়েই জলসুদ্ধ চোঁ-চা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নেই বরং আরো পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব সংসারে—অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না।'

ভগবান ভাবমগ্ন হলেন। হঠাৎ গান ধরলেন, অপূর্ব কণ্ঠস্বর,

শ্যামা মা কি কল করেছে;
কালী মা কি কল করছে
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে।।
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরায় ধ'রে কলডুরি,
কল বলে যে আপনি ঘুরি, জানে না কে, ঘুরাতেছে।।
যে কলে জেনেছে' তাঁরে কল হতে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।।

পশ্চিমে কলস্বিনী ভাগীরথী। মালগাড়ি চলেছে ব্রিজের ওপর দিয়ে। ওপারে কোথাও সানাই বাজছে। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ভগবান বললেন, 'তোর ভয় করে, তাই না! নিজেকে ল্যাংটো কর। ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। হিসেব করে দেখ, তোর কি আছে! একটা অভ্যস্ত জীবন ছাড়া তোর কিছুই নেই। অভ্যাস ছেড়ে বেরিয়ে আয়। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন।'

আমরা যেন বিশাল একটা হাটে বসবাস করছি। ব্যবসা। ব্যবসা ছাড়া কোথাও কিছু নেই। অষ্টপ্রহর কলকোলাহল। সময়ের স্রোতে কচুরিপানার মতো ভেসে চলেছে জনজীবন। কে কোথায় যাচ্ছে, কোনো ঠিকঠিকানা নেই। তবে যে আপনি বলেছিলেন, 'কামকাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিছু হবে না!'

সে আমি কাদের বলেছিলুম গো! সকলকে নয়। যারা চায় তাদের বলেছিলুম। কাকে চায়! যাঁকে পেলে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। এই চাওয়া ক'জনের আছে! হাতে গোনা যায়। সকলের ভেতরেই একটা আমি আছে। নীচ আমি, বজ্জাত আমি। এই বজ্জাত আমিটা কেমন? সে তো তুমি ভালই জান। যে 'আমি' বলে, 'আমায় জানো না? আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে! যে 'আমি'তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই আমি খারাপ। এই 'আমি'র লড়াই সংসার জুড়ে। সেই গল্পটা মনে আছে? একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতি সেই গর্ত ডিঙিয়ে গিয়েছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে সে খুব রাগ করে হাতিকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্যি যে, আমায় ডিঙিয়ে যাস! এই হল টাকা। আমি আর আমার টাকা। মানুষ নেশায় বুঁদ। উড়ছে কাগজ ধরছে মানুষ।

'শ্যামাধন কি সবাই পায় রে। কালীধন কি সবাই পায়;
অবোধ মন বোঝে না, একি দায়!
শিবেরও অসাধ্য সাধন, মন মজানো রাঙা পায়॥
ইন্দ্রাদি-সম্পদ-সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মণীন্দ্র ইন্দ্র, যে চরণ ধ্যানে না পায়
নির্গুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায়॥'

কাম-কাঞ্চন দুটো আসক্তি তা আমারও আছে। ডিশে সাজানো গরম আগুন আলুর চপ। হাত দিচ্ছি, ছ্যাঁক লাগছে, ছেড়ে দিচ্ছি। আবার ধরছি।

শেষে কামড় মেরে গরমে হা হা করছি। শেষে ঝালেতে, গরমেতে নাকের জলে, চোখের জলে। তবু বলছি আহা কি স্বাদ! তারপর অম্বল। নিয়ে আয় দাওয়াই। প্রতিজ্ঞা, আর কোনো দিন নয়। আবার একদিন।

ভাসতে ভাসতে আমার শৈশব আজ যৌবন পেরিয়ে কোথায় চলে এসেছে! অতীত এখন স্মৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস। নিজেকে নিজে নষ্ট করেছি। আমার নিজের কি ছিল জানি না। একটা পুরনো বাড়ি ছিল। কিন্তু এই অনাথটিকে পুত্র-স্নেহে যাঁরা মানুষ করেছিলেন, আমার সেই পালক পিতা-মাতা, তাঁরা আমাকে কি না দিয়েছিলেন, সৎ শিক্ষা, সৎ সঙ্গ, পুণ্য পরিবেশ। অলৌকিক আধ্যাত্মিক পুরুষেরা আমার সেই কৈশোর দীপশিখাটিকে আড়াল করে রেখেছিলেন। উচ্চভাবসমূহের তৈল-নিষিক্ত করেছিলেন দীপাধারে। কিন্তু যৌবনের সিংহ-দুয়ারে যখন প্রবেশ করলুম, তখন এই নিঃস্ব প্রাণ, নির্জন, একাকী। কেউ নেই পাশে তার। যেন পাহাড়ি নদী। মেঘ ভাঙা জলের ধারা দু'কূল প্লাবিত করে বহে চলে গেছে—পড়ে আছে উপলখণ্ড সমূহ। যত কিছু সদুপদেশ, সৎসগের অভ্রচূর্ণ। বিস্মৃতি ঘিরে এল। নীচে আমির অহঙ্কারের টঙ্কার। সেই জীর্ণ গৃহটির যাঁরা ট্রাস্টি ছিলেন, তাঁরা বললেন, লায়েক হয়েছ ছোকরা, এইবার তোমার সম্পত্তি তুমি বুঝে নাও। তা মন্দ কী! বড় রাস্তার ওপর দোতলা মকান। পেছনে অনেকটা জমি। নিচে তিনঘর দোকান। সোনা-রূপোর গয়না, ছবি-বাঁধাই, এক মেঠাইঅলা। নিচের পেছন দিকটায় একঘর ভাড়াটে। দুর্দান্ত, দুর্বিনীত নয়। শান্তশিষ্ট গৃহস্থ। বাঙালি নয়। উত্তর প্রদেশের। তবে তিনপুরুষ 'এই বাংলায়। বাঙালিই হয়ে গেছে। কর্তা, গিন্নি, একটি মেয়ে। কর্তার কলকাতায় ব্যবসা আছে। খুব বড় কিছু নয় তবে সচ্ছল পরিবার। ভদ্র, শিক্ষার আলো পড়েছে। আদব-কায়দা জানে। এলাহাবাদের ঘরানা। তা বেশ! মন্দ কী! বাড়ি হল। গোটা দোতলাটা আমার। একা আমার। সঙ্গে কিছু ভাড়ার টাকা। ছাদটা বিশাল। আবার গঙ্গা দেখা যায়। হে ভগবান! কী আনন্দ!

আনন্দ কেন?

এই হল পতনের শুরু। মুক্ত-বিহঙ্গ খাঁচায় ঢুকেছে। বিষয়ের স্বাদ পাচ্ছে। এতকাল ভাগ্য পথে-ঘাটে-মাঠে যখন যেখানে পেরেছে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ভোজন, কখনো আশ্রমের খিচুড়ি। কখনো দেহাতী

রুটি, অড়হর ডাল। কখনো কারো ঘর সামলেছি, কখনো কারো দোকান। বৃদ্ধ মানুষের সেবা করেছি। কখনো ভাল পোশাক, কখনো শতচ্ছিন্ন। অসুবিধে হয়নি কিছুই। যে কিছুই পায়নি তার কাছে একটু পাওয়াই অনেক পাওয়া। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করে বেশি উতলা না হলে বর্তমান তেমন ভয় দেখাতে পারে না। একটা দিন যেই গেল, বিস্তারা বিছিয়ে শুয়ে পড়। তোফা ঘুম। আবার একটা সকাল। পাখির জীবন। আপনি যেমন বলেছিলেন ভগবান—পঞ্ছী অউর দরবেশ, সঞ্চয় করে না। আমার পশ্চিমা যোগী গুরু বলেছিলেন,

অজগর না করে নকরি, পনছি ন করে কাম।
দাস মুলুককো এই বচন হ্যায়, সব্ কি দাতা রাম।

বেটা শুনো—অজগর কখনো কারা চাকরি করে না। শুয়ে থাকে। খিদে পেলে হাঁ করে শ্বাস টানে সেই আকর্ষণে যা চলে আসে মুখে। ছাগল কি হরিণছানা বা একটা খরগোস। সাধুরা একেই বলেন অজগর বৃত্তি। পাখিরা কখনো চাকরি করে কী? করে না। অথচ তাদের দিন চলে যায়। যিনি দেবার তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। দাতা ভগবান। ভগবান মেহেরবান।

মন কী সহজে বোঝে! হিন্দিতে বলে, লালচ বুড়ি বালাই। লোভ এক মহা দুশমন। মাথার ওপর ছাদ পায়ের নিচে পাকা মেঝে। নানা স্বপ্ন এসে গেল মনে। গোলাপী স্বপ্ন। নিচের ভাড়াটের মেয়েটির নাম ছিল রুমকি। ঘাগরা পরা সেই মেয়ে। তাকাবো না, তাও তাকাই। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখতে পাই তাকে। তার একটা পাখি ছিল খাঁচায়। চন্দনা। উঠনের তারে ঝুলছে খাঁচা। রুমকি পাখির সঙ্গে কথা বলছে। লঙ্কা খাওয়াচ্ছে। ধারালো মুখ। পানপাতার মতো চিবুক। পাতলা টেপা নাক। নাকছাবির ঝিলিক। এলোখোঁপা। লাল ঘাগরা। মাঝে মাঝে ওপরের বারান্দার দিকে তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লেই দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে। এক সময় আমি ভয়ে সরে যাচ্ছি। আবার ফিরে আসছি এই ভেবে, আমার বারান্দায় আমার দাঁড়াবার অধিকার আছে নিশ্চয়।

কিন্তু আমার আর একটা মন জানত, আমি নির্দোষ, নিরাসক্ত নই। ভগবান! আপনি বলেছিলেন,

'রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে-ঘরে বিকারের রোগী সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম

করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী, বিষয় জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না; এরূপ জিনিসও ঘরে রয়েছে; যোষিসঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার।'

এই কথা সবসময় কানের কাছে বাজত। বাজত আপনার কণ্ঠস্বর; কারণ, আপনি আমার সংস্কার ছিলেন। আর তাই তো আমার যত অপরাধবোধ। আমার ছোট আমি, নীচ আমি, বজ্জাত আমিটা এ কি করছে! বারে বারে আমাকে নানা ছলছুতায় বারান্দার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মেঘ যেমন রোদকে ঢেকে দেয় সেইরকম আমার বিচার আমার শিক্ষা-সংস্কার আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মোহ আসছে। আমার ভেতরে অন্যরকমের একটা যুক্তি খাড়া করছে। অন্যরকমের একটা আনন্দের ঝঙ্কার তুলছে। বলছে, প্রেম। বলছে, তুমি বড় নিঃসঙ্গ, একজন সঙ্গী খুঁজে নাও, দুঃখ-সুখের চিরসঙ্গী। দেখবে, ভীষণ ভাল লাগবে। সে এক কবিতার মতো। লাল ঘাগরা, সাদা চোলি। ফর্সা দুটো পা। গোড়ালির কাছে ঘুঙুর। মাঝের আঙুলে একটা রুপোর আঙটি। কানে দুল, নাকে নাকছাবি, কপালে হলদে টিপ। নরম উষ্ণতা। দু'চোখে ছুরির ধার। একা একা পৃথিবীতে থাকা যায় কী! এই চাঁদ উঠবে, বসন্তের বাতাস, তারার মালা, তোমাদের খোলা ছাদ, একটা মাদুর, জুঁই ফুলের গন্ধ। বসে বসে, জীবনের কথা, প্রাণের কথা। এ তো ঈশ্বরের পৃথিবীরই আয়োজন। তোমার এত শঙ্কা কিসের!

মন! আমাকে যে ভগবান বলেছেন, 'সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য।'

বেশ তো! তাই না হয় হল। তিনি তো আরও একটু বলেছেন, 'বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়।' তা তোমার তো বৈরাগ্য হয়েইছে, এইবার সংসার কর। দেখবে, বেশ লাগবে। ঈশ্বর তো তোমাকে নিজে সঙ্গ দিতে আসবেন না। মহাপুরুষ পাঠাবেন। তিনি আরো পাঁচজনের সঙ্গে তোমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেবেন। দিয়ে বলবেন, যাও এইবার চরে খাও। অসুখ-বিসুখে ঈশ্বর তোমার সেবায় আসবেন না।

মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। হাসপাতালে যাবে, সেখানে কোনো সেবিকা নামে তোমার সেবা করবেন। সে করাও যা না করাও তাই। স্ত্রীর মতন কে করবেন! আর তোমার ওই 'অজগর', 'পন্‌ছি', ও শুনতেই ভাল। রোজগার আর সঞ্চয় দুটোই তোমাকে করতে হবে। হয় সন্ন্যাসী হও না হয় সংসারী। জীবন নিয়ে ইয়ারকি চলে না। অনেক কিছু শুনতেই ভাল, বেশ মধুর মধুর কথা। সেই ভাবে জীবন চালাতে গেলে চলবে না। আটকে যাবে।

বেশ প্রবল যুক্তি। সত্যিই তো! আমি তো সন্ন্যাসী হতে পারিনি।

সেদিন ছিল চৈত্রের দুপুর। কড়া রোদে চারপাশ ভাজা ভাজা হচ্ছে। পথঘাট নির্জন। কৃপণ ছায়া। জ্বোরো রোগীর নিঃশ্বাসের মতো তপ্ত বাতাস। সরসর করে ধুলো খেলে যাচ্ছে পথের ওপর। রাখহরির হোটেল থেকে খেয়ে ফিরছি। তা প্রায় পাঁচ-দশ মিনিটের পথ। আমাদের সদর পেরলেই বেশ ঠাণ্ডা। চল্লিশ ইঞ্চি দেয়ালের স্নিগ্ধতা। সদর পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি। কয়েকধাপ উঠেছি। রুমকি কাপড়-জামা নিয়ে ছাদ থেকে নামছে। একেবারে মুখোমুখি। আধহাত মাত্র ব্যবধান।

রুমকি হাসল। আমাকে সামান্য একটু জায়গা দিল একপাশে সরে গিয়ে। সে প্রায় হেলে গেছে। ওপরে উঠতে গিয়ে তার কোমরে তোমর ঠেকে গেল। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ।

দক্ষিণের ঘরের মেঝেটা জায়গায় জায়গায় ফেটেফুটে গেলেও সাবেক কালের তৈরি লালরঙের জেল্লায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঘেমে নেয়ে গেছি, তায় হোটেলের গুরুপাক ভোজন। চিত্র-বিচিত্র মাদুর বিছিয়ে চিৎপাত। বাইরে চোখ ঝলসানো রোদ। সবুজ সবুজ গাছ। নারকেলপাতার ঝিলিমিলি। কাকের খা-খা ডাক। মাথার ওপর সাবেক কালের হাণ্ডাপাখা চামচিকির মতে কিচিরমিচির করছে। অন্যদিন হলে নিমেষে ঘুমিয়ে পড়তুম, সেদিন আর ঘুম এল না।

মন! তোমার দিশা আজও পেলুম না। কি দেখলে তুমি কুকুরের মতো

পটাপট ন্যাজ নাড়? সেই আদি অকৃত্রিম কামিনীকাঞ্চন। এমন মধু আর কিসে আছে! এমন মৌতাত! ডানা তো ভ্রমরেরও আছে মাছিরও আছে। মাছি বিষ্ঠায় বসে, পচা ঘায়ে বসে। আর মৌমাছি! মৌমাছি বসে ফুলে। বেশির ভাগ মানুষেরই মন মাছির মতো। আমার মন হল সেই মাছি!

শুয়ে শুয়ে ভাবছি, রুমকি কেন হাসল! নিচের তলাটা অত নির্জন কেন? তাহলে কি রুমকি ছাড়া আজ আর কেউ নেই! ঘাগরা পরা মেয়েটার কি চটক! সাধারণত দেখা যায় না অমন একটা মুখ। বেশ পোড় খাওয়া। দেহের বয়সের চেয়ে মুখের বয়স ও অভিজ্ঞতা যেন অনেক বেশি। যে কারণে মুখটা ভীষণ আকর্ষণীয়। একবার আমার দিকে হেসে তাকিয়েছে, আমার মাথা ঘুরে গেছে। একটা পাগল ভেতরে হাহাকার করছে।

দিবানিদ্রা ছুটে গেল। মন কত বড় বদমাশ! আমাকে বোঝালে, দেখে আয়, লেটার বক্‌সে কোনো চিঠি আছে কিনা! চিঠি আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমার মতো এক হতচ্ছাড়াকে কে চিঠি লিখবে! মন বললে, কেন রে, চাকরির দরখাস্ত ছেড়েছিস, একটা দুটো উত্তর তো আসতেও পারে। সেটা এখনই দেখা খুব জরুরি।

বেশ কিছুক্ষণ লড়াই হল মনের সঙ্গে। মানুষের দুটো মন। এটা আমি বেশ বুঝতে পারি। খাঁচার ভেতর দুটো পাখি। একটা প্রবীণ, ধীর, শান্ত। সেই পাখি আদর্শ, সংস্কার এই সব দিয়ে তৈরি। অনেকটা পিতার মতো। বলে না কিছুই। তাকিয়ে থাকে, মুচকি মুচকি হাসে। আর একটা হল ছটফটে, চঞ্চল, লোভী। দেহ সেই মনটারই খিদমত খাটে। যা বলবে তাই করতে হবে, পরে পস্তাতে হবে।

বাঘা ভালকোর লড়াইয়ে শুদ্ধ মন, পবিত্র মন হেরে গেল। নিচে নামতেই হল। একপাশের সান-বাঁধানো উঠনে রুমকি পেছন ফিরে বসে টুকটুক করে কি ঠুকছে! আমাকে দেখতে পায়নি। এক মনে কাজ করছে। আমি একটু থমকে দাঁড়ালুম। দৃশ্যটা দেখার মতো। মেঝেতে গোল হয়ে ছড়িয়ে গেছে লাল ঘাগরা। সুঠাম একটা শরীর। চওড়া পিঠ। ভারি খোঁপা। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ঠিক হবে না ভেবে সদরের দিকে এগিয়ে গেলুম। দরজার পাশে লেটারবক্‌স। ফাঁকা। কোনো চিঠিপত্র নেই। কে একটা শুকনো পাতা, চৈত্রের ঝরাপাতা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। প্রকৃতির চিঠি, যে

চিঠি বলতে চায়—আমি ঝরে যাই, নতুন হব বলে, সবুজ হব বলে। একটা কবিকবি ভাব আমার মধ্যে আছেই আছে। সেটা আমি টের পাই, আর পাই বলেই এই সব মেয়েটেয়েদের দেখে মোহিত হওয়াটাকে আমি খুব খারাপ বলে মনে করি না। তাহলে কেন আমার এই দ্বিধা! আমি রুমকির সঙ্গে ভাব করবই করব। প্রেম জিনিসটা খারাপ নাকি! এই তো একটু আগেই রেডিওতে গান হচ্ছিল—শচীনদেব বর্মণ গাইছিলেন—প্রেম যমুনায় হয়তো বা কেউ ঢেউ দিল ঢেউ দিল রে। আকুল হিয়ার দুকূল বুঝি ভাঙল রে। আমার হিয়ার দুকূল ভেঙে দিয়েছে লাল ঘাগরা রুমকি। মানুষের এইরকম হয়। সব মানুষেরই হয়। মানুষকে ভগবান এই ভাবেই তৈরি করেছেন। হৃদয় একটা বহু তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। কোন সুরে কখন ঝঙ্কার উঠবে মানুষ কি তা জানে!

সেই শুকনো পাতার প্রকৃতির বাণী হাতে নিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালুম। রুমকি একমনে ঠুকঠুক করছে। একটা কিছু বলতে চাইলুম, গলা দিয়ে স্বর বেরলো না। দুবারের চেষ্টায় যা বেরলো, সেটা একটা অদ্ভুত শব্দ। সেরকম শব্দ জন্তুজানোয়ারের গলা দিয়েই বেরোয়। রুমকি চমকে ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বোকার মতো বললুম, 'চিঠি নেই এই পাতাটা ছিল।'

রুমকি বললে, 'কোথায় ছিল?'

'ওই যে লেটারবক্সে। তুমি কী করছ?'

রুমকি একটা চটি তুলে দেখাল, 'স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে তাই পেরেক ঠুকছি।'

'হয়েছে?'

'হচ্ছে না কিছুতেই। ভেতরদিকে তো! হাতুড়ি আটকে যাচ্ছে।'

'কই দেখি! জীবনে এমন কাজ নেই যা আমি করিনি!'

'ছিঃ, আমার জুতোয় আপনি হাত দেবেন?'

'তাতে কি হয়েছে! হাত ধুয়ে ফেললেই হল।'

'না, তা হয় না, আমি ঠিক পারব।'

'সরো তা।'

তখন আমার এত প্রবল আবেগ, রুমকিকে এক ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলুম। সে একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল। পড়ে যেতে যেতে বললে,

'বাবা, আপনার শরীরে কী অসম্ভব জোর!'

জরির কাজ করা সুন্দর দু'পাটি চটি। মেয়েদের ব্যবহার করা কোনো জিনিসে এই প্রথম আমি হাত দিচ্ছি। সারা শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। ছোট্ট হাতুড়ি। কয়েকটা কাঁটা পেরেক। খুবই কঠিন কাজ। স্ট্র্যাপটাকে চামড়ার ফাঁকে ঢুকিয়ে ভেতরদিক থেকে ঠুকতে হবে। এ যেন জীবনমরণ সমস্যা। একটা মেয়ের মন জয় করার সওয়াল। এই কাজেও ঠাকুরকে ডেকে বসলুম—দেখো ঠাকুর যেন পারি! মানুষ কী চিজ! পাপেও ভগবান, পুণ্যেও ভগবান। যে চোর, সে চুরি করার সময় ভগবানকে ডাকবে। দেখো ভগবান, যেন ধরা না পড়ি! বারাঙ্গনা দাঁড়িয়ে আছে, ডাকছে, ভগবান একজন মালদার বাবু জুটিয়ে দাও। এ যেন সেইরকম।

ঠাকুর বোধহয় আমার কথা শুনলেন। দুটো পেরেক কুটকুট করে লাগিয়ে দিলুম। স্ট্র্যাপটা টেনে দেখলুম, বেশ লেগেছে। রুমকিকে বললুম, 'পরে দেখ, আঙুলে লাগছে কিনা!'

রুমকি বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। একটা পুরুষালী ভাব। তেমন লজ্জা বা ন্যাকামো নেই। আমার সামনেই ঘাগরাটা টেনে তুলে চটিতে পা গলাল। আমি লোভীর মতো তাকিয়ে আছি। বিশ-বাইশ বছরের একটা স্বাস্থ্যবান মেয়ের পা। ফর্সা ধবধবে। গোল ভরাট। মনে মনে ভগবানকেই বলছি—এ কী দেখালে ঈশ্বর! আবার বলছি, উঃ কী বরাত! এই হল বরাতের নমুনা। শৈশবে অনাথ, পরের আশ্রয়ে মানুষ। যতরকম নির্যাতন আছে সবই ভোগ করেছি। এখনো জানিনা আমার ভবিষ্যৎ কী! এইটাই নাকি আমার বরাত! এক তরুণীর পদযুগলের কিয়দংশ দর্শনে সম্মোহিত!

রুমকি বাঁধানো উঠনে একপাক ঘুরে এসে বললে, 'ঠিক আছে।'

'তোমাদের নিচটা আজ এমন নিস্তব্ধ লাগছে কেন? সবাই ঘুমোচ্ছেন বুঝি?'

'বাড়িতে আজ কেউ নেই। আমি একা।'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। সর্বনাশ! এইবার যদি কিছু হয়! ভেতরে চামচিকি ল্যাট খাচ্ছে। হরেকরকমের ইচ্ছে ঘুরপাক খাচ্ছে। যে-সব ইচ্ছেকে লোকে বলে প্রেম। আমাকে ঘাবড়াতে দেখে রুমকি বললে, 'কি হল, চুপ হয়ে গেলেন! চলুন আমাদের ঘরে একটা জিনিস খেতে দোবো।'

দোতলার মতো একতলাতেও তিনখানা ঘর। একটা ঘর বেশ বড়।

সেই ঘরে মস্ত এক খাট। পরিপাটি বিছানা। জানলার কাছে টেবিল। তিনপাশে তিনটে চেয়ার। আর একপাশে দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চি। রামের ছবি, মহাবীরের ছবি। মহাত্মা গান্ধীর ছবি। শ্রীকৃষ্ণের ছবি। চারপাশ পরিষ্কার তকতকে। বেশ সুন্দর একটা গন্ধ।

'এই ঘরে মা আর আমি থাকি।'

'তুমি কী পড়ছ?'

'বি.এ।'

'পাশের ঘরে?'

'বাবা থাকেন। ব্যবসার সব কাগজপত্র থাকে।'

'আর একটা ঘর?'

'খাওয়ার ঘর। চলুন আপনাকে একটা জিনিস খাওয়াবো।'

মাঝারি মাপের ঘর, ছবির মতো সাজানো, পরিষ্কার। দেয়ালে অনেক তাক। পরপর সাজান নানা মাপের বয়াম। কৌটো। 'তোমার মা খুব পরিষ্কার।'

'মা পরিষ্কার ছিলেন, তবে এখন আর পারেন না, কোমরে হাঁটুতে বাত। এখন আমিই সব করি।'

কথা বলতে বলতে রুমকি একটা টুলে উঠে পড়ল। আঙুলের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে আরো উঁচু করে একেবার ওপরের তাক থেকে দু'হাতে ধরে একটা বড় জার নামাচ্ছে। ভয় হল, যদি টাল খেয়ে পড়ে যায়! এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে তার শরীরের নিচের দিকটা গিয়ে ধরলুম। আমার কোনো বদমতলব ছিল না। শুধু ভয় আর আতঙ্ক ছিল, যেন পড়ে না যায়। জড়িয়ে ধরার পরক্ষণেই মনে হল, এইবার এই চটিজোড়া আমার মুখে পড়বে। মনে হলেও আমি তখন অসহায়। অদ্ভুত একটা আবেশ। আমার শরীরে নিটোল একটা স্পর্শ। লাল ঘাগরার অন্তরালে এ কোন জিনিস! সমস্ত ভয়, জড়তা, সংস্কার, আদর্শ ভেসে গেল। আমার প্রবৃত্তি তখন প্রবল। আমি আদর করতে শুরু করেছি। আমি উন্মাদের মতো হয়ে গেছি।

রুমকির হাত থেকে জারটা ভীষণ শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল। চারপাশে ছিটকে পড়ল কোষাকোষা আমের আচার। কাঁচের একটা টুকরো ছিটকে এসে আমার পায়ে ঢুকে গেল। ভীষণ শব্দে রুমকি ব্যালেন্স

হারাচ্ছিল। আমি তাকে কোলে করে টুল থেকে নামিয়ে যেখানে কাঁচ নেই সেই জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলুম। আমার পায়ের তলায় আর একটুকরো কাঁচ ফুটে গেল।

ঘোরতর অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমার মাথায় ছিল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। আমার সামনে রুমকি। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে বড় বড় কাঁচের টুকরো। সুস্বাদু আচার। মশলার অপূর্ব গন্ধ। অপরাধী এইভাবেই বোধহয় আত্মসমর্পণ করে থানায় গিয়ে।

রুমকি আমাকে কিছুই বললে না। আমার পায়ের কাছে বসে বললে, 'ইস, আমার জন্যেই কেটে গেল!'

একটু সাহস বাড়ল। বললুম, 'পাছে পড়ে যাও তাই তোমাকে ধরতে গিয়েছিলুম।'

'তুমি না ধরলে সত্যিই পড়ে যেতুম। বয়ামটা যে অত ভারি বুঝতেই পারিনি।'

'কতটা আচার নষ্ট হল!'

'জীবন আগে না আচার আগে! দাঁড়াও তোমার পা-টা ঠিক করে দি।'

'তেমন একটা কিছু হয়নি। অল্প একটু কেটে গেছে।'

'কাঁচের কাটা তো, বেশ ব্যথা হবে।'

'আমার কিন্তু খুব ভয় করছে, যদি কেউ এসে পড়ে!'

'সে ভয় নেই। রাত আটটার আগে কেউ আসবে না।'

আমি আপনাকে এই সব কথা শোনাচ্ছি কেন, আমার মাথায় আসছে না। এসব তো আপনার শোনার কথা নয়। যার বিশ্বাস নেই, বৈরাগ্য নেই, নানা আসক্তিতে যার অন্তর ভরা, সে কোন্ সাহসে আপনার কৃপা আশা করে! এমন বেসুরো মানুষকে আপনি বলতেন, ও ইখানকার লোক নয়। এখন তো ও-কথা খাটবে না। এখন তো সবাই বেসুরো। এখন তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। আমি আপনাকে গান শোনাবো ঃ

ভজন পূজন কিছুই না জানি।
তাই ভাবি কিসে পাব পদে স্থান।।
ভরসা কেবল করুণা তোমার।
তাই এ সন্তান ডাকে বার বার।।

এই কারণে শোনাব, সাধারণ ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ একেবারে বেহুঁশ নয়। তার একটা আকৃতি থাকেই থাকে, একটা আক্ষেপ, এ আমি কী করছি, আমাকে তো তাঁর কাছে যেতেই হবে। আমি বারে বারে পিছলে যাচ্ছি। আমাদের পুরনো বাড়ির সেই পিছল উঠানের উদাহরণ। কলতলায় আমাকে যেতেই হবে, তা না হলে আমি জল পাব না। পিছলে হয়তো বারকতক পড়েই গেলুম। পড়ব উঠব, উঠব পড়ব, এই ভাবে আমি ঠিক পৌঁছে যাবো। বাধা, আপনার বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতাও আপনার দান। তা না হলে আপনার ওই কাহিনীটা যে মিথ্যা হয়ে যায় ভগবান। আপনি মণিলাল মল্লিককে একদিন বলেছিলেন, 'যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, এক জমিদার একটি লোককে ভারি মারছে। সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারি রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে, ভারি প্রহার করলে। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারি মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন তারা পাঁচজন ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্ছে। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হল। চোখ মেলে দেখতে লাগল। একজন বললে, ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিনতে পারছে কিনা? তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু আস্তে আস্তে বলছে—'ভাই, যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

ঠাকুর আপনার এই কাহিনীর ব্যাখ্যা আমি যে-ভাবে করেছি

আপনাকে খোলাখুলি বলি। আমার চৈতন্য হয়নি সে কথা খুবই ঠিক; কিন্তু কৈশোর আর যৌবনের কিছুটা আমার যাঁদের সঙ্গে কেটেছে, তাঁরা আমার একটা সংস্কার তৈরি করে দিয়ে গেছেন। সেই সংস্কার হলেন আপনি। শ্রীরামকৃষ্ণময়ং জগৎ। আমার ইন্দ্রিয় হল ওই জমিদার। সে আমাকে নিয়ত চাবকাচ্ছে। আমি চৈতন্য হচ্ছি। ঠাকুর আপনি আমাকে চেতনা দিচ্ছেন, আবার অচৈতন্যও করে দিচ্ছেন। দিন যাঁর রাতও তাঁর। এই দিন-রাত্রির পরপারে আপনিই আমাকে নিয়ে যাবেন। বন্ধন যাঁর মুক্তিও তাঁর। সবই তো এই দেহেই ঘটছে। আর ঘটাচ্ছেন আপনি। এই বিশ্বাস আমার প্রবল। প্রবল বলেই আপনাকে মনের কথা সব খুলে বলছি। ভণ্ডামি করলে করা যায়, তাতে আপনি আমার সীমানা ত্যাগ করবেন। আপনি বলে গেছেন, ঈশ্বর মন দেখেন। আপনি আমার ঈশ্বর। আপনি আমার মন দেখুন, তারপর আমার মনে আপনার আঙুল ঠেকান। শোধন করে দিন।

আপনার সেই কাহিনীটাও যে আমার স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে। এই কাহিনীতে আমার মুক্তির প্রতিধ্বনি আছে। আপনি জনৈক ভক্তকে এই গল্পটি বলেছিলেন, 'কোন এক গ্রামে একটি তাঁতী থাকে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালোবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রি করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে—রামের ইচ্ছা সুতোর দাম একটাকা, রামের ইচ্ছা মেহন্নতের দাম চার আনা, রামের ইচ্ছা মুনাফা দু'আনা। কাপড়ের দাম, রামের ইচ্ছা, এক টাকা ছয় আনা। লোকের এত বিশ্বাস যে তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি ভারি ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়াদাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর-চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে, এক-একবার তামাক খাচ্ছে। এমনসময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীতে এসে বললে, আয় আমাদের সঙ্গে—এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে ডাকাতি করলে। কতকগুলো জিনিস তাঁতীর মাথায় দিলে। এমনসময় পুলিশ এসে পড়ল। ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটি মাথায় মোট ধরা পড়ল। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হল। পরদিন ম্যাজিস্টার সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তাঁরা সকলে বললে,

'হুজুর! এ লোক কখনো ডাকাতি করতে পারে না।' সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞেস করলে, 'কিগো, তোমার কী হয়েছে বল?' তাঁতী বললে, 'হুজুর! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হল। আমি রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা করছিলুম আর তাঁর নামগুণ গান করছিলুম। এমন সময়, রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। রামের ইচ্ছা, তারা আমায় ধরে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করল। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিশ এসে পড়ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিশ লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে, রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে।'

অমন ধার্মিক লোক দেখে সাহেব তাঁতীটাকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বললে, 'রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা।'

ঠাকুর আপনার এই কাহিনীর সঙ্গে আমি যে তত্ত্ব পেয়েছি, তাতে আমার এই বেচাল, সেও তা আপনারই ইচ্ছা বলে মনে করতে পারি। তা না হলে আমি সেদিন কেন অমন অসংযমী হতে যাব। নিশ্চয় আপনি মনে করেছিলেন ছেলেটার সংসারে ঢোকা উচিত। একটু দেখে নিক সংসার কি বস্তু। রমণী শরীর কি রকম। প্রেম ভালবাসা কাকে বলে। দেখা না হলে পরে ছোঁক ছোঁক করবে। বেশি বয়সে ফেঁসে যাবে। চরিত্রহীন হবে। সংসার কিছু অপবিত্র জায়গা নয়। গৃহদুর্গে বসে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা, বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে হতাশ হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল। সংসারে না ঢুকলে সেই শিক্ষাটা হবে কি করে...যেমন আপনি বলেছিলেন—সারবস্তু কিছুই নাই—আমড়া, আঁটি আর চামড়া।

সেদিন রুমকির হাত দুটো ধরে বলেছিলুম, 'তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে বলেই এমন করে ফেলেছি। বিশ্বাস করো, আমি দুশ্চরিত্র খারাপ ছেলে নই। তোমাকে দেখে আমার ভেতরটা কেমন করে উঠল, তাই আমি অমন করে ফেলেছি। লক্ষ্মীটি, তুমি আমার নামে বদনাম রটিও না। তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'

আমার কথা শুনে রুমকি খুব খানিক হেসে, আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে

বলেছিল, 'ভীতু, ভীষণ ভীতু! তুমি কী এমন করেছ! শোনো, তোমাকেও আমার ভীষণ ভাল লাগে। কেমন একা একা আপনমনে থাকো তুমি! হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসছ, মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ছ। কখনো গান গাইছ। কখনো স্তোত্রপাঠ করছ। তুমি বুঝি খুব ধার্মিক!'

খুব জোরগলায় হ্যাঁ বলতে পারলুম না। বলি কী করে? যে ধার্মিক সে সখনো ডাগর একটা মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরতে পারে? মিউমিউ করে বললুম, 'ধার্মিক হলে কেউ মেয়েদের কাছে আসে?'

'তা? মেয়েরা বুঝি অধর্ম? মা না হলে ছেলে হয় তোমার মা বুঝি অধর্ম?'

'না না, তা নয়, মা ছাড়া অন্য মেয়ের কথা বলছি।'

'সব মেয়েই তো একদিন না একদিন মা হয়ে যাবে।'

'আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। ধরো যে আমার মা, তিনি তো একজনের স্ত্রী! এই স্ত্রী পর্যন্ত চলে যায়, কিন্তু যে মেয়ে স্ত্রী হয়নি তার সঙ্গে মেলামেশাটা ধার্মিকের কাজ নয়।'

'তাহলে প্রেমে ধর্ম নেই? শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে কুঞ্জবনে প্রেম করতেন, সেটা তাহলে অধর্ম, পাপ?'

'দেখ রুমকি, শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারটা বোঝা অত সহজ নয়। ওর ওপর সব বড় বড় বই আছে। ওটা একটা সাধনা।'

'তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে,'আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমার ধর্ম চলে যাবে! ভেবে দেখ, আমার সঙ্গে মিশবে, না চোখ উল্টে ধ্যান করবে! আমার ধর্ম আসে না। আমি খিদে পেলে খাই, ঘুম পেলে ঘুমোই, সিনেমা দেখি, একা একা নাচি। বাজে বাজে বই পড়ি। মিশবে না মিশবে না?'

রুমকি আমার এক হাত দূরে শরীর এলিয়ে বসেছিল। মুখ শরীর সব কিছুই বাঈজিদের মতো। কিছুক্ষণ তাকালে মন কেমন করে। বসে আছে এক হাত দূরে। বাড়িতে আর তৃতীয় কেউ নেই। বাইরে চৈত্রের দুপুর খাঁ খাঁ করছে। কাকের ডাকে গভীর তৃষ্ণা।

দিশাহারা মানুষ পথে নেমে আনন্দ পায়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, অধিকাংশ মানুষই নিজেকে ভুলতে চায়। কোনো মানুষই নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ পায় না। আর সেভাবে বাঁচতে গেলে পরিণতিটা কি হবে বলা মুশকিল। প্রকৃতির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে ফল ভালো হওয়ার কথা নয়। আর নিবৃত্তি সহজে আসার নয়।

আমার সেই প্রাচীন বাড়ির সামনে দিয়ে পথ চলে গেছে সোজা দিল্লি। শের শাহ্ তৈরি করিয়েছিলেন এই রাস্তা। ইংরেজরা নাম রাখলে গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড। এই জিটি রোড ধরে গঙ্গাকে ডানপাশে রেখে আমি হাঁটতেই থাকি। কখনো বাঁ দিকে ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই কোতরং। ওই দিকটায় কয়েকটা বড় বড় বাগানবাড়ি আছে প্রাচীনকালের। তারপর আরো কিছুটা এগোলেই ইটখোলা। গর্ত খুঁড়ে, মাটি তুলে, বালি মিশিয়ে ছাঁচে ফেলে তৈরি হচ্ছে ইট। ঘর্মাক্ত শ্রমিকের দল। দেহাতি মেয়েদের নিটোল শরীর। তারা হাসছে, তারা কাজ করছে, রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। গ্রাহ্যই করছে না। ভবিষ্যতের চিন্তায় আতঙ্কিত হচ্ছে না। ঝুটা সভ্যতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টা নেই। কর্মই তাদের ধর্ম। আমার চোখের সামনে গর্ত ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। কোন নীচে তারা নেমে যাচ্ছে, মাথায় মাটি নিয়ে তারা উঠে আসছে ধাপে ধাপে ওপরে। ছায়ায় শুইয়ে রাখা কোলের শিশুটিকে মাঝে মাঝে এসে দুধ খাইয়ে যাচ্ছে।

ছায়া খুবই কম। প্রখর রোদই এই শিল্পের মূলধন। মাটি, সে তো ধরিত্রীর দান। শ্রম, সে তো মানুষের পেশী। বালি নদীর উপহার। রোদ প্রকৃতির করুণা। আর এক-একটি নিটোল ইট মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের স্বপ্ন। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। যারা কাজ করছে তারা আমাকে পাত্তাই দেয় না। নিষ্কর্মা একটা লোকের কোনো অস্তিত্বই নেই তাদের কাছে। গাছের তবু ছায়া আছে, আকাশের তবু রোদ আছে, বৃষ্টি আছে। মাটির তবু গন্ধ আছে। আমার কি আছে? ইন্দ্রিয় ছাড়া কিছুই নেই। দাস আমি। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করি। নিজেকে ঘৃণা করা সবচেয়ে বড় পাপ।

আমি সেই পাপে পাপী।

একদিন এইরকম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি একপাশে, হঠাৎ স্বাস্থ্যবান এক লোক কোথা থেকে এসে বেশ মেজাজ দেখিয়ে বললেন, 'তুমি এইভাবে প্রায়ই এখানে দাঁড়িয়ে থাক কেন? তোমার মতলবটা কি?'

মানুষটির মুখটা ভারি মিষ্টি। তামাটে রং। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। সাদা হাফশার্ট, মালকোঁচা মারা ধুতি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, 'কি হল? বোবা নাকি?'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আপনি কি সুন্দর! আপনার মতো যদি আমার একজন দাদা থাকতেন, তাহলে কত ভাল হত।'

কথাটা আমি অন্তর থেকে বলেছিলুম। চাটুকারিতা নয়। তাই বোধ হয় ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে গেলেন। কথাটা বলতে বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার। আমি একটা উঠতি বয়সের ছেলে। কেউ কোথাও নেই আমার। মা, বাবা, ভাই, বোন। এমন আমার বরাত। যাকেই আপন বলে ধরতে গেছি, হয় সে মরে গেছে, না হয় সে পালিয়ে গেছে। গভীর রাতে দোতলার বারান্দায় চুপ করে বসে থাকি নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে। বাতাস ছুটে যায় ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে। কখনো মাতাল যায় টলতে টলতে, নেশার ঘোরে বকতে বকতে। পাগল এসে দাঁড়ায় কখনো ল্যাম্পপোস্টের তলায়। কখনো মৃতদেহ নিয়ে যায় হরিধ্বনি দিতে দিতে। আমি বসেই থাকি। কেউ এসে বলে না, রাত হল এইবার শুতে যাও। কেউ এসে জিজ্ঞেস করে না কিছু খেয়েছো?

ভদ্রলোক হাতটা ধরে বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো।'

অনেকটা হেঁটে আমরা সেই ইটখোলার অফিসঘরে এলুম। টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। সবের ওপরেই ময়দার মতো ধুলোর স্তর। টেবিলে খাতাপত্তর। মাথার ওপর অ্যাসবেসটাসের চাল। রোদে সব তেতে আছে। কোণের দিকে কালো একটা কুঁজো। মুখে উপুড় করা কাঁচের গেলাস। কুঁজোর গায়ে জলের বিন্দু জমে আছে। অসংখ্য অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। বেলেমাটির ধর্ম। কুঁজো ঘেমেছে। এই ভয়ঙ্কর গরমে কুঁজোটা যেন কোনো শীতল দেবতা।

ভদ্রলোক একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বোসো। ধুলো আছে, থাকবে, গ্রাহ্য কোরো না।' ভদ্রলোক আমরা উল্টোদিকের একটা চেয়ারে

বসলেন। সাদা জামা থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। চোখ দুটো বড় বড়। চাউনিটা স্থির। যে সব মানুষের খুব আত্মবিশ্বাস থাকে তাদের চেহারা মনে হয় এইরকমই হয়।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার বলো তো! তুমি প্রায়ই আস, এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো! কে তুমি?'

যতটা সম্ভব ছোট করে বলার চেষ্টা করলুম, আমি কে। বলতে গিয়ে দেখি খেই খুঁজে পাচ্ছি না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বহু ফ্যাকড়া। জীবনের প্রথম দিকের অনেকটা জানা নেই। শীতের সকালে গঙ্গায় যখন খুব জমাট কুয়াশা নামে তখন যেমন হয়। হঠাৎ একটা বিশাল নৌকো কোথা থেকে বেরিয়ে এল। অতীত পর্দার আড়ালে ভবিষ্যৎও তাই। বর্তমানে আছি বলে দেখা যাচ্ছে। কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে একটা জীবনকাহিনী খাড়া করে বললুম, 'অনেকটাই জানি না, কেউ আমাকে জানায়নি।' কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে কুয়াশায় মিলিয়ে যাওয়া।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম শ্যামসুন্দর। আমি এই ইটভাঁটার মালিক। জানি, খুব পাপ করছি। বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। উপায় নেই। ভগবান যেখানে এনে ফেলেছেন!'

'পাপ কেন?'

'মহাপাপ! মাকে কোপাচ্ছি। পৃথিবী আমাদের মা। গাভী আমাদের ধর্ম। আমার অত জ্ঞানটান নেই। আমার দাদু যা বলতেন আর কি! একটু চা খাও।'

চা খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন, 'বছরে কয়েকটা মাস কাজ হয়, বুঝলে? এই পুজোর পর থেকে চোত বোশেখ মাস পর্যন্ত। তারপরেই তো বর্ষা এসে যাবে। ইঁটে বৃষ্টি পড়লেই হয়ে গেল, পকমার্ক! আর দাম পাবে না। এই ক'মাসে যা পারো করে নাও। কেটলিতে এখনো চা আছে, ভাঁড়টা ফেলো না। এই লছমী, বাবুর ভাঁড়টা ভর্তি করে দে।'

লছমী ইঁটখোলারই শ্রমিক। বোঝা গেল, মালিকের পেয়ারের লোক। বয়েস কম। একটু উঁচু করে শাড়ি পরেছে। স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। বড় খোঁপা। খোঁপায় একটা কাঠের চিরুনি গোঁজা। ভীষণ হাসিখুশি। আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে ভাঁড়ে চা ঢালছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'এরাই আমার আপনার লোক। তোমার যেমন

কেউ নেই, আমারও সেইরকম কেউ নেই। মাটি কাটলে বংশ নির্বংশ হয়। কথাটা স্রেফ মিলিয়ে নাও।'

ওই ঘরেরই একপাশে রান্নার একটা ব্যবস্থা। ছোট্ট তোলা উনুন, হাঁড়ি, কড়া, থালা, বাটি, গেলাস। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কি খাবে গো?'

শ্যামসুন্দরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত আবেগ মেশানো গলায় বললেন, 'তুমিও আজ খাও না, খাও না আমাদের সঙ্গে।'

এমনভাবে বললেন, না বলতে পারলুম না। অথচ কোথাও গিয়ে কারো ঘাড় ভেঙে খেতে আমার খুব সঙ্কোচ হয়। পরে সদ্ভাব নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বলবে, ব্যাটা ধান্দাবাজ! আমার ঘাড় ভেঙে কত খেয়েছে, কাপ কাপ চা ধ্বংস করেছে, এখন আর ভুলেও একবার খবর নেয় না!

'কি হল? খাবে তো? কি দেখছ হাঁ করে?'

সত্যি অবাক হয়ে গেছি। এত বড় একটা ইটভাঁটার মালিক, দেদার যার টাকা, যার অধীনে এত লোক কাজ করছে, সেই মানুষটা আমার সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপে এত ভাল ব্যবহার করছে! কিছু একটা বলতে গেলুম, ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপল। কথা বেরলো না।

'বুঝতে পেরেছি, তোমার আবেগটা খুব বেশি। বুঝলে, ঘা-খাওয়া মানুষ এইরকম হয়। আমিও তোমার মতোই ছিলুম। কেউ একটু ভাল ব্যবহার করলে চোখে জল এসে যেত। তারপর এই ইট তৈরি করতে এসে একটু যেন শক্ত হতে পেরেছি।'

শ্যামসুন্দরবাবু লছমীর দিকে তাকিয়ে ভীষণ লোভীর মতো বললেন, 'আজ আমরা মুরগী খাবো। মুরগী! সরু চালের ভাত। তোর সেই রান্নাটা আজ দেখা লছমী। এই লে টাকা, লিয়ে যা। শেষপাতে একটু চাটনি রাখিস। আজ আমরা খুব খাবো। আজ তোর জন্মদিন।'

লছমী শরীর দুলিয়ে বললে, 'ঢঙ!'

মন যদি তোমার চঞ্চল হয়, তাহলে তুমি কী করবে?

আমার মহাপুরুষ গুরু একদিন গভীর রাতে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

বসেছিলেন কম্বলের আসনে। একপাশে তাঁর কমণ্ডলু আর পরিব্রাজকের লাঠি। অন্যপাশে গীতা। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। মুখে খেলা করছে অদ্ভুত এক জ্যোতি।

আমি প্রশ্ন করেছিলুম, 'আপনার মন কী কখনো চঞ্চল হয়?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'অবশ্যই হয়। মনের স্বভাবই হল চঞ্চল হওয়া। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। তুলসীদাস সেই জন্যেই বলে গেছেন,

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনার মন্‌কো বশ করে সো, সবকো সেরা ওই।।'

'মহারাজ, মনকে বশে আনার জন্য কী করেন আপনি?'

'অহঙ্কার আর অভিমান।'

সেটা কেমন?'

'প্রথমে করি অভিমান। পৃথিবীর ওপর অভিমান। কেউ কিছু দেবে না আমাকে। স্বার্থ থাকলে আসবে, না থাকলে আসবে না। যারা আসবে তারা স্বার্থ বুঝে নিয়ে পালাবে। অতএব তোমরা আমার কেউ নও। তোমরা তোমাদের এলাকায় থাকো, আমি আমার এলাকায়। এই অভিমানটা এলেই আমি আমার অতীতের দিকে তাকাই। আমার বাবা, মা, ভাই, বোন। যেই আমি সাবালক হলুম, সবাই অমনি হিসেবের খাতা খুলে বসল, গরু তুমি কতটা দুধ দেবে! তোমাকে সাবালক করতে এত খরচ হয়েছে, এইবার শোধ করো। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করবে তা তো হতে পারে না। শ্যামল, বিমল, কমল সবাই রোজগার করছে। স্নেহ! ফেলো কড়ি মাখ তেল। বড় ছেলের মোটা রোজগার, মা সামনে বসে থেকে মাছের মুড়ো খাওয়াচ্ছে। দুধের বাটিতে আমসত্ত্ব। বিছানা করে মশারি ফেলে গুঁজে দিচ্ছে। সবচেয়ে ভাল ঘরটা তার জন্যে। ছেলে যে ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী স্বামীকে খুব খাতির করছে। কেন? মোটা রোজগার। পরিবারকে খুব সুখে রেখেছে। রোজগার গেলে কী হবে? নিত্য মুখঝামটা। উঠতে বসতে খোঁচা। তোমার প্রেম কোথায় গেল! ওই ফোয়ারার মুখ খুলতে হলে চাঁদির চাকতি ছাড়তে হবে। স্বামীকে হয়তো ছেড়েই চলে গেল। যেখানে সুখ সেইখানে আমি। যেখানে মধু সেইখানেই মাছি। পৃথিবীটা মস্ত বড় একটা দোকান। না দিলে কিছু মিলবে না। এইভাবে আমি আমার অভিমানকে টনটনে করে তুলি। আর

তখনই মনে করতে থাকি, আমি একটা গাছ। একা দাঁড়িয়ে আছি। মাথার ওপর আকাশ, তলায় জমি। গাছ কারো কাছে ভিক্ষে চাইতে যায় না। প্রেম, দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা। গাছ চাকরি করে না। গাছ কারো কাছে যায় না। গাছেব কাছেই সকলে আসে। গাছের গতি একটা দিকেই। সেটা হল আকাশের দিকে। গাছ নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে। সূর্যই তার উপাস্য। গাছ কারো পরোয়া করে না। এইটাই আমার অহঙ্কার। তখন চোখ বুজিয়ে নিজেকে দেখি—অচল, অটল আমি। বসে আছি আসনে। আমি পর্বত, আমি নদী, আমি আকাশ। মনের কথা আমি শুনব না। আমি রাজাধিরাজ। মন আমার নীচ ভৃত্য। এই করতে করতে মনটাকে একসময় ধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে দিই। রাজপ্রাসাদে থাকার তার অধিকার নেই। তখন আমি সন্ত তুকারামের মতো বলতে থাকি,

> শুদ্ধ পবিত্র আনন্দ আমার অলংকার,
> মুক্তির উল্লাসে আমি নাচি।
> আমি যে আছি এই কথাটাই ভুলে যাই,
> শরীর আছে; কিন্তু তার বোধ নেই।
> আমি অগ্নি
> ভাল অথবা মন্দ প্রবেশের সাধ্য রাখে না।।
> আমার যত তৃষ্ণা ছিল
> সবই আমি প্যান করেছি
> যত ক্ষুধা ছিল
> সবই আমি আহার করেছি।
> বাসনা স্থান নেই আর
> মন মরে পড়ে গেছে
> তাঁর শ্রীচরণে।'

অন্ধকার ঘরে আমি সেই খেলাতেই মাতলুম। জীবন আমাকে কিছু দেয়নি, দেবেও না। আমি বোকার মতো ভাবছি, এ আমার বন্ধু, ও আমার প্রেমিকা। সবই স্বপ্ন, ভোরের শিশির। সত্য যখন সূর্যের মতো উঠবে তখন সবই অদৃশ্য। সত্যটা কী? তুমি এবং তুমি এবং তুমি। নিজের ক্রুশ নিজেকেই বইতে হবে। যত জড়াবে ততই জড়িয়ে পড়বে। এক সিকি আনন্দের জন্যে একটা টাকা বেরিয়ে যাবে।

দরজা বন্ধ করে বসেছিলুম অন্ধকারে। টোকা পড়ল দরজায়। এমন তো হয় না! আমার খোঁজখবর কে আর রাখে! একা মানুষ একাই থাকি। গরুর মতো রাস্তায় চরে বেড়াই। শাকপাতা যা জোটে তাই খাই। দরজা খুলেই দেখি সামনে রুমকি।

'কী ব্যাপার! এত রাতে তুমি?'

'নীচে চলো, বাবা ডাকছে।'

'কেন বলো তো! বকবেন নাকি!'

'বকবে কেন? দরকারি কথা আছে।'

বয়স্ক মানুষ, বিছানায় বসে আছেন। চেহারাটা বেশ ভারিক্কি। ব্যবসায়ীর যেমন হয়। চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বোসো। খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছে?'

'রাতে আমি তেমন কিছু খাই না।'

'খাবে কী করে! খেতে গেলেই তো রাঁধতে হবে! আজ থেকে তুমি আমাদের এখানে খাবে।'

'আমি রাঁধতে পারি কাকাবাবু। আজ তেলেভাজা খেয়ে পেট ভার। তাই!'

'তেলেভাজা তোমাকে খেতে হবে না, আমাদের সঙ্গে ডাল ভাত খাবে এবার থেকে। আচ্ছা, কাজের কথাটা বলি এইবার। তুমি চাকরি করবে?'

চাকরি! যেচে চাকরি! কপালটা খুলছে মনে হয়।

'কেন করব না! বেকার বসে আছি। আপনি আমাকে চাকরি দেবেন?'

'দোবো বলেই তো ডেকেছি। আমার এক বন্ধুর ফার্মে। বড় কোম্পানি। মাইনে ভালই দেবে।'

'আমাকে কী করতে হবে কাকাবাবু?'

'ওরা বিদেশে মাল পাঠায়। তোমাকে সেই বিভাগটা দেখতে হবে।'

'আমি পারব?'

'পারবে না কেন? তুমি যথেষ্ট ইনটেলিজেন্ট। আমার মনে হয় তুমি খুব ভাল পারবে।'

ভদ্রলোক কেন এত ভাল ব্যবহার করছেন! কী কারণ! নিশ্চয় কোনো স্বার্থ আছে। অকারণ ভালবাসা তো পৃথিবী থেকে উঠে গেছে! অহেতুকী

ভালবাসা! তবু ভাল লাগছে। পিতার মতো একজন কেউ বলছেন, বোসো—খেয়ে যাও। তোমার জন্যে একটা চাকরি ঠিক করেছি।

ভয়ঙ্কর, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর এই পৃথিবী কেমন কোমল হয়ে গেল এই মুহূর্তে! সত্য যাই হোক, মিথ্যাকে কখনো কখনো বড় ভাল লাগে। নেই তবু মনে হচ্ছে আছে। তৃষ্ণার্ত মানুষের চোখে মরীচিকার মতো।

এইটুকু বেশ বুঝেছি বৃদ্ধ যেমন লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে, সেইরকম সাধারণ মানুষ যদি একটা বিশ্বাসকে ধরতে না পারে তাহলে জীবনটাকে মনে হয় নিরালম্ব। আলনায় ঝুলে থাকা জামার মতো ল্যাতপ্যাতে। কিন্তু আমার যে ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করে। নারীর কোমলতা, দীঘির মতো গভীর চোখ, নরম খোঁপা আমার যে মনে হয় কবিতার মতো।

ছোট্ট একটা বাড়ি, একচিলতে বাগান, কিছু ফোটা ফুল। উঠানের মাঝখানে একটা বাতাবী লেবুর গাছ।

ভোরে তোলা উনুনের ধোঁয়া, বাটনা বাটার শব্দ, ধনে-জিরের গন্ধ। তারে দুলবে ভিজে ডুরেশাড়ি। ফর্সা দুটো পায়ের গোছ। গোড়ালিতে লাল আলতা। ঢালু কপালে টিপ। সন্ন্যাসীর গেরুয়া তো এর থেকে দূরে থাকে। সে-জীবনে কঠিন, কঠোর নিয়ম। ত্যাগ, বৈরাগ্য। আমি যে ওই সব পারব না। আমার মন যে দুর্বল। আমি লতার মতো গাছ বেয়ে উঠতে চাই।

দেয়ালে ঠাকুরের ক্যালেন্ডার ফাল্গুনের বাতাসে দোল খাচ্ছে। তাকিয়ে আছি। বলো ঠাকুর, আমার গতি কী হবে!

—তোমাকে তো আমি সন্ন্যাসী হতে বলিনি। সে বলেছিলুম আমার দ্বাদশ শিষ্যকে। সন্ন্যাসীর আদর্শ খুব কঠিন। কামিনী আর কাঞ্চনই হল মায়া। আমি তুলসীদাসের মতোই বলেছিলুম।

অজগর ন করে নকরি, পন্‌ছি ন করে কাম্।
দাস মুলুককো এহি বচন হ্যায়, সব কি দাতা রাম॥

আর কী বলেছি, যদি রামচন্দ্র হৃদপদ্মে রিন্তর বাস করেন আর তিনখণ্ড কৌপীন ও নুন ছাড়া ভাজা খাবার পাওয়া যায়, তাহলে সুরপতি

ইন্দ্রের চেয়েও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি,

তিনটুক্ কপীনকো, আউর ভাঁজি বিন্ লোন।
তুলসী রঘুবর উর বসঁ, ইন্দ্র বাপুর কোন্॥

তিন টুকরো কৌপীন যৎসামান্য আহার আর নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা সন্ন্যাসীর জীবন। শঙ্করাচার্যের মতো বলতে পারি,

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসহশয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥

মন্দির অথবা বৃক্ষতল তোমার গৃহ। হরিণের চর্ম তোমার পরিধান। ভূতল তোমার শয্যা। উপহার অথবা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ। এরই নাম সন্তোষ। এমন ত্যাগীই ধন্য পৃথিবীতে।

তোমার পথ গৃহীর পথ। সৎ হও, সংসারী হও, সংযমী হও, একটি কী দুটি সন্তান, তারপর ভাই বোন। কর্তব্য করো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন পাপ। কর্তব্য শেষ হলে পুরোপুরি ঈশ্বর। ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর চেয়ে সৎ গৃহী অনেক ভাল। ভক্তি আর বিশ্বাস এই সার। ধর্ম হল আনন্দ। ধর্ম হল পবিত্রতা। ধর্ম হল বিবেক, ধর্ম হল জ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি জ্ঞান, ঈশ্বর নেই এইটি অজ্ঞান।

—ঠাকুর, আমার যে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল গেরুয়াধারী মস্ত এক সন্ন্যাসী হব। আমার বিভূতিতে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে। সমীহ করবে। আমি যে তেমন সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছি। তাঁরে জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করেছি। অলৌকিক সব ক্রিয়াকাণ্ড দেখেছি।

—শোনো, শোনো, পূর্বজন্মে করা না থাকলে এ-জন্মে কিছু হয় না।

—আমার পুণ্য কর্মফল কী কিছুই নেই?

—নিশ্চয় আছে, তা না হলে আকাঙ্ক্ষাটা জাগছে কেন? তবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার সংস্কার তোমার নেই। দুঃখ কোরো না। তোমার ভিতরে বৈরাগ্যের অঙ্কুর বিকশিত হয়েছে; কিন্তু ভোগের ইচ্ছাটাও সুপ্ত হয়ে আছে। মনে নেই, আমার কাছে নরেন আর ভবনাথ দু'জনেই আসত। দু'জনকেই আমি সমান পছন্দ করতুম। আমি দু'জনকেই বলতুম 'নিত্যসিদ্ধ' ও 'অরূপের ঘর'।

—নিত্যসিদ্ধ কাকে বলে ভগবান?

—শোনো, স্বভাব অনুযায়ী মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা যায়,

বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। এইবার দেখ, নিত্যজীব—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্যে—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। বদ্ধজীব—বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না। মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ নয়—যেমন সাধু-মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।

কিন্তু হল কী জান, নরেন আমার ঠিক রইল ভবনাথ গেল ভেস্তে। সংসার তাকে গ্রাস করে নিলে। আমার তিরোধানের পর বি.এ. পাস করে, স্কুল ইনস্পেক্টারের চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেল। বরাহনগর মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এল। তবে তোমরা আমার সমাধিস্থ অবস্থার যে-ছবি দেখ সেই ছবিখানি ভবনাথই তুলিয়েছিল বরাহনগরের অবিনাশ দাঁর ক্যামেরায়। ভবনাথই মঠের জন্যে মুন্সীদের ভূতুড়ে বাড়িটা মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে আমার ঘরে ধ্রুবর যে ছবিটা দেখ, সেই ছবি ভবনাথই আমাকে দিয়েছিল। সে দুটো বইও লিখেছিল, 'নীতিকুসুম' ও 'আদর্শ নারী'। তার একটি মেয়ে হয়েছিল, নাম রেখেছিল প্রতিভা। মেয়ের বয়েস যখন দশ, তখন সে ভবানীপুরে থাকে। ওই বাড়িতেই আমার ভবনাথ মারা গেল—কালাজ্বরে।

নরেন তো কারো খাতির করতে শেখেনি, ও ছিল আগুন, ও ছিল আমার খাপখোলা তরোয়াল, যার দুটো ধার—জ্ঞান আর বৈরাগ্য। সে মনে হয় ভবনাথের ওপর শেষটায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল, তা না হলে, বরাহনগর মঠে বসে শশীকে কেন বলছিল—'ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে, তাই সে ফুর্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল!' আমি জানতুম ভবনাথের সংসারে আসক্তি হয়েছে। কামিনী ভাল লাগছে, তাহলে তো কাঞ্চনও চাই। বয়স তখন তেইশ কী চব্বিশ, বিয়ে করলে। আমি তো ভেবে মরি, কর্ম-কাজ চাই, টাকা চাই! নরেনকে বলুলম, 'ওকে খুব সাহস দে।' ভবনাথকে বললুম—'খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিসনে। শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না!' মাস্টার আর নরেন খুব হাসছে। আমি ভবনাথকে বলছি, 'ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি; যে বীরপুরুষ সে রমণীর সঙ্গে থাকে,

না করে রমণ। পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।' এই কথা হয়েছিল কাশীপুরের বাগানে। তোমাকেও আমি সেই একই উপদেশ দিয়ে গেলুম।

যার মন অস্থির হয় তার জীবনে আর কোনো হুশ থাকে না। আমার ভেতরে দুটো মানুষ যেন ঢুকে বসে আছে। একজনের আকাঙ্ক্ষা, মায়ামোহমুক্ত সন্ন্যাসী। সংসার-শৃঙ্খলে জড়াব না কিছুতেই। সে বলছে, সংসার আমি দেখেছি। অনেকের অনেক রকম সংসার। বড়লোকের গাড়িবাড়িঅলা সংসার আমি দেখেছি। ব্যাংকে অনেক টাকা, লকারে অনেক সোনা। মেয়েরা অলস। ছেলেরা অহঙ্কারী কাপ্তেন। কত্তা কেবল টাকার পেছনে ছুটছে। রাতে ঘুমোতে পারে না। হার্টের দেয়ালে চর্বি। মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট। কুলকুল ঘাম। ব্লাডসুগার। হাইপ্রেসার। ভালমন্দ কিছু খাওয়ার উপায় নেই। নানা নিয়মে বাঁধা জীবন। তিনি কামাই করেন, অন্য সবাই ওড়ায়। টাকা ওড়াবে, তবু অভাবীকে দান করবে না। বড় মেদবহুল শরীর; কিন্তু মনটা ইঁদুরের মতো ছোট। গুরু ধরে দীক্ষা নিয়েছেন। পয়সা আছে বলে খাতিরও যথেষ্ট। রবিবারে ধোপদুরস্ত হয়ে ততোধিক সংকীর্ণমনা হয়ে শীর্ণ না হয়ে স্থূলকায় স্ত্রীকে নিয়ে ঝকঝকে গাড়ি চেপে আশ্রমে যান। তাঁকে প্রবেশ করতে দেখে গুরু খাড়া হয়ে বসেন। ঘ্যানঘ্যানে মধ্যবিত্ত শিষ্য-শিষ্যাদের তখন দুর্গন্ধী আবর্জনা বলে মনে হয়। 'আরে এসো এসো, এসো মা এসো' বলে গুরু চনমন করে ওঠেন। এ শিষ্যাটি যে মালদার! আশ্রমের লাল মেঝে ভেঙে গত বছর মোজাইক করে দিয়েছেন। ঠাকুরঘরে মার্বেল বসিয়েছেন। গুরুকে ড্রাইভার সমেত একটা গাড়ি যে কোনোদিন দিতে পারেন। কে গুরু? গুরুকে পুষছেন কে? বড়লোক শিষ্য। এইরকম আরো শিষ্য আছেন। এঁরা সব কামধেনু। আর গুরু হলেন আশ্রমের গোশালায় সন্দেশ ফল আর পায়েসলালিত আধ্যাত্মিক জীব। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে বলেন। খুবই মোটা দাগের সাধারণ কথা, বুঝলে! এ দেহ কী আর থাকবে বাবা! রক্ত মাংসের খাঁচা। এর ওপর এত আসক্তি

কেন? পরক্ষণেই শিষ্যসেবককে খিঁচিয়ে উঠলেন, পাঁচটা বেজে গেল এখনো আমাকে ওষুধ দিলি না! তোরা আমাকে মারবি দেখছি! জীবের মুক্তির জন্যে আরো কিছুদিন এই শরীরটার প্রয়োজন আছে রে! ছানাটা জলে গুলে সরবতের মতো করে দিস। গুরুদেব! আপনার সুগার হল কেন? পরিশ্রমের অভাবে?

মূর্খটাকে কান ধরে বুঝিয়ে দে তো, এ শরীরটা কোন্ শরীর! এ হল ভগবতী তনু। সেই বেদমন্ত্রটা শুনিয়ে দে,

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।
মধূনক্তমুতষসো মধূমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥

মানেটা কী? ঈশ্বরকে ধরতে পারলে সব মধু। বাতাসে মধু, সমুদ্রের মধু, রক্তে মধু। মধু চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে। সিদ্ধ মহামানবের এইটাই তো যন্ত্রণা। আমার এখন সুগার কত রে? দুশো কুড়ি। তাহলে বোঝো! আমার বাণীতে এত মধু আসছে কোথা থেকে? একেবারে আখ হয়ে বসে আছি! মৌচাকও বলতে পারো। আর কিছু দিন পরে দেখবে মৌমাছি আমাকে ছেঁকে ধরেছে। চুটিয়ে সাধনভজন করলে এইরকম হয় বাবা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে এঁদের চিনতেন। সাবধান করেছিলেন, "গুরু, বাবা ও কর্তা—এ তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে, চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা; তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা'—গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দিকে তাকিয়ে বলছেন, "আচার্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মানছে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, 'আমি বলছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ওই পর্যন্ত! ওই একটু মান; লোকে হদ্দ বলবে, 'আহা বিজয়বাবু বেশ বললেন, লোকটা খুব জ্ঞানী। 'আমি বলছি' এ জ্ঞান করো না। আমি মাকে বলি, "মা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি।"

সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কে গুরু হতে পারেন? কেউ না। মানুষ তো প্রকৃত গুরু চায় না। চায় একটা ঢং। আমার ঠাকুরের কাছে সবাই ঠাণ্ডা। ট্যা ফোঁ করার উপায় নেই। কেমন বলছেন, 'যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এইসব হয়। অনেকের ইচ্ছা হয় গুরুগিরি করি—পাঁচজনে গনে মানে—শিষ্য-সেবক হয়; লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়—কত লোক আসছে যাচ্ছে—শিষ্য-সেবক অনেক হয়েছে—ঘরে জিনিসপত্র থইথই করছে। কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে—সে যদি মনে করে—তার এমন শক্তি হয়েছে যে, কত লোককে খাওয়াতে পারে!'

এরপর আমার ঠাকুর বোমা ফাটিয়েছেন। বলছেন, ''শোন, গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মতো।—ছাড় টাকা-কড়ি লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্যে আপনাকে বিক্রি করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়—এখন তার বেশ হয়েছে—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে—ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তপোশ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া—কত লোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে। অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে। সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ!'

বড়লোকেদের ফ্যাশান হল গুরু ধরা। আর গুরুদের ধান্দা হল বড়লোক চেলাদের খেলানো। এইসব আমি খুব দেখেছি ঠাকুর। সাষ্টাঙ্গে ভক্তিভরে প্রণাম করছি। যেমন আপনি বলেছিলেন বারে বারে, গুরু পথ দেখান। গুরুকৃপা হলে মায়া, মোহ, অজ্ঞান দূর হয়ে যায়, অষ্টপাশ ছিন্ন হয়, সেই ভেবেই আপ্লুত প্রণাম। তিনি একবার ফিরেই তাকালেন না। আমাকে পথ দেখাবেন কী, নিজেই নিজের পথ খুঁজতে ব্যস্ত: প্রোমোটার সেনমশাই এসেছেন। বহুতল বাড়ি তৈরির ব্যবসা। একালের কবুতর সভ্যতার কপোত-কপোতীদের তিনি খোপ তৈরি করে দেন। সেই সেনমশাইকে তৈলমর্দন করছেন তিনি, বিমানে করে সপার্ষদ নেপাল যাবেন। বাবা পশুপতিনাথ ভয়ঙ্কর টানছেন। রাতে স্বপ্নদর্শন হচ্ছে। আমার মতো অভাজনকে তিনি দেখবেন কেন? আমার না আছে ব্যবসা, না আছে

গাড়ি!

গুরুকে ঘিরে ব্যবসায়ী, বড় ফার্মের ডিরেক্টার, বড় সরকারি চাকুরেদের একটা ক্লাব মতো গড়ে ওঠে। তাতে লেনদেনের সুবিধে হয়। গুরু মধ্যস্থতা করেন। সেন, তোমার কোন কাজটা আটকেছে বলো না! অ প্ল্যান স্যাংশান? আরে আজই আমি বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের মল্লিককে বলে দিচ্ছি।

গুরুদেব আপনার কী কৃপা!

ঠাকুর এইসব গুরুদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, "গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে 'আমি গুরু', সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হালকা দিকটা উঁচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হালকা। সকলেই গুরু হতে যায়—শিষ্য পাওয়া যায় না!'

আর একটা কথা তোমাকে বলেছিলুম, সেটা কী মনে আছে?

কোন প্রসঙ্গে ঠাকুর?

এই গুরু-প্রসঙ্গে!

হ্যাঁ, মনে আছে। একটা গল্পের প্রসঙ্গে জের টেনেছিলেন এই বলে, 'যদি সদগুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসারবন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।'

ঘর ছেড়ে আকাশের তলায় বেরিয়ে আসতে পারলেই মনের সঙ্কীর্ণতা অনেকটা কেটে যেতে পারে। মুক্ত থেকেই তো মুক্তি শব্দটা এসেছে। দেহ একটা খাঁচা। সেটা আবার ঝুলছে কোথায়? পাঁচ দেয়ালের কুঠরিতে। তার নাম ঘর। দেয়ালে ছোপ ধরে আছে। বহুদিনের, বহুজনের বেঁচে থাকার দুঃখ, সুখ, কামনা, লালসা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কার। কত কী কাটলে তবে মানুষ মুক্ত হতে পারবে। মুক্তি কী মুখের কথা? মুক্তি শব্দটার মধ্যে মুক্তি নেই। কঠিন একটা যুক্তাক্ষর। মুক্তি, যুক্তি, বন্ধন, নিষ্কৃতি, ভক্তি,

শক্তি সবই কঠিন শব্দ। এই কাঠিন্যই বোঝাতে চাইছে, পথ দুর্গম। মুক্তি যুক্তিতে নেই, ভক্তি শক্তিতে নেই, বন্ধন রজ্জুতে নেই, সব আছে মনে। খাঁচার দরজাটা খুব ছোট কিন্তু একবার খুলতে পারলেই একেবারে গায়ে গায়েই লেগে আছে মহাকাশের ঠিকানা। তামাশাটা এই, বন্ধনে প্রবেশ আর মুক্তিতে প্রকাশের পথ খুবই সঙ্কীর্ণ। একটা ফোকরের মতো। এপাশে অন্ধকার ওপাশে আলো।

বন্ধনের একটা তামসিক আলস্য আছে। মায়া আছে। ঠাকুর, আপনার সেই উপমা! মাছ আর জাল। কিছু মাছ জালে পড়া মাত্রই লাফিয়ে পালায়। এরা হল নিত্যসিদ্ধের থাক। মানুষের মধ্যে এঁরা হলেন নারদাদি ভক্তের দল। সংসারে আবদ্ধ হন না। কিছু মাছ পালাতে পারেনি, জালে আটকে পড়েছে; কিন্তু ধপাং ধপাং করছে। পালাবার, মুক্ত হওয়ার ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এরা মানুষের মধ্যে মুমুক্ষুর থাক। বেঁধেছ বটে তবে সেই বন্ধন থেকে যেভাবেই হোক মুক্ত হতে হবে। আর কিছু মাছ জাল মুখে করে চোঁচোঁ একেবারে পুকুরের গভীর পাঁকে গিয়ে আরামসে শুয়ে পড়ে, ভাবে বেশ আছি। এরা হল বদ্ধজীবের উপমা।

বেশ আছি! আপনি দিলেন উটের উপমা। উট কাঁটাগাছের পাতা খায়। দু'কষ বেয়ে ঝুঁজিয়ে রক্ত ঝরছে। সেইটাই উটের সুখ। বদ্ধজীব মুক্ত হতে ভয় পায়। মুক্তি, সে এত উদার, যে অতটা অনেকেরই সহ্য হয় না। বন্ধনের প্রথম দান, ভয়। বেশ বড় মাপের একটা ইঁদুরকলে আমাদের চির বসবাস। সেইখানেই জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু। কী দিয়ে তৈরি এই কল? সংস্কার আর অভ্যাস। কেউ আমাকে বন্দী করেনি। আমি নিজেই নিজেকে বন্ধনে ফেলে রেখেছি। সমুদ্র তীর থেকে দেখায় কোনো আতঙ্ক নেই। অন্তহীন মাঝসমুদ্রে মহাভয়। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে সুনীল আকাশ, কবিতা। অনন্ত আকাশে ভেসে থাকা মহাভয়। সেখানে কবিতা নেই।

আমার একটা নতুন ডেরা হয়েছে। মানুষটা বড় ভাল। বড় মজার মানুষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব ঘোরা হয়ে গেছে। কোনো দেশ বাকি নেই। লেখাপড়াও প্রচুর। নাম দেবাংশু মিত্র। আমার দেবুদা। বসে মনে হয় পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দেখে বোঝার উপায় নেই। সংসার করেন নি। একা একটা বাড়িতে থাকেন। সাবেক আমলের বনেদী বাড়ি।

মাঝেমাঝেই চিৎকার করেন, 'কোই হায়? কোথায় সব গেলে বাবা!

মরে ভূত?'

দেবুদার একটা ডেকচেয়ার আছে। রেলস্টেশনের রিটায়ারিং রুমে যেমন থাকে। 'এটা আমার ঠাকুরদার জিনিস। রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর মিত্র এই আরামকেদারায় আড় হয়ে শুয়ে গড়গড়ায় অম্বুরি তামাক সেবন করতেন, আর নিজের সমৃদ্ধি বাড়াবার ফন্দি আঁটতেন। রায়বাহাদুর মরলেন কিসে, না বজ্রাঘাতে! ভাগ্যবান অবশ্যই। এমন মৃত্যু ক'জনের হয়? বসন্ত, ওলাওঠায় মরার চেয়ে ওই মৃত্যু কত মজাদার! চড়াক করে একটা ফ্ল্যাশ, ঝলসে পোড়া কাঠ!'

দেবুদা ঘুমঘুম চোখে বললেন, 'আয়, কোথায় ছিলিস এ কদিন? শরীরটা বড় বেজুত হয়েছে রে! চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুম পাচ্ছে!'

দেবুদা যেখানে বসে আছে তার সামনের দেয়ালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল এক ছবি। সেই ছবির দিকে হাত তুলে দেবুদা বললেন, 'বুড়োকে জিজ্ঞেস কর তো প্ল্যানটা কী?'

'প্ল্যান আবার কী! তোমার খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না।'

'পঞ্চাশের পর খাওয়াটা কোনো ফ্যাক্‌টার নয়।'

'আজ কী খেলে শুনি?'

'আজ ফাসকেলাস! মুড়ি, আলুরচপ, বেগুনি, ফুলুরি। আর এখনো পর্যন্ত সাতকাপ চা। সবে সন্ধে। বারো কমপ্লিট করে শুতে যাব। এই তো এখুনি অষ্টম কাপ হবে! তুই এসে গেছিস, জগার দোকানে বলে আয়।'

'এইটা তোমার খাওয়া হল! এতে শরীর থাকে!'

'তুমি কী খেয়েছ মানিক?'

'আমি তোমার চেয়ে ভাল খেয়েছি। ছাতু, আচার, পেঁয়াজ, লঙ্কা।'

'আজ এমন বিহারী ভোজ কেন?'

'রান্নায় বৈরাগ্য এসেছিল। রোজ রোজ রান্না করা যায়, তুমিই বলো!'

'তাহলে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিলে কেন চাঁদ?'

'তোমার তো রান্নার লোক আছে!'

'তিনি ভূতের ভয়ে পালিয়েছেন।'

'সে আবার কী!'

'এই বাড়িতে তিনি প্রায়ই ভূত দেখেন। সেই ভূত আছে রান্নাঘরের দিকে যে একতলা অংশটা তারই ছাতে। সে আবার মহিলা। চুল এলো

করে দাঁড়িয়ে থাকে যখন-তখন। তুই কখনো ভূত দেখেছিস?'

'না। আমার গুরু বলেছিলে, যে ভূত দেখেছে সে ভগবানকে একদিন দেখবে।'

'ভূত অনেকেই দেখে, ভগবান অত সহজে দর্শন দেন না। আমি তাই ভূত নিয়ে গবেষণা করছি। জানিস তো, রমণী ভূত সব সময় সাদা শাড়ি পরে থাকে! কখনো চুল বাঁধে না। মুখটা কঙ্কালের মতো হলেও চুলটা ঠিক থাকে। তুই কোনো মহিলা ভূতকে রঙীন শাড়ি পরতে দেখেছিস?'

'আমি তো ভূতই দেখিনি! কি পরে আছে, সে আর দেখব কী করে?'

'ভূত হল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফ। কালো শরীর সাদা পোশাক, যাতে অন্ধকারে স্পষ্ট হয়। এসব বিজ্ঞানের ব্যাপার, বুঝলি তো!'

'তুমি দেখেছ?'

'ক'দিন ধরে খুব চেষ্টা করছি। প্রহরে প্রহরে ওদিকে যাই, আর ছাতটার দিকে তাকিয়ে থাকি। এখনো পর্যন্ত বেড়াল ছাড়া চোখে কিছু পড়েনি।'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে তোমার শেষে এই জ্ঞান হল, ভূত আছে!'

'পৃথিবীতে সব কিছুই থাকতে পারে। অবিশ্বাস করব কেন? আমার বুড়ো বলতেন, অবিশ্বাস কোরো না। অবিশ্বাস হল অজ্ঞান। চারপাশে অবিশ্বাসের পাঁচিল খাড়া করে রাখলে জ্ঞান ঢুকবে কী করে? মনে নেই, মাস্টারমশাইকে প্রথম দর্শনের দিন জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে'? মাস্টারমশাই মনে মনে ভাবছেন, এ আবার কি! সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকলে ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হতে পারে? দুটো বিপরীত অবস্থা কি সত্য হতে পারে? সাদা জিনিস—দুধ, কি আবার কালো হতে পারে? উত্তর দিলেন, আজ্ঞে নিরাকার—আমার এইটা ভাল লাগে।

ঠাকুর বলছেন, 'তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালই। তবে এ বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।

'এই পৃথিবীতে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কেমন করে বলব! কতটুকুই বা জানি! ঠাকুর একদিন বলছেন, দেব মোড়লের বাড়িতে

দেখেছিলাম একজন পিশাচসিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিস এনে দিত। ঠাকুর এক বাগানবাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে কিছু পাপাত্মা ছিল, তারা সহ্য করতে না পেরে হইহই করে উঠল, তুমি কেন এলে, তুমি কেন এলে?

কোথায় কি আছে ভাই, কে বলতে পারে? আমি মূর্খ মানুষ, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করি। একদিন খুব মাথার যন্ত্রণা, এই চেয়ারটায় পড়ে আছি। আচ্ছন্ন হয়ে। হঠাৎ মনে হল, কে যেন খুব ভালবেসে মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ভয়ে আর চোখ খুলিনি। একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি।'

'যাক ভূত তাহলে তোমাকে অনশনে রাখবে, এই সিদ্ধান্তই করেছ! রাতে কী? মুড়ি?'

'মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সেই ছেলেবেলার মতো ফিস্টি করবি। ফুলকো লুচি, ঝাল-ঝাল আলুর দম। ভাঁড়ারে সব কিছুই আছে।'

'তা করলে হয়। বহুদিন ভাল কিছু খাইনি। কদিন খুব ছোলার ডাল খেতে ইচ্ছে হয়েছে।'

'তাও আছে। চল, বুড়োকে আজ ভোগ নিবেদন করা যাক।'

কর্মযজ্ঞ শুরু হল। খুব ধুমধাম। দেবুদা বসে গেল বাটনা বাটতে। রাত দশটার সময় ধূপ জ্বেলে, গঙ্গার জলে মেঝে মুছে ঠাকুরকে নতুন থালায় ভোগ নিবেদন করা হল। দরজা বন্ধ করে আমরা বাইরে। দেবুদা গান ধরেছেন,

> এবার আমি ভাল ভেবেছি
> ভাব ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি
> যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
> আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥

খাওয়াটা বেশ জবরদস্ত হল। সেই কতকাল আগে এমন মৌজ করে লুচি ছোলার ডাল খেয়েছিলুম। সেই সব চরিত্র আমার জীবন ছেড়ে চলে

গেছে। স্নেহ করার মতো আর কেউ নেই। বই শেষ, মলাট বন্ধ। আঁকাবাঁকা নদীর মতো। এক বাঁকে দাঁড়ালে আর একটা বাঁক দেখা যায় না। মনে হয়, নদী বুঝি এই বাঁকেই শেষ! তা কী হয়? সাগরে না গেলে শেষ হবে কী করে?

দেবুদা তার সেই বিখ্যাত পাইপ ধরিয়েছে। বিদ্‌ঘুটে গন্ধ।

'ওই বিদিগিচ্ছিরি জিনিসটা ধরালে কেন?'

'এটা আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী।'

'সিগারেট খেলে কী হয়?'

'সিগারেট মেয়েরা খায়। কোনো ব্যক্তিত্ব নেই।'

'গন্ধটা অসহ্য।'

'চার্চিল যে চুরুট খেতেন, সেই রকম একটা চুরুট ধরালে কী করতিস? যা, মোড়ের থেকে জর্দা পান কিনে আন। তুই খাবি তো?'

'আমি পান খাই না।'

'পান খাবি না, পাইপ খাবি না, আর কতকাল নাবালক হয়ে থাকবি! এই বেলা একটা নেশা ধরে ফেল, ভালো থাকবি। আজ আমার অনুরোধে একটা পান খেয়ে দেখ।'

'পয়সা দাও, তোমাকে এনে দিচ্ছি। আমাকে অনুরোধ কোরো না।'

রাস্তায় নামতেই অপূর্ব দৃশ্য। শবদেহ নিয়ে একদল মানুষ মিছিল করে শ্মশানে চলেছে। বড় বড় পদ্ম দিয়ে সাজানো খাট। ধূপের গন্ধ। মৃদু হরিধ্বনি। বেশ বড় একজন কেউ মারা গেছেন। মহা আরামে শুয়ে আছেন। শব মিছিল দেখলেই আমার পিছু পিছু যেতে ইচ্ছে করে। ব্যাপারটার মধ্যে ভীষণ একটা পবিত্রতা আছে। চিতাই হল সত্য। নদী যায় সাগরে, মানুষ যায় চিতায়। লকলকে আগুন। শত শত জিভ।

একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে গেলেন ভাই?'

'আরে আমাদের বিখ্যাত অভিনেতা মৃণাল চৌধুরী! হার্ট অ্যাটাক।'

'কে কে আছেন পরিবারে?'

'কেউ নেই। শিল্পীদের সাধারণত কেউ থাকে না।'

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। 'কত বয়েস হয়েছিল?'

'বেশী না, ফিফটি ফাইভ। নতুন নাটকের রিহার্সাল চলছিল। হঠাৎ

হার্টে মারল রক্তের চোট। ডাক্তার ডাকারও সময় পাওয়া গেল না। শিল্পীরা এই ভাবেই যায়। বেপরোয়া জীবন, বেপরোয়া মৃত্যু। মৃণালদার অভিনয় দেখেছো?'

'আমি তো থিয়েটার দেখি না!'

'তা কেন দেখবে? হিন্দি সিনেমা দেখবে! আমি মৃণালদার সঙ্গে তিনটে নাটক করেছি। অসাধারণ অভিনেতা, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিতেন। এইবার আমাদের কী হবে! আমরা কোথায় যাবো!'

ভদ্রলোক কাঁদছেন। আমারও কান্না পেয়ে গেল। প্রতিভার মৃত্যু।

মোড়ের দোকান থেকে ঝট্ করে একটা পান কিনে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলুম।

দেবুদা বললে, 'কী রে, হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'ছুটতে ছুটতে এলুম, আমাকে এখন শ্মশানে যেতে হবে।'

'কেন?'

'বিখ্যাত অভিনেতা মৃণাল চৌধুরী মারা গেছেন।'

'মৃণাল মারা গেল! নিয়ে যাচ্ছে দেখলি?'

'হ্যাঁ, অনেক লোক প্রচুর ফুল।'

'তাহলে চল, আমিও শ্মশানে যাবো। পানটা থাক। এসে খাওয়া যাবে। মৃণাল আর আমি একই ক্লাসে পড়তুম, আমার ক্লাসফ্রেন্ড। কলেজেও পড়েছি একসঙ্গে। ঘোষেদের বাগানে একসঙ্গে কালবৈশাখীর আম কুড়িয়েছি। ওদের বাড়ির বড় মেয়ে সুধার সঙ্গে মৃণালের প্রেম হয়েছিল। সুধার বাবা সুধাকে এখান থেকে সরিয়ে দিল। সুধা আত্মহত্যা করল। সুধার বাবা হরেন ঘোষ আধপাগলা হয়ে গেল। ছোট ভাই নগেন ঘোষ বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসা সব মেরে দিলে। মৃণাল নাটকের লাইনে এসে খুব নাম করলে। আর সুধার বাবা আর মাকে নিজের কাছে রেখে সেবা করতে লাগল। নগেন ঘোষ রটিয়ে দিলে, হরেন ঘোষের বউয়ের সঙ্গে মৃণালের অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে, তা না হলে এত আদর করবে কেন? মৃণালের কাছে নিন্দা ও স্তুতি দুটোই ছিল সমান। জীবনে অভিনয় ছাড়া কোনো কিছুকেই পাত্তা দেয়নি মৃণাল। সে বলত, সুধার বাবা-মা আমারও বাবা-মা। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেছিল বলেই না এই দুর্যোগ! সত্যিই তো, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে সুধা কী সুখী হত? আমি ছিলুম ওদের জীবনের অভিশাপ।

আমার জন্যেই সংসার ছারখার হয়ে গেল। নগেন তো নিমিত্ত মাত্র। মৃণালের স্নেহে ও সেবায় হরেন ঘোষ সুস্থ হয়েছিল। মৃণালের বোলবোলার সময় মৃণালের ম্যানেজার হয়েছিলেন। ভদ্রলোকের দক্ষতার অভাব ছিল না। আবার একটা ব্যাবসা ফাঁদলেন। নগেন ঘোষ জোচ্চরটাকে ব্যবসার জগৎ থেকে দূর করে দিলেন। সুধার নামে একটা মেয়েদের স্কুল করে দিলেন, কলকাতার হাসপাতালে পাঁচটা বেড। মৃণালের জীবনটা খুব সুখের হয়েছিল।'

'নিজের মা-বাবা?'

'গোঁড়া পরিবার। নাটুকে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। পরিচয় দিতে লজ্জা পেতেন।'

'নিজের চরিত্র কেমন ছিল?'

'চরিত্র বলতে তুই কি বুঝিস?'

'আমার ঠাকুর যা বুঝতেন।'

'গিরিশ ঘোষকে বলতেন ভক্তের ভক্ত। মদ মেয়েছেলে দুই-ই ছিল।'

'আবার তাঁর ঠাকুরও ছিল। সেটা ছাড়া গিরিশ কিছুই নয়।'

'মৃণালের মা ভবতারিণী ছিল। মা কালীর উপাসক। নিজে কালীপুজো করত। শেষটা তো প্রায় সাধকের জীবনই হয়ে গিয়েছিল। যাকে যা বলত তাই ফলে যেত। স্টেজে এসে দাঁড়ালে দর্শকরা স্তব্ধ হয়ে যেত। ঠাকুর কী বলতেন, যার সম্মোহিনী শক্তি আছে, যাকে পাঁচজনে মানে, তার মধ্যেও শক্তির জাগরণ হয়েছে, সে-ও সাধক।'

আমরা শ্মশানের পথ ধরলুম। ফুল ফেলতে ফেলতে চলে গেছেন মৃণাল চৌধুরী। বাঁচা, সাফল্য, যশ, খ্যাতি, প্রতিভা পাঁপড়িতে ঝরে গেছে। দু'পাশের বাড়ির দেয়ালে লেগে আছে ধূপের সৌরভ।

মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবি। কারোকে বলবি না কোথায় যাচ্ছিস। এটা হল টোটকা দাওয়াই। নানা লোকে নানা কথা বলবে, জীবনসংগ্রাম, প্রতিযোগিতা, বাস্তবমুখীনতা। বলবে, বড় বড় চিন্তার

প্রয়োজন নেই। মানুষের প্রয়োজন তিনটে—আহার, নিদ্রা, মৈথুন। পৃথিবীতে একবারই এসেছ। ভোগ করে যাও। তুমিই সব। এর বাইরে কিছু নেই। রোজগার কবো, পারলে গাড়ি বাড়ি কর। পারলে ক্ষমতা দখল করো, নেতা হও। ধান্দাবাজ হও, সুবিধেবাদী হও। যে লোক তোমার কাজে আসতে পারে, তাকে পাখি হয়ে ডিমে তা দেওয়ার মতো তা দাও। স্বার্থের ডিম ফুটে বাচ্চাটা বেরনো মাত্র খোলাটা ফেলে দাও। কৃতজ্ঞতার বোধটাকে মেরে ফেলে স্বার্থপর হও।

সব শুনে যাবে মন দিয়ে। কিন্তু মনে রাখবে, এরা দুদিনের। মশা, মাছির মতো। কিছুকাল ভ্যান ভ্যান করে নিজেদের কলে নিজেরাই মরবে। সার্কাসের মেয়ে তারে উঠে খেলা দেখায়। খুব বাহবা, হাততালি। কতক্ষণের জন্যে! একসময় তাকে নামতেই হবে। নিজের ইচ্ছেয় না নামলে দুম করে পড়ে যাবে। জীবনের সত্য একটাই, বিকাশ। ফুলের মতো ফুটে, সুগন্ধ ছড়িয়ে ঝরে যাও। যা দেওয়ার আছে দিয়ে যাও। সেবা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, সৎকর্ম, মানুষের আদর্শ, সৎ চিন্তার ফসল। জীবন হল একখণ্ড জমি। তুমি হলে কৃষক। কর্ষণ করো, বীজ ফেল, জলসিঞ্চন করো। ফসল দান করে দাও আগামীকালকে।

শ্মশান তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে জীবনের পরিণতি। তোমাকে শেখাবে নিরাসক্তি। তুমি যে ক্ষণকালের বুদবুদ, এই সত্যটা তোমাকে শেখাবে। চিরকাল কেউ থাকেনি, থাকবেও না। দেবুদা এই সব কথাই আমাকে বলতে লাগলেন। হুহু করছে অন্ধকার রাত। সামনে প্রবাহিত গঙ্গার অস্পষ্ট শব্দ। যেন মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একদল বৌদ্ধ শ্রমণ কোনো মঠের দিকে চলেছেন। মহাতীর্থের মহাযাত্রী সব। আমাদের পেছনেই জ্বলছে চিতা। প্রখ্যাত এক নটের কন্দর্পকান্তি দেহ পুড়ে ছাই হচ্ছে। রাতের পর রাত যিনি মানুকে কাঁদিয়েছেন, হাসিয়েছেন।

দেবুদার একটা হাত আমার হাতে। দুজনে বসে আছি পাশাপাশি। যেন কতকালের আত্মীয়। আমার সঙ্গে এই অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতার তো কোনো কারণ ছিল না। এত বড় এক মানুষ। গর্ব করার মতো তো অনেক কিছুই আছে দেবুদার। সারা বিশ্বঘোরা জ্ঞানী এক মানুষ। অর্থের কোনো অভাব ছিল না, আজও নেই। চারপাশে বড় বড় আত্মীয়-স্বজন। দেবুদা তাঁদের থেকে একটু দূরে-দূরেই থাকেন, কারণ তাঁরা বোঝাতে চান, তুমি জীবনটাকে নষ্ট করলে,

পাঁচটা বাজে লোকের সঙ্গে মিশে। একটা সংসার করতে পারতে। বড়ঘরের সুন্দরী অহঙ্কারী মেয়ের তো অভাব ছিল না। দু'একটা ছেলেমেয়ে। বিলেতে লেখাপড়া শিখে আসত। দেবু, তুমি কিছু লোফারদের সঙ্গে মিশে, বাউন্ডুলে হয়ে জীবনটাকে এমন করে ফেললে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পানঅলা, বিড়িঅলা, চায়ের দোকানের বয়, ময়রা, মুদী তোমার প্রাণের বন্ধু। শেম, শেম!

'বুঝলি, এতে আমার যে কী ভাল হয়েছে! বড় বড় চালের কথা। মানুষকে মানুষকে মনে করে না। এত বড় বড় শরীর, এতটুকু এতটুকু মন। মানুষের শরীরে মুরগীর হৃদয়। দেশের আশি ভাগ মানুষ কী ভাবে বেঁচে আছে সে খবর রাখে না। অলস। এই যে তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, এটা ওরা ভাবতেই পারে না। আমার কেবল একটাই চিন্তা, তোর একটা রোজগার দরকার। একটা চাকরি।'

'আমাকে ইটখোলায় একটা চাকরি দেবে বলেছে। কয়েক দিন করেও এসেছি।'

'ওটা কোনো চাকরি নয়। ইটভাঁটায় সারাবছর কাজ হয় না। বর্ষাকালে বন্ধ থাকে, কাজ হয় না। তোকে অন্য কোথাও একটা ভাল চাকরি করে দিতে হবে। সংসার করতে হবে না? তোর তো আবার একজন প্রেমিকা আছে!'

'ধুস্, ও কিছু নয়। কয়েকদিন আমার মাথায় ভূত চেপেছিল। সে ভূত ছেড়ে গেছে।'

'ছাড়ল কেন?'

'ওর বাবা ব্যবসা করে। এখন ছোট ব্যবসা। দেখতে দেখতে বড় হবে। তখন ভাল জায়গায় বাড়ি করে চলে যাবে। আমাকে তখন বড়জোর জানলা-দরজা ঝাড়ার একটা চাকরি দিতে পারে।'

'মেয়েটা তোকে কিছু বলেছে?'

'সে কিছু বলেনি। তার হয়ে আমিই আমাকে বলেছি। বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরেই থাকছি, মুখোমুখি যাতে দেখা না হয়ে যায়।'

'সংসারও করবি না, সন্ন্যাসীও হবি না, জীবনটা তাহলে কী রকম চেহারা নেবে?'

'তোমার মতো।'

'আমার মতো হবে না রে। আমার যে একটা রোজগার ছিল, আমাকে তো কোনো দিন বসে বসে খেতে হয়নি। দুহাতে আয় করেছি, দুহাতে খরচ করেছি। সেই স্বাধীনতাটা আমার ছিল।'

'আমি তাহলে কী করব? বয়েস তো বসে থাকবে না? তাহলে আবার কী আমি কোনো আশ্রমে চলে যাবো?'

'দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার জন্য আশ্রমে যাবি! তোর মধ্যে সত্যিই কী কোনো সন্ন্যাসীর নড়াচড়া টের পাচ্ছিস! সত্যি কথা বলবি, আমাকে মিথ্যে বলবি না।'

'না, সন্ন্যাসী নেই। আমার খেতে ভাল লাগে, ঘুমোতে ভাল লাগে, লুকিয়ে-চুরিয়ে মেয়েদের শরীর দেখতে ভাল লাগে। অপরের সৌভাগ্যে আমার হিংসে হয়। আমার মধ্যে এ ভাল, ও খারাপ এই বোধও আছে। আর তোমার শুনলে খারাপ লাগবে, ইটভাঁটার এক কামীন মেয়েকে দেখে সারাটা দিন আমার পাগল-পাগল অবস্থায় কেটেছে। সে এক বিশ্রী রকমের কাম। আমার ভেতরে একটা লম্পট, একটা ভণ্ড বসে আছে। আমার চোখ পাপীর চোখ। আমার ভেতরটা খুব ময়লা। আবর্জনায় ভরা। নিজেকে আমি চিনতে পেরেছি। আমি সুযোগ পেলেই, যে কোনোদিন একটা খারাপ কাজ করে ফেলব। ধরা না পড়লে আবার করব। সাহস বেড়ে যাবে, আবার করব। শেষে আমি এত খারাপ হয়ে যাব যে মার্কা-মারা খারাপরাও লজ্জা পাবে। আমার মন খুব দুর্বল। আমাকে লোভ দেখালেই আমি আর ধরে রাখতে পারব না নিজেকে। আমার ভাড়াটের ওই মেয়েটাই আমার পতনের কারণ হবে! দেবুদা, তুমি কী করে কামজয়ী হলে?'

'আমার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষ্কার বলে গেছেন, ''কাম জয় করা যায় না। শুধু মুখটা ঘুরিয়ে দিতে হয়।'' জল গড়িয়ে ওই দিকে যাচ্ছিল, আঙুল দিয়ে দাগ কেটে ধারাটা ঘুরিয়ে দাও। অন্য অনেক কাজের মধ্যে মনটাকে ফেলে রাখ। ঘরে একজন থাকলে আর একজন ঢুকতে পারে না। মন একটা ঘর।'

পকেটে একটা চিঠি, পায়ের তলায় কলকাতা, চারপাশে ব্যস্ত ডালহৌসির অফিস পাড়া। চিঠিটা দেবুদা দিয়েছেন তাঁর বন্ধু কর্নেল চৌধুরীকে। কর্নেল সাহেব এক তাজা কোম্পানির ডিরেক্টার। একবার কৃপা-দৃষ্টিতে চাইলে আমার অবস্থা যে কতটা ফিরে যাবে তার কোনো ধারণা আমার নেই। যে খাটতে পারে, সৎ, কর্নেল তাকে রাজত্ব, রাজকন্যা দিতে প্রস্তুত।

বেয়ারা চিঠিটা নিয়ে ভিতরে গেল। ফিরে এসে বললে, 'বসতে হবে।'

বসতে যখন হবে, বসেই পড়ি। চেয়ার গোটাকতক। দেওয়ালে কিছু যন্ত্রপাতির ছবি। ট্র্যাক্টার, পাওয়ার টিলার, লন মোয়ার। মাথার ওপর পাখা। মৃদু কিঁচ কিঁচ শব্দ। পাশের আর একটা ঘরে টাইপরাইটারের খটাস খটাস শব্দ। কেমন যেন মনমরা অফিস। তবে বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে। বসে থাকতে খারাপ লাগছিল না। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল, চাকরিটা আমি পেয়েই গেছি।

প্রায় একঘণ্টা, তারপর আমার ডাক পড়ল। প্রবীণ একজন মানুষ। পেটা কড়ার মতো স্বাস্থ্য। মাথার সমস্ত চুল ধবধবে সাদা। কার্পেটমোড়া মেঝে। পালিশ করা টেবিল।

—বোসো।

নমস্কার করেই ঢুকে ছিলুম। বসে আর একবার নমস্কার করলুম। ভদ্রলোকের চোখ দুটো অসম্ভব জ্বলজ্বলে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। অস্বস্তি হয়। মনে হয় ভেতরটা পড়ে ফেলছেন। বেশ কিছুক্ষণ কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন। শেষে প্রশ্ন করলেন, —কি করো?

—কিছুই করি না।

—কেন করো না?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেলুম। কী বলব? কেন কিছু করি না? বলব, চাকরি পাই না? চাকরির চেষ্টা তো সে ভাবে করিনি! ক'জনের কাছে গেছি? এই ভাবনার পর বললুম,—প্রয়োজন হয়নি।

—এখন হঠাৎ হল?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—বাঁচার শখ হয়েছে।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন—ব্যঙ্গ করছ?

—অভদ্র নই। আমি দেবুদার বন্ধু। এতকাল আমার জীবন কেবল মরে যাওয়ার কথা ভাবাত। কেবলই বলত, বেঁচে থেকে কী হবে! তোমার বাঁচার কোনো অধিকার নেই!

—কেন?

—সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস। অনেকটা পেছনে হবে। ধৈর্য থাকবে না আপনার। এখন মনে হচ্ছে, মরে গিয়ে পালাব কেন? অত ভয় কিসের? একবার চেষ্টা করে দেখি। আপনার কাছে আসতুম না, দেবুদাই পাঠালেন জোর করে। কোনো কিছু চাইতে আমার ভাল লাগে না, বিশেষ করে উপকার।

—তোমার কী এই ভাবেই কথা বলার অভ্যাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তার মানে, এই পৃথিবীর তুমি কিছুই জান না। এখানে মানুষের দুটো জাত, এক জাতের মানুষ চাইবে, তারা নিচু জাতের, আর এক জাতের মানুষ দেখবে, তারা উঁচু জাতের। এর বাইরে আর কিছু নেই। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এসব কিছুই নয়। তুমি আমার কাছে একটা চাকরি চাইতে এসেছ। তুমি প্রার্থী। তুমি ভিখিরি। তোমার মুখে সেই ভাবটা কোথায়? দীন, হীন ভাব! যাকে বলে,'নতজানু হয়ে ভিক্ষাপ্রার্থনা! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন বেড়াতে এসেছ। দুটো গল্প করে চলে যাবে। বড় দুঃখে আছি, বড় কষ্টে আছি, পরিবার-পরিজন না খেতে পেয়ে মরে যেতে বসেছে স্যার, দয়া করুন কৃপা করুন—সেই ভাবটা তো তোমার নেই! ভয় না থাকলে চাকর হওয়া যায়?

—আমি তাহলে আসি।

—কেন? চাকরি চাই না?

—না পেলেও কিছু এসে যাবে না। আমি খেতেও পারি, আবার উপোসও করতে পারি। বেঁচে থাকার কৌতূহল আছে, মরে যেতেও ভয় পাই না।

—নাটক করতে বুঝি?

—এখনো করি। রোজই করি। প্রতিমুহূর্তে করি।

—এই মুহূর্তে তোমার পকেটে কত টাকা আছে?

—পাঁচ টাকা।

—আমার সামনে রাখো। হ্যাঁ, এইবার যাও।

দরজা পর্যন্ত যেতেই ডাকলেন,—শোনো। কী ভাবে যাবে?

—এখান থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে ট্রেনে।

—পকেট তো খালি!

—পা-দুটো তো আছে।

—হাঁটলে কতক্ষণ?

—পনের-কুড়ি মাইল, যতক্ষণ লাগে। পাঁচ-ছ'ঘণ্টা লাগবে।

—এই সময়টার কোনো দাম নেই?

—আছে, মাত্র তিন টাকা।

—আমার সময়ের দাম জানো?

—অনেক। এক মিনিট হাজার টাকা। হয়তো তারও বেশি। আমি তিন টাকায় পাঁচ ঘণ্টা কিনব, আপনি কিনবেন পাঁচ লাখ টাকায়। ইচ্ছে করে এই দাম আপনি বাড়িয়েছেন, এখন নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছেন। যেটুকু যাচ্ছে সেটুকু অনেক নিয়ে যাচ্ছে। আপনার ক্ষতির আশঙ্কা অনেক বেশি। কিন্তু ব্যাগ, যেটাকে আপনারা ওয়ালেট বলেন, সেটার দাম একই রইল।

—তার মানে?

—আপনিও একটা ব্যাগ, আমিও একটা ব্যাগ। দুটোতেই সময় ভরা। আপনারটা ডলার, আমার টাকা। একদিন সব খরচ হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে দুটো দেহ। এটাও ছাই, ওটাও ছাই। শেষটা অনেক আগে দেখতে পাওয়ার নামই দর্শন।

কর্নেল একটু হতভম্ব হলেন। মুখের ওপর এমন কথা কেউ কী তাঁকে বলেছে কোনো দিন!

কখন কোন কথা যে মুখে আসে! ফস্ করে বলে ফেলার পর লজ্জা পাই। কে যেন পেছন থেকে ঠেলে দেয়। আমি বলি না। আমাকে বলায়। কে

তিনি?

কর্নেল সায়েব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বয়েসের তুলনায় ভারি কথা। এইবার আমার লজ্জা করছে। আমি পালাতে চাইছিলুম। দরজার দিকে এগোচ্ছি, কর্নেল সায়েব গম্ভীর গলা বেশ কিছুটা নরম করে বললেন, 'যাচ্ছ কোথায়? বোসো!'

এইবার আমি খুব জড়সড় হয়ে বসলুম।

কর্নেল বললেন, 'তুমি যখন কিছু বল, তখন বুঝতে পার কী বলছ?'

—আজ্ঞে না।

—তখন তোমার কী হয়?

—মাথাটা কেমন হয়ে যায়। মুখটা আলগা হয়ে যায়। ভাবনা চিন্তা সব শুকিয়ে যায়। আমি অন্যরকম হয়ে যাই।

—এই অবস্থাটাকে কী বলে জান, পসেসড! তোমাকে কেউ অধিকার করেন। এইরকম কতদিন হচ্ছে?

—বেশ কিছু দিন।

—তোমার অতীতটা জানতে ইচ্ছে করছে। একদিন আসতে পারবে আমার বাড়িতে?

—তা পারব, তবে আপনি তো ভীষণ বড়লোক, আমার অস্বস্তি হবে।

—আমার চেয়ে হাজারগুণ বড়লোক আছে। তুমি একবার এসেই দেখ না!

—বলুন, কবে আসব?

—এই রবিবার। সকাল দশটায়। এই নাও আমার কার্ড।

কার্ডটা হাতে নিয়ে আবার রাস্তায়। টাকাটা ফেরত পেয়ে গেছি। বিদিগিচ্ছিরি খিদে পেয়ে গেছে। রান্না করতে আমার একেবারেই ইচ্ছে করে না। অথচ রান্না করতেই হয়। একবার মনে হল বাইরে কিছু খেয়ে নিই। পরক্ষণেই মনে হল, পাঁচ টাকা সম্বল। বাড়িতে চাল, ডাল, গোটা দুই আলু আছে। কোনো রকম ফোটাতে পারলে রাতটা হয়ে যাবে। আমার গুরু বলতেন, না খেলে কিছুই হয় না, বরং খেলেই শরীর খারাপ। না খেয়ে কটা লোক মরে? বরং গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েই বেশী মরে। আমার গুরু বলতেন, খুব লাউ খাবি। লাউ হল সন্ন্যাসীদের খাদ্য। পেটে থাকে অনেকক্ষণ। শরীর শীতল হয়। কামনা-বাসনা মরে। ওই দুটোকে মারতে

পারলেই তুমি রাজা। যত বন্ধন তো, ওই দোনো চিজকে লিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসভাঙা ভিড়ে তলিয়ে গেলুম। সবাই ছুটছে বাড়ির দিকে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। এই মানুষগুলোকে দেখতে আমার খুব মজা লাগে। ঘামতে ঘামতে, কত রকমের কথা বলতে বলতে দৌড়চ্ছে। কেউ আবার বাজার করেছেন। একজন আর একজনকে কী সব বোঝাচ্ছেন। ট্রেনের ঠাসাঠাসি ভিড়ে সবাই কথা বলছেন। কেউ খুব উত্তেজিত। এরই মধ্যে একজন গুনগুন করে গান গাইছেন। চাকায় উড়ে চলেছে ভগবানের জগৎ।

আমার ডানপাশে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। মধ্যবয়সী। দেখতে খুব সুপুরুষ। থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'শরীর খারাপ লাগছে আপনার?'

ভদ্রলোক ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'আমার খুব অসুখ।'

—কি হয়েছে?'

—গলায় ক্যানসার।

—কে বললে?

—টেস্ট-ফেস্ট সব হয়ে গেছে।

—কি চিকিৎসা করাচ্ছেন?

—কিচ্ছু না, কোনো চিকিৎসাই নেই তো করাব কী?

—এই ভাবে এই ভিড়ে বেরিয়েছেন কেন?

—উপায় নেই, যতদিন পারা যায় সংসারটাকে টেনে যাই। এরপর তো সব উপোসে মরবে। ভদ্রলোকের গলাটা ধরে ধরে এসেছে। কামরা-ভর্তি লোক। আপাতত সবাই বাড়ি যাচ্ছেন, কেউ কেউ কিন্তু অন্য একটা গাড়ি চড়ে আরো অনেক দূর চলেছেন। দুটো যাত্রা একই সঙ্গে চলেছে। গাড়িও ছুটছে, কালও ছুটছে।

হঠাৎ মনে হল, এমন একটা মানুষকে বাঁচানো যায় না? এ যেন বাঘে ধরেছে। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে! এমন কোনো বন্দুক নেই যা দিয়ে সেই বাঘটাকে মারা যায়? এই মানুষটির জন্যে আমি একটা কিছু করতে চাই। ওঁর বদলে আমি মরতে চাই। একজনের টাকা, জাম, সম্পত্তি অন্যের নামে বদল করা যায়. অসুখটা যায় না? অনেক মহাপুরুষ পারতেন। রোগটা তুলে নিতেন। আমি শুনেছি।

ভদ্রলোক ঝিম মেরে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—আপনার জন্যে কী করতে পারি? আপনার এই কষ্ট কমাবার জন্যে আমি কী করতে পারি?

ওই ভিড়ের মধ্যেই আমার একটা হাত চেপে ধরে ভদ্রলোক বললেন, 'এমন কথা আজকাল কেউ বলে না। এমন কী আমার আত্মীয়-স্বজনরাও বলে না। আমার একটাই উদ্বেগ, মৃত্যুর পর আমার পরিবারের কী হবে? এই হৃদয়হীন পৃথিবীতে তারা কী ভাবে বাঁচবে? আমার তো সঞ্চয় কিছুই নেই!'

—আপনি মারা যাবেন এমন কথা ভাবছেন কেন?

—এ রোগে কেউ বাঁচে না, আজ আর কাল।

—আপনার পরিবারে কে কে আছেন?

—আমার বউ, আর আমার একটা সুন্দর মেয়ে। সবে কলেজে ঢুকেছে।

—আপনি কী করেন?

—একটা ফার্মে চাকরি করি। মাঝারি গোছের চাকরি। যা পাই, সংসারটা চলে যায়। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। আমার বউ খুব ভাল রাঁধে, আমার বউ খুব ভাল গান গায়। মেয়েটা রবীন্দ্রসংগীত শিখছে। বেশ গায়।

ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানা বললেন। আমার স্টেশনে এসে গেল। গুঁতোগুঁতি করে নামলুম। এমন একজন মানুষ দেখলুম, যাঁর ভেতরে ঘড়ির কাঁটার মতো মৃত্যু চলেছে টিক টিক শব্দে। আজ হোক কাল হোক মরব জেনে, পৃথিবীতে কয়েকদিন বেঁচে থাকতে কেমন লাগবে, সেইটাই অনুমান করার চেষ্টা করলুম। গঙ্গার ধারে দাঁড়াতেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চোখে পড়ল। নির্জন গঙ্গা চাঁদের আলোয় ভাসছে। একটু দূরেই হিন্দুস্থানীর দোকান। রুটি তৈরি হচ্ছে গরম গরম। কম রেস্তর খদ্দেরদের জন্যে। সেইখানেই বসে গেলুম। আজ রাতে আর রান্নার মেজাজ নেই, কিন্তু খিদে আছে। মন বসে আছে মাথায়, খিদে বসে আছে পেটে। দূরত্ব অনেকটা, একতলা, তিনতলা, কিন্তু যোগাযোগ আছে। এটা জৈব তো ওটা দৈব।

গাবদা দুখানা রুটি, খানিকটা সবজি। উদোম ঝাল। টনক নড়ে যায়। খাচ্ছি আর মনকে খাওয়াচ্ছি। একটা আশ্বিন বাতাস বয়ে আসছে গঙ্গার

বুক থেকে। মা-দুর্গার চিঠির মতো। হঠাৎ মনে হল রুটিটা কে চিবোচ্ছে, আমি না মৃত্যু? আমিটা কে? আমিই তো মৃত্যু। আমার আমিটাই তো মৃত্যু। পাখি বসে আছে ডালে। গাইছে, শিস দিচ্ছে, ফল ঠোকরাচ্ছে। হঠাৎ উড়ে যাবে। পড়ে রইল ত্রিভঙ্গ ডাল। মৃত্যু পাখিটাই তো! ঘরের মধ্যে সে ছিল। ডেকেছি, সাড়া দিয়েছে, দোর খুলেছে। একদিন সাড়া নেই, বৃথাই ডাকাডাকি। কী হল? বললে, 'বাবু নেই, কাল চলে গেছে।'

'খাও মৃত্যু রুটি খাও। যতদিন পার বেঁচে থাক।'

মাথার মধ্যে কোথায় একটা ঝিম্ করে শব্দ হল। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণ। সেই বিশ্বরূপের মূর্তি। কৃষ্ণকালো গাত্রবর্ণ। মুখগহ্বরে ফরফরে আগুন। অনন্ত, অনল, অনির্বাণ শ্মশানচিতা। পতঙ্গের মতো জীব অগ্নিমোহে ঝাঁপ দিচ্ছে সেই আগুনে। ভগবানের কণ্ঠস্বর বাতাসে।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

আমি মহাকাল। আগুনের ফরফর শব্দ আমার উল্লাসের অট্টহাসি। আমি ভীষণ। আমি সংহারিণী। মারো অথবা নাই মরো, আমার অগ্নিবলয়ে তোমাদের ভোজন, ভজন, বিভাজন।

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।

আমার গুরুর মৃত্যু মনে পড়ে গেল। ঠিক তিন দিন আগে তিনি বললেন, 'আসন পেতে দাও।' আমরা আসন পেতে দিলুম। বললেন, 'আসনে ফুল বিছিয়ে দাও, তিনি এসে গেছেন।'

গুরুজী দেখতে পেয়েছিলেন, আমাদের সে-দৃষ্টি ছিল না। বললেন, 'গান শোনাও।'

গুরুজী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে লাগলেন, 'সাধু মরণে হুঁশিয়ার। মরবার সময় যা ভাববে তাই হবে। ভরতরাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করার জন্যে সাধন চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।'

সেই শূন্য আসনে কে ছিলেন জানি না। গুরুজী তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র-আলোচনা করছেন। দুয়ার বন্ধ, আমরা বাইরে থেকে শুনছি। হাসি-ঠাট্টা

হচ্ছে। গান-গল্প হচ্ছে। হঠাৎ শুনলুম, 'সময় হয়েছে। চলুন এইবার ওঠা যাক।'

পড়ে রইল সব। সেই শূন্যতা কী অসীম!

সকাল হলেই মনটা খারাপ লাগে। মেঘলা হলে তো কথাই নেই। দিন চলে যাবে, কাজের কাজ তো কিছুই হবে না। আমার করার মতো কোনো কাজই নেই। আলসেমি করেই দিন কেটে যাবে। মনে মনে ভাবব, গোলামী করতে হচ্ছে না, এই তো আমি মুক্তপুরুষ! পাঁচ টাকা হলেই আমার দিন চলে যায়। এই তো আমি কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী প্রকৃত এক বৈরাগী। আমার ঠাকুর বলছেন ঃ

> 'শরীর, টাকা—এসব অনিত্য। এর জন্য—এত কেন? দেখ না হঠযোগীদের দশা! শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর। ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই। নেতি, ধৌতি—কেবল পেট সাফ করছেন। নল দিয়ে দুধ গ্রহণ করছেন।'

ঠিকই তো, আজ আছে, কাল থাকবে না। সে কী শরীর, কী টাকা! যা অনিত্য তার পেছনে ছুটি কেন? ঠাকুর বলছেন, শোনো হে ছোকরা—

> 'টাকায় খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধু-ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরিব পড়লে তার উপকার হয়। এইসব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়। দেহের সুখের জন্যে টাকা নয়। লোকমান্যের জন্যে টাকা নয়।'

সমস্ত কথা বুকে সেঁটে বসে যাওয়ার মতো। চাকরির চেষ্টা করছি টাকার জন্যে। টাকা জমলে বাড়িটা মেরামত করে আগাপাশতলা রঙ করাবো। খাট-বিছানা-বালিশ কিনব। একটা সাইকেল কিনব। কয়েকপ্রস্থ ভাল জামা-কাপড়। একজোড়া জুতো।

বলে যাও, বলে যাও—থামলে কেন—?

একটা হারমোনিয়াম কিনব নাম-সংকীর্তনের জন্যে। স্টিলের বাসন কিনব, লোহার আলমারি। কিছু ফার্নিচার তো কিনতেই হবে। চেয়ার-

টেবিল-আলনা। একটা আয়না—সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখব, চুল ফেরাব।

না, টাকার ব্যবহার এসব নয়। টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। টাকাতে মানুষ আবর্জনা খরিদ করে। গুচ্ছের অপচয়। নিঃস্ব, নিঃসম্বল হওয়াই ভাল, ভগবানের কাছাকাছি যেতে পারব। এমন কথাই বা বলি কী করে! ঠাকুর যে একথাও বলছেন—দুখচেটে, তেলচিটে সংসারী হবে না, হবে না হত-দরিদ্দির। টাকা তো চাই, ঠাকুরের সেবা, সাধু-ভক্তের সেবা, সম্মুখে কেউ গরিব পড়লে তার উপকার হয়। তিরস্কার করছেন অচলানন্দকে—

"অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বলত, 'ছেলে ঈশ্বর দেখবেন—এ সব ঈশ্বরেচ্ছা!' আমি শুনে চুপ করে থাকতুম। বলি ছেলেদের দেখে কে? ছেলেপুলে, পরিবার ত্যাগ করেছি বলে টাকা রোজগারের একটা ছুতা না করা হয়। লোকে ভাববে ইনি সব ত্যাগ করেছেন, আর অনেক টাকা এসে পড়বে।"

তাহলে আমি করিটা কী? না ভোগে, না যোগে কোথায় আছি আমি? এ আমাকে কোন কলে ফেললে ঠাকুর? দরকচা করে রেখে দিলে! সকালে এই আমার চিন্তা। সুস্থ, স্বাভাবিক সংসারী মানুষের দল ব্যাগ হাতে বাজারে যাচ্ছে, ক্যান হাতে দুধ আনতে যেতে যেতে পানবিড়ির দোকানে সিগারেট কিনে দড়িতে ধরাচ্ছে, খুচরো গুনে পকেটে পুরছে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে বকবক করতে করতে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে এক মহিলা স্টেশনের দিকে ছুটছেন হাতব্যাগে রুমাল ঢোকাতে ঢোকাতে, কলকাতার টেলিফোন অফিসে চাকরি করতে। ভারিক্কি কর্তা ছড়ি হাতে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। নতুন গাড়ি চেপে নামী ডাক্তার চলেছেন রুগী দেখতে।

ব্যস্ত কাজের লোকের এই পৃথিবীতে আমি এক অকাজের লোক। বসে আছি একপাশে কাজ না-পাওয়া রাজমিস্ত্রির মতো। এ-পকেট, সে-পকেট ঝেড়ে খুচরা কয়েক টাকা বেরোবে হয়ত। পাঁচশো চাল, একতাড়া নটে শাক, গোটাকতক আলু। কেরোসিন কোথায়, স্টোভ ধরানো যাবে না। কয়লার উনান ধরাতে জানি না। ঘরে ঘরে ধুলো, আবর্জনা, ঝুল। বিদঘুটে একটা অবস্থা। ছাতে চারখানা থানইট সাজানো আছে। এপাশে দুটো, ওপাশে দুটো। মাঝে এক হাত ব্যবধান।

স্বামীজী বলতেন, হতাশা থেকে বাঁচার শ্রেষ্ঠ উপায় ধ্যান, জপ,

শাস্ত্রপাঠ নয়—ব্যায়াম। ঝপাঝপ ডন মারো একশ, বৈঠক দু'শ। ঘাম ঝরাও। ঘাম অশ্রুর চেয়ে ভাল।

একটা কঠিন সত্য তুমি হৃদয়ঙ্গম করো বৎস। পৃথিবীতে অর্থই সার বস্তু। জীবনের সারাৎসার। অর্থ ছাড়া সবই অনর্থ। সংসার অথবা সন্ন্যাস। সংসার মানেই অর্থ। সংসারে সন্ন্যাসীর মতো থাকা যায় না, লোকে ক্লীব বলবে। তোমার মন বুঝবে না, বলবে অপদার্থ অলস। বলবে ভণ্ড শয়তান। খুব সাবধান! তোমার অতীতটা কিছুই নয়। যা চলে গেছে অতীতে, তা গেছে বিস্মৃতিতে। মহাপুরুষসঙ্গ, অলৌকিক দর্শন কিছুই কিছু নয়। দেখতে হবে লোহা সোনা হল কী না? তোমার পরিবর্তন কতটা হল? বুজরুক হলে তোমাকে কেউ পুঁছবে না। তখন তুমি না ঘরকা না ঘাটকা।

তুমি ধার্মিক দেখেছ, তুমি সাধক দেখছ, সাধনা দেখছ—নিজে কী সেইভাবে সাধনা করেছ? নিজেকে ভাঁওতা মেরো না, সত্য কথা বল। মানুষের স্বভাবই হল, সে সাহস করে সত্য কথা বলতে পারে না। ভয় পায়। নিজেকেও মিথ্যে কথা বলে। অন্যের তারিফ পাবার জন্যে সে যা নয় তাই বলে প্রমাণ করতে চায়। পরিপূর্ণ লোভী, বলবে নির্লোভ। প্রচণ্ড ভীরু, বলবে ভয়ঙ্কর সাহসী। এই হল বারফট্টাই। যখন বালক ছিলে তখন তোমার অনেক প্রবৃত্তিই নিদ্রিত ছিল, যেই তুমি যৌবনপ্রাপ্ত হলে, অমনি তোমার সব প্রবৃত্তি জেগে উঠল। বাচ্চা বাঘ বেড়ালের মতো দুধ খেতে পারে, ধেড়ে বাঘ আর দুধ খাবে না, তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে শিকারের পেছনে ছুটবে রক্তমাংসের লোভে। বালকের মধ্যে পবিত্রতা থাকলেও থাকতে পারে, সাবালক অবশ্যই ইন্দ্রিয়ের দাস।

স্বামীজীর এই জায়গাটা পড়ে দেখ না। তোমার জন্যেই তো লিখে গেছেন—পড়ো ঃ

> "আমাদের মনের একটি প্রবৃত্তি বলে, 'এই কাজ কর'; আর একটি বলে—'করিও না'। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে; আর

তাহার পশ্চাতে যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটি স্বর বলিতেছে—'বাহিরে যাইও না।' এই দুইটি ব্যাপার দুইটি সুন্দর সংস্কৃত শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম আরম্ভ হয় এই 'করিও না' হইতে, অধ্যাত্মিকতাও ঐ 'করিও না' হইতেই আরম্ভ হয়। যেখানে এই 'করিও না' নাই, সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয় নাই, বুঝিতে হইব।"

আমার গুরু, তোমার ঠাকুর কী বলছেন শোন, 'ঈশ্বর সৎ, আর সব অসৎ—এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে যেমন দেহসুখ, লোকমান্য টাকা—এই সব ভালবাসলে ঈশ্বর যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে, শোন একটা গান শোন ঃ

আয় মন, বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, চারিফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥

তা, তোমার মধ্যে কী সেই বিবেকের নড়াচড়া টের পাচ্ছ না? জীবনে দুঃখ তো কম পাওনি! অর্ধাহারে, অনাহারে বহু দিন কেটেছে। তোমার সহ্যশক্তি বেড়েছে, তোমার আকাঙ্ক্ষা কমেছে, তোমার ধৈর্য বেড়েছে, তোমার অহংকার খাটো হয়েছে—তাহলে তোমার আর ভয় কিসের? তোমার দেহবাসনা এখনো আছে; কারণ কাম জয় হওয়া কঠিন। আমার গুরু পরমহংসদেব বলছেন ঃ

'অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ-কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে, তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে—কাম ক্রোধ বশ করতে কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ, হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না, কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।'

শোনো বৎস, আরো কী অপূর্ব কথা তিনি বলেছেন, 'যিনি আচার্য

তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করার জন্য ঢাল-তরোয়াল চাই, আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়।'

সেই নরুণ হল তোমার বিচার। পরমহংসদেব বলছেন, 'আমি কে, এইটি খুঁজতে গেলেই তাঁকে পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা, না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে, আমি এ-সব কিছুই নয় নেতি, নেতি। আত্মা ধরবার ছোঁয়ার জো নাই। তিনি নির্গুণ নিরুপাধি।'

তবে বাবা, বিচারের পথ খুব শক্ত পথ। ও-পথে দু-একজনই এগোতে পারেন। মনে রেখো, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর নয়—এ হল কলি।

পরমহংসদেব তাই সাবধান করছেন। বিজয়কৃষ্ণ যখন প্রশ্ন করলেন, 'যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?' পরমহংসদেব বললেন, 'হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তভূমির কথা বলেছি। সপ্তভূমিতে মন পৌঁছলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগতপ্রাণ। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। আমি দেহের নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত—আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কই? এসব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার কর, কোনখান থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দাও, মনে করলে মূলসুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পরদিন সকালে দেখ, গাছের একটি ফেঁকড়ি দেখা দিয়েছে। দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।'

বসে বসে ভাবলে কী হবে? এগিয়ে যাও, তোমার পথ ধরে তুমি এগোও। তোমাকে আমি কতবার বলেছি—জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আনন্দ ও শক্তি—দুঃখ ও দুর্বলতা নয়। তোমাকে আমি বারে বারে বলতে চাই, ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভেতর যে ব্রহ্মত্ব—প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। তুমি আমার ওই জায়গাটা পড়ো, আবার পড়ো, বারে বারে পড়ো। দেখ না, সকলের মধ্যে এইভাবে থাকতে থাকতেই তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে কী না!

'যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ

নহেন—তত্ত্বমাত্র। তুমি আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে তিনি তত মহৎ। শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে।'

আমি সব শুনেছি। আপনারা যা বলছেন সবই খুব সুন্দর কথা, মহৎ কথা। আমার খুব লোভও হচ্ছে। সেই অনন্তের স্বাদ আমি পেতে চাই। আমার এই মিলন জীবন অমলিন হবে। কিন্তু প্রত্যহের জীবন আমাকে গ্রাস করে ফেলে। আমার ভয় আসে—অনাহারের ভয়, অসম্মানের ভয়, মৃত্যুভয়। সকলেরই সব আছে, আমার কেন কিছু নেই। আমি অল্প বয়সেই কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সবাই আমাকে ঘৃণা করে, উপেক্ষা করে। এড়িয়ে যায়, করুণার চোখ দেখে।

তোমার ওই নেকামিটা ছাড়। ওসব প্যানপ্যানানির যুগ চলে গেছে। তোমার ওই অভিমানের দাম কেউ দেবে না। পৃথিবীটা এখন এইরকম—তুমি তোমার, আমি আমার। বসে বসে কাঁদলে কিছু হবে না বাবা। তেড়েফুঁড়ে ওঠ। আমি কি চাই জান? 'আমি চাই এমন লোক—যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর উহার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।'

আমি তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো, 'একজন জ্বলন্ত ক্যারেকটার-এর কাছে ছেলেবেলা হইতে থাকা চাই। জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ—পড়িলে কিছুই হইবে না। সম্পূর্ণ নিখুঁত ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করাইতে হইবে প্রত্যেক ছেলেটিকে, তবে তো শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসিবে।'

আমার ছেলেবেলা তো সেইভাবেই কেটেছে স্বামীজী। জ্বলন্ত চরিত্রের সঙ্গেই থেকেছি। তাহলে আমার কেন এই অবস্থা?

কারণ একটাই তোমার চিন্তা—দুর্বল। নিজেকে যখনই তুমি ভাবলে দুর্বল, অসহায়, তখনই তুমি তাই হয়ে যাবে। শক্তির চিন্তা করলে শক্তিমান হবে। আলোর চিন্তা করলে জ্যোতিমান হবে। আকাশের চিন্তা করলে উদার হবে। 'আমার গুরুদেব বলতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বল হবে।'

এতক্ষণ আমার দোতলার ঘরটা যেন ভরে গিয়েছিল। তাঁরা

এসেছিলেন, যাঁদের কথা আমি অহোরাত্র চিন্তা করি। দুঃখে-সুখে অসুখে-অনিদ্রায় স্মরণমাত্রই তাঁরা আসেন। আমাকে ঘিরে বসেন। আমাকে মেরামতের চেষ্টা করেন। আমি কে, আমি কেমন—এ বিচার তাঁরা করেন না। আমি আর্ত, তাপিত আমি, তাঁদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। তাঁরা কখনো বিচারকের আসনে বসে বিচার করেন না। তাঁরা শুধুই দিতে চান, অকৃপণ দান। আমি সেই দানের মূল্য দিই আর নাই দিই তাঁদের কোনো অভিমান নেই। নিজেকে বদলাতে পারি ভালো, আমারই ভালো, না পারলে তাঁরা তিরস্কার করবেন না, দুঃখ পাবেন মাত্র। তোমার হল না বলে অশ্রুবিসর্জন করবেন। তুমি সোনা হতে পারলে না, সেয়ানা হয়েই রইলে। শের নয় শেয়ালই থেকে গেলে।

চমৎকার কথাটা দেয়ালে লিখে রেখেছি। বেশ মজার কথা ঃ

The tools of the mind can be wrongly used

but the mind possesses no wrong tools.

মনের যন্ত্রপাতিকে আমি যা-তা ভাবে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু মনের নিজস্ব কোনো বাজে যন্ত্র নেই।

নিচের তলায় বিশাল একটা শব্দ হল। চমকে উঠেছি। কেউ মনে হয় পড়ে গেল।

শব্দটা বেশ জোরেই হল। ভাড়াটেদের এলাকায়। ওদের ব্যাপার ওরাই বুঝবে। আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আবার বেশ জাঁকিয়ে বসা যাক ধ্যানে। আমার গুরু বলেছিলেন, লীলা-ধ্যান করবে। সেটা কী ব্যাপার? অনেকটা এইরকম, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর। সময় সন্ধ্যা। ধুনো আর চন্দনের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। ঠাকুর পশ্চিমের বারান্দায় পায়চারি করছেন। হাততালির সঙ্গে গুনগুন করে গান গাইছেন,

শমন আসবার পথ ঘুচেছে, আমার মনের সন্দ ঘুচে গেছে।
(ওরে) আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে॥
এ খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে॥

এমন সময় পূবদিকের দরজা দিয়ে নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র মশাই ঢুকছেন। ঠাকুর উঁকি মেরে বলছেন, বাঃ, তোমরা এসে গেছ, নরেন এসেছিস, নরেন? বোসো, তোমরা বোসো।

ঠাকুর ভাবে টলতে টলতে ঘরে ঢুকছেন। এইবার গাইছেন ঃ

শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না।

মনে হচ্ছে, ঠাকুর সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। বাঁ হাত ধীরে ধীরে বুকের দিকে উঠছে, ডান হাত উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। দৃষ্টি ভূমির দিকে অবনত। মুখ উদ্ভাসিত। সারাঅঙ্গে জ্যোতি। নরেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। সমাধি সম্পর্কে তাঁর ভয়ঙ্কর কৌতূহল। কী ব্যাপার? কেন এমন হয়? মন কোথায় চলে যায়। এই মুহূর্তে তিনি কী মৃত? এই অভিজ্ঞতাটা তাঁর হওয়া চাই? বিদেশী দর্শন অনেক পড়েছেন। ভারতীয় দর্শনেও প্রভূত জ্ঞান। তবু এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, মনের এই আরোহণ, অবরোহণের। ঠাকুর পাছে পড়ে যান, তাই রামদত্ত মশাই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মহেন্দ্রনাথও প্রস্তুত। কিছুক্ষণ ওইভাবে থাকার পর ঠাকুর আবার পরিবেশে ফিরে এলেন। মৃদুস্বরে বলছেন, আমি জল খাবো। ঠাকুর ধীরে ধীরে তাঁর খাটের ধারে বসছেন। বসেই বলছেন, রাম, আমার জিলিপি!

দত্তমশাই জিলিপির ঠোঙাটি তাঁর পাশে সসম্ভ্রমে রাখলেন। ঠাকুর তাকাচ্ছেন। একটা জিলিপি বাঁ হাত দিয়ে চূর্ণ করে ফেলে দিলেন। গ্রহণ করলেন না। উঠে গিয়ে হাত ধুলেন। মহেন্দ্রনাথ হাত মোছার জন্যে গামছা এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, খেলেন না?

ঠাকুর মৃদুস্বরে বললে, ওদের সাবধান করে দিও, দ্রব্যের অগ্রভাগ বের হয়ে গেলে, তা কোনোমতেই ঠাকুরের সেবায় ব্যবহার হয় না।

ঘরসুদ্ধ সব্রাই দত্তমশাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। মুখটি ম্লান, বিষণ্ণ।

দত্তমশাই তখন বলছেন, আজ একটা ব্যাপার ঘটেছিল।

মহেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার?

দত্তমশাই বললেন, শ্যামবাজারের পুলের কাছের ময়রার দোকান থেকে জিলিপি কিনে গাড়িতে উঠছি, এমন সময় কোথা থেকে ছ-সাত বছরের একটা মুসলমান ছেলে এসে বায়না ধরলে, বাবু, আমাকে একটা জিলিপি দাও। আমি কিছুতেই দোবো না, ছেলেটাও ছাড়বে না। গাড়ি চলছে, সেও পেছন পেছন ছুটছে, বাবু একটা জিলিপি!.হঠাৎ আমার মনে হল, হয়ত ভগবানই ছলনা করে আমাকে পরীক্ষা করছেন। সেই গল্পটাও মনে পড়ল, একদা কোনো সাধু রুটি তৈরি করে ঘি আনতে গেছেন, ফিরে এসে দেখছেন, একটা কুকুর রুটিগুলো মুখে করে পালাচ্ছে। সাধু তখন সেই পলাতক কুকুরটার পেছন পেছন দৌড়চ্ছেন আর বলছেন, রাম অপেক্ষা কর, রুটিগুলোয় ঘি মাখিয়ে দিই! আমি তখন ইতস্তত ভেবে একখানা জিলিপি তাকে ফেলে দিলুম।

ঠাকুর এইসময় উঠে চিকে ঢাকা উত্তরের বারান্দায় চলে গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন প্রশ্ন করলেন, উনি কী করে জানলেন?

দত্তমশাই বললেন, আমি নিঃসন্দেহ, শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের অবতার। কারণ এর আগে আরো একটা ঘটনায় আমি সেই প্রমাণ পেয়েছি। ঠাকুরের এক ভক্তের পালিতা কন্যার কয়েকবার ভেদবমি হয়, সেই ভক্ত তখন নিরুপায় হয়ে রামকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, সামনেই ঠাকুর উপস্থিত। স্মরণ মাত্রই তিনি চলে এসেছেন আর্ত ভক্তের ডাকে!

নরেন্দ্রনাথ বলছেন, অবতার-টবতার কিনা জানি না, তবে অদ্ভুত এক মানুষ। চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি। ছুটে না এসে পারা যায় না। কেবলই জানতে ইচ্ছে করে, সমাধিটা কী?

উত্তরের বারান্দা থেকে ঠাকুর আবার ঘরে প্রবেশ করছেন। মুখে হাসি। বলছেন, তোমরা কি আলোচনা করছ গো? শাস্ত্র? করো করো, আমি একটু শুনি।

মহেন্দ্রনাথ বলছেন, নরেন্দ্র জানতে চাইছে সমাধি কাকে বলে?

—তোমরা কি বলছ?

—বলিনি, তবে বলব ভাবছি—চিত্তবৃত্তীনাং সুতরাং নিরোধঃ। চিত্তবৃত্তির নিরোধই সমাধি। আত্মস্বরূপের প্রকাশই সমাধি। দ্রষ্টা আর দৃশ্যরূপের অভেদই সমাধি। একমাত্র নিত্যসিদ্ধরাই সেই অবস্থায় উঠতে

পারেন। আত্মকৃপা, গুরুকৃপা, শাস্ত্রকৃপা এই ত্রিবিধ কৃপা ব্যতীত সত্যলাভ অসম্ভব। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম। যোগাবস্থায় দেশ অথবা কালের কোনো বোধ থাকে না। এই অবস্থা বাক্য ও মনের অতীত।

নরেন্দ্রনাথ সামান্য রাগের গলায় বলছেন—মশাই! সেই অবস্থায় যাব কেমন করে?

—শ্রুতি কি বলছেন, তুমি তো জান নরেন্দ্রনাথ—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূম স্বাম্। আত্মা যাকে বরণ করেন—স্বীকার করেন, তার কাছেই তিনি নিজের স্বরূপটি প্রকাশ করে থাকেন। দেবীসূক্তেও বলা আছে—আমি যাকে যাকে ইচ্ছা করি, তাকে তাকেই সকলের চেয়ে উন্নত করি। ব্রহ্মাণ্ডে উপনীত করি, ঋষিত্বে উপনীত করি, সুমেধা করি।

ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসছেন। হাসতে হাসতে আবার গাইছেন—

কে জানে কালী কোন ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম অন্যে কেবা জানে তেমন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,
কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ,
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।

গান শেষ। সবাই স্তব্ধ। ঘোর লেগেছে। শাস্ত্র পালিয়ে গেছেন। ঠাকুর কথা বলছেন, ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা। প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার। জ্ঞান বিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কঠিন।

মহেন্দ্রনাথ বললেন, আমার অধ্যাপক বন্ধু কালীকৃষ্ণকে সেদিন প্রথম এখানে নিয়ে আসি আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

বলেছিলুম, শুঁড়ির দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জালা মদ আছে। বাড়ির নিচের গোলমালটা খুব বেড়েছে এইবার।

মনে হচ্ছে, অনেক লোক ঢুকে পড়েছে। এইবার দেখতেই হচ্ছে, ব্যাপারটা কী হল!

পোড়ো বাড়ির সিঁড়ি, হুড়মুড় করে নামবো বলেই তো নামা যায় না। একটা ধাপ ভাঙা তো একটা ধাপ ভাল। দেয়ালে হাত রাখলেই ঝুর ঝুর। কিন্তু বাড়িটার বেশ একটা চরিত্র আছে। কেউ না থাকলেও মনে হয় ঘরে ঘরে অতীতের সব চরিত্ররা বসে আছেন। তাঁদের কারোকেই আমি দেখিনি, আমার মহা আবির্ভাবের আগেই তাঁরা চলে গেছেন; কিন্তু এই পরিবারের দুশো বছরের ইতিহাস তো জনশূন্য হতে পারে না।

নিচের উঠোনে একদল পাড়ার ছেলে ভিড় করে আছ। দেখেই গা জ্বলে গেল। যত ভাবি খারাপ কিছু ভাবব না, ততই সব বিশ্রী ভাবনা মাথায় ঢুকে পড়ে। এই হল পরিবেশের দোষ। এই সবকটা ছেলে রুমকির জন্যে ছোঁক ছোঁক করছে। হিন্দি ছবির নায়কের মতো ওই যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটা মহা শয়তান। সাট্টার বুকি। এমন কোনো পাপ কাজ নেই, যা ও করে নি। ক্রমশই, বাড়ছে। বাকি সবাই ওরই চেলাচামুণ্ডা। ওরই পয়সায় ফুর্তি করে, মদ খায় আর গুরুর পাপ কাজে মদত দেয়।

অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনে যতটুকু অনুমান করতে পারলুম, রুমকির বাবার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স এল বলে। একবার মনে হল, রুমকির পাশে গিয়ে দাঁড়াই। অনেক অসুস্থ মানুষের সেবা আমি করেছি। পরমুহূর্তেই মনে হল, এই ছেলেগুলো আমাকে পাড়ায় টেঁকতে দেবে না। ওই সাট্টাঅলা আমাকে রোজই একবার করে বলে, বাড়িটা আমাকে বেচে দাও। আমি ফ্ল্যাট তৈরি করি। তোমাকে আমি সাত লাখ দোবো। তিন লাখ হোয়াইট, চার লাখ ব্ল্যাক। আর একটা ফ্ল্যাট ফ্রি। আমি রোজই বলি, ভেবে দেখছি। এইবার ও যদি কোনো ভাবে একবার রটাতে পারে, রুমকির সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে, তাহলে আমি শুধু বাড়িঅলা নই, লম্পট বাড়িঅলা, তারপর একদিন ধোলাই। ও বেশ ভালই জানে, আমি বদনামকে ভয় পাই। আমাকে পাড়া ছেড়ে পালাতে হবে।

তখন ও যে কোনো দামে আমার বাড়িটাকে হাতাবে।

এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে সরে পড়াই ভাল। অন্ধকার ছায়ার মতো ওদের পেছন দিয়ে সদর পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়। নারীঘটিত কেলেঙ্কারির অনেক ফ্যাচাং। হয়তো চেপে ধরবে পাড়ার মোড়লরা, বাড়িটা চুমকির মতো রুমকির কপালে ঝুলিয়ে দাও। তারপর সাট্টার বুকি রুমকির সঙ্গে ব্যবস্থা করে নেবে।

এই সব আমার ভাবা উচিত নয়। এই যে বলে, বিষয় বিষ। সেই বিষে জ্বলছি। মাঝে মাঝে যে লোভ আসে না, তাও তো নয়। সাতলাখ টাকা তো কম নয়। একটা ফ্ল্যাট ফ্রি। আমি একা মানুষ। আমি তো তখন রাজা। আমাকে আর পেটের চিন্তায় ঘুরতে হবে না।

একা রাত বাইরে কোথাও কাটানো, আমার কাছে কোনো সমস্যাই নয়। আগে মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়ে পাকুড় গাছের তলায় বাঁধানো বেদিতে শুয়ে পড়তুম। বটের তলায় শোওয়ার জায়গা নিয়ে খুব গুঁতোগুঁতি হত। পাকুড়ের তলায় ভয়ে কেউ আসত না। পাকুড়ের পাতায় পাতায় ভূত। প্রথম প্রথম আমারও ভয় করত। অনেক রকম শব্দ শুনতে পেতুম। মনে হত, ছুটে পালাই। জোর করে নিজেকে শুইয়ে রাখতুম। মনে মনে ভাবতুম, আমি মহাদেব। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়তুম। তখন হরেক রকম মজার মজার স্বপ্ন আসত। পাকুড় খুব স্বপ্ন দেয়। প্রায়ই যে স্বপ্নটা আসত সেটার আকর্ষণেই আমার রোজ ইচ্ছে করত ঘরের ফাটা মেঝে ছেড়ে পাকুড়ের তলায় গিয়ে শুয়ে থাকি। স্বপ্নটা এইরকম: বিরাট একটা মাঠ। জমিটা টকটকে লাল। সেইখানে সাধুদের ভাণ্ডারা হচ্ছে। অনেক অনেক সাধু। টকটকে লাল গেরুয়া, কমলা গেরুয়া। তাঁরা সব পাতা পেতে গরম গরম খিচুড়ি সেবা করছেন। হাসছেন, কথা বলছেন। ভাষা সংস্কৃত। আনন্দের হিল্লোল বইছে। ত্রিশূল হাতে এক ভৈরবী তত্ত্বাবধান করছেন। টকটকে মুখ, কপালে সিঁদুরের গোল টিপ। মাঠটাকে ঘিরে আছে বড় বড় গাছ। সব গাছেই থোকা থোকা সাদা ফুল। একপাশে হোম হচ্ছে বিশাল এক হোমকুণ্ডে। লকলকে আগুনের শিখার চারধার থেকে চারজন সন্ন্যাসী আহুতি দিচ্ছেন—স্বাহা, স্বাহা—মন্ত্রে। এই স্বপ্ন আমি যে রাতে দেখি—তার পরের দিনটা আমার ভীষণ ভাল যায়। ভাল মানে ভাল খাওয়া, হঠাৎ একগাদা টাকা পাওয়া নয়—অদ্ভুত একটা আনন্দে থাকা, আনন্দে ভরপুর

অবস্থা।

দেখলুম অ্যাম্বুলেন্স আসছে। রুমকিকে একবার দেখার ইচ্ছে করছিল খুব। মেয়েটা সত্যিই ভীষণ ভাল। এখন হলটা কি, মা বাতে পঙ্গু। এই দানবগুলোর সঙ্গে রুমকিকেই হাসপাতালে বা বড় কোনো নার্সিংহামে যেতে হবে। সাট্টার বুকি যখন এগিয়ে এসেছে, তখন সেরা জায়গাতেই নিয়ে যাবে। খরচপত্র সব নিজেই করবে। মানে রুমকিকে একেবারে অক্টোপাশে বেঁধে ফেলবে। রুমকির বাবা যদি মারা যান, তাহলে রুমকির মাকে দরজা করে গেড়ে বসবে। অজগর শিকারকে আচমকা জড়িয়ে ফেলে, তারপর চাপ দিতে থাকে। রক্তবাহী শিরা, উপশিরা সব ফেটে যায়, তারপর প্রাণীটাকে একটু একটু করে গিলে ফেলে।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলুম—আমি এইসব ভাবছি কেন! আমি যে-পথের পথিক সে-পথে তো রুমকির থাকার কথা নয়! একটা মন প্রশ্নকে, আর একটা মন উত্তর দেয়। উত্তরদাতা মন একটা যুক্তি তৈরি করে দিলে—আহা, এটা তো তোমার কর্তব্য! তোমার বাড়ির নিচের তলায় কি হচ্ছে খবর নেবে না? এ তো মানুষের কর্তব্য।

পাকুড়ের তলায় আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লুম। চিৎ, বুকের ওপর হাত দুটো। শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠা-নামা করছে। কি আছে ভেতরে পরিষ্কার টের পাচ্ছি—আছে ভয়, আছে সেই ধূর্তামি। আমার যেমন বেণি তেমনি রবে, আমি চুল ভেজাবো না। দেহবাসনা যথেষ্টই আছে অথচ ভাব দেখাই, মহাকাশে মহাবিশ্বে মহাযোগী। এরাই সাংঘাতিক। ঠাকুর বলছেন, যে খায়দায় ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু কোনো অসৎ চিন্তা করে না, সে ওই ভণ্ড ধার্মিকদের চেয়ে শতগুণে ভাল। আমার তো চব্বিশ ঘণ্টাই অসৎ চিন্তা। এ কেমন মন? একটু আগে যে ধ্যান করছিল, সে একটু পরেই রুমকির ভাবনায় ভেবে পড়ল। রুমকির বাবার কি হল, দেখার দরকার নেই, যেমন রুমকিরই হার্ট-অ্যাটাক। সাট্টা-বুকি ছুটে না এলে তুমি কি করতে? তোমার ক্ষমতায় কুলতো? একেই বলে ঈর্ষা!

টকাস্ করে একটা পাতা বুকের ওপর পড়ল। চিন্তার ধারা চমকে উঠল। অন্যদিকে ঘুরে গেল। নিজের ওপর একটা ঘৃণা এল। আমার এ জীবনটা জীবনই নয়—ভ্যাগাবন্ড! আমি সাট্টার বুকি ও তার দলবলকে ঘৃণা করছি। ওরাও কিন্তু আমাকে সেই চোখেই দেখছে। একটা বেকার,

এক পয়সা রোজগার নেই, চোখ উল্টে ধার্মিক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কি হবে এই ব্যর্থ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে? কুকুর-ছাগলের মতো? আমার গুরু বলতেন—তিনি কৃপা না করলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

উঠে বসলুম। আকাশের তারার স্থান দেখে মনে হচ্ছে—রাত দুটো হবে। গঙ্গায় জোয়ার চলছে, কানায় কানায় ভরে গেছে। ভীষণ ইচ্ছে করছে—ওই জলে ডুবে যাই। কি হবে এই জীবন রেখে? ঠাকুরের কাছে গেলে, যা হয় দু'চার কথা মুখ ঘুরিয়ে শোনেন। তিনি কোনো দিন আমার কাছে যেচে আসেন না। ঠিক আছে ঠাকুর, আপনার যাঁরা তাঁদের নিয়েই থাকুন—আমি যাই। ক্রমশই জলে নামছি, মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। কোমরের কাছে জল, ভীষণ স্রোত।

জমাট একটা অন্ধকার আমার দিকে এগিয়ে আসছে। জলে দাঁড় পড়ার ছপ ছপ শব্দ। একটা নৌকো আসছে। একজন দাঁড়ী, একজন মাত্র যাত্রী। নৌকোটা একেবারে আমার পাশে এসে থেমে গেল। দুলতে লাগল জলে। যাত্রীর মুখ একেবারে আমার মুখের কাছে। চমকে উঠলুম, ঠাকুরের মুখ। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পরিচিত মুখ।

'কি ইচ্ছে তোমার? আত্মহত্যা?'

চমকে উঠলুম। এমনও হয় নাকি! মধ্যরাতে অনেকের জীবনে অনেক কিছু ঘটে। সাধকের কাছে বিদেহী সাধক আসেন। আমার মতো অখ্যাত, অজ্ঞাত এক পাপীর কাছে তাঁরা আসবে কেন? আমার কী এমন পুণ্যকর্ম আছে? সাধনভজনই বা কি করেছি?

আমি এত ভয় পেয়েছি যে শরীর শিথিল হয়ে আসছে। হাত পা অবশ। চোখে কুয়াশার আবরণ। জানতুম আধার তৈরি না হলে এইরকমই হবে। এক ছটাকি পাত্রে একসের ধরবে কেন? আমি ভগবানকে দেখার আনন্দের বদলে ভূতের ভয়ে সিঁটিয়ে গেছি। নৌকোটাও ভূত, যাত্রী দুজনও ভূত। সাহস করে আর একবার তাকালুম। মাঝিকে এতক্ষণে চিনতে পেরেছি—স্বামী বিবেকানন্দ। দৃপ্ত সন্ন্যাসীর বেশ। মুণ্ডিত মস্তক। তপ্ত

কাঞ্চনের মতো গাত্রবর্ণ। অন্ধকারেও বুঝতে পারি। আসলে অন্ধকার আর নেই। স্নিগ্ধ চাঁদের আলোর মতো অলৌকিক একটা আলোয় সব উদ্ভাসিত। ভরা গঙ্গার গেরুয়া জল খল খল করে হাসছে।

হঠাৎ মনে হল, ঠিকই তো! স্বামীজিই তো উপযুক্ত মাঝি! তিনিই তো আবিশ্ব ঠাকুরকে বহন করছেন। তখনও করেছেন, আজও করছেন। ভয়ের বদলে একটা বিস্ময়, একটা কৌতূহল জাগছে মনে। সত্যই কি কিছু ঘটছে, না সবটাই আমার মনের ভুল? মায়া দেখছি? কি খেয়েছি সন্ধে থেকে, গাঁজা-টাঁজা কিছু? কয়েক গেলাস জল ছাড়া কিছু খাইনি। জোটেনি কিছু। নিচের ওরা আজ ভাড়ার টাকা দেবে বলেছিল।

চিন্তার আবর্ত থেকে বেরিয়ে এলুম, শুনতে পেলুম ঠাকুর বলছেন, 'আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোনার প্রতিমা মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙে ফেলতেও পারে।

অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছোকরা আসত, উমের কুড়ি বছর হবে। গোপাল সেন যখন এখানে আসত তখন এত ভাব হত যে, হৃদয়কে ধরতে হত—পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে যায়। সে ছোকরা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে, আর আমি আসতে পারব না—তবে আমি চললুম। কিছুদিন পরে শুনলাম যে, সে শরীর ত্যাগ করেছে।

'শোনো, অপঘাতে মৃত্যু হলে প্রেত হয়। সাবধান! মনকে বুঝাবে, এত শুনে দেখে শেষকালে কি এই হল!'

ঠাকুর হাসছেন। স্বামীজি দাঁড় তুলে ভোলানাথের মতো বসে আসছেন। নৌকো মৃদু মৃদু দুলছে। ধীরে ধীরে সমস্ত জায়গাটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কতক্ষণ এই ভাবে কাটল আমি জানি না, একসময় প্রবল হরিধ্বনিতে আমার ঘোর কাটল। তখন শেষ রাত। আকাশে জ্বলজ্বলে শুকতারা। শ্মশানে কোনো ভক্তজনের মৃতদেহ এসেছে। প্রবল হরিনাম সঙ্কীর্তনে চারপাশ মুখর।

নিজেকে জল থেকে টেনেটুনে তুলে ঘাটে বসালুম। ভীষণ আক্ষেপ। কৃপা করে দর্শন দিলেন, প্রণাম করা হল না! আরো কিছু প্রশ্ন ছিল আমার। এই কর্মহীন জীবন আমার কাছে দুঃসহ। না ভোগে, না যোগে।

ভোরের আগেই বাড়ি ফিরে এলুম। সেই বদ্ধ কারাগার। নিচেটা নীরব সুনসান। সব বন্ধ থাকায় ভ্যাপসা একটা গরম। কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ। এই গন্ধটা মাঝেমাঝেই বেরোয়। তখনই আমি ভয় পাই। বাড়িতে একটি বাস্তু সাপ আছে। তার বয়স কত বছর কেউ জানে না। এই সাপ এই পরিবারের মঙ্গলদায়ক। তবে পরিবারই তো নেই। কার মঙ্গল? হঠাৎ একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলুম। ঠাকুরের দর্শন আর বাস্তব গন্ধ! ওই কারণেই এই কারণ? সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য জলের স্রোতে এসে জলের স্রোতে ভেসে গেল।

দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে অবাক। এত অবাক যে দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়! আমি যখন ছিলুম না, তখন ঘরে কেউ পুজো করে গেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারায়ণের ছবিটি দেয়াল থেকে নামিয়ে মেঝেতে পাশাপাশি রেখেছেন তিনি। সামনে আসন, কোষা কুষি, নৈবেদ্য, গঙ্গাজল। ধূপ দীপ জ্বলছে। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। পেতলের থালায় ফুল, বেলপাতা। পুজোর একটা আয়োজন স্তব্ধ হয়ে আছে।

গঙ্গার মাটি মাখা শরীরের ঘরে ঢুকতে অস্বস্তি হচ্ছে। বুঝতে পারছি না, পুজো হয়ে গেছে না হবে! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে দেখলুম আর একবার। তাম্রকুণ্ডে জল পড়েনি। ঠাকুরের চরণে পড়েনি পুষ্পাঞ্জলি। পুজো হয়নি, পুজো হবে।

কে এমন করে সাজালে? পূজারী কোথায়?

একটা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে থম মেরে রইলুম কিছুক্ষণ, যেন ঝড়ের আগের প্রকৃতি। শেষরাতে এ আমি কি দেখলুম! স্বপ্ন অবশ্যই; কিন্তু জাগ্রত স্বপ্ন। আমি আত্মা দর্শন করেছি। আমি যে রূপে তাঁকে ভালবাসি, সেই রূপ ধরে একটি নৌকায় চড়ে ভেসে ভেসে আমার কাছে এলেন, শুধুমাত্র আমাকে পথের দিশা দেবার জন্যে। শুধুমাত্র আমার জন্যে, আমাকে হতাশা থেকে

আশায় আনার জন্য। সে তো আমি বুঝলুম। যা দেখেছি তা সাধারণ চোখের দেখা নয়, আমার কল্পনা। এত ঘোরতর কল্পনা যে বাস্তব বলে ভুল হয়েছে। একই ঘটনা অন্যভাবে ঘটেছিল তোতাপুরীর জীবনে।

সে ঘটনা তো ঠাকুর আমাদের বলেছেন, 'স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? সকলই ঈশ্বরাধীন। ন্যাংটা অত বড় জ্ঞানী গো, সে-ই জলে ডুবতে গিছল। এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) এগার মাস ছিল। পেটের ব্যারাম হল, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গঙ্গাতে ডুবতে গিছল। ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায়, হাঁটুজলের চেয়ে আর বেশি হয় না; তখন আবার বুঝলে, বুঝে ফিরে এল। আমার একবার খুব বাতিক বৃদ্ধি হল, তাই গলায় ছুরি দিতে গেছলুম। তাই বলি, মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও তেমনি চলি; যেমন করাও তেমনি করি।'

আহা, অপূর্ব সেই সঙ্গীত ঃ

আমায় ধর ধর জনার্দন, পাপভার গোবর্ধন।
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা বাঁশরি, মন ধেনুকে বশ করি।
তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠ পুরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥
আমার প্রাণরূপ যমুনাকূলে, আশা বংশী বটমূলে

আমার প্রেমরূপ যমুনাকূলে, আশা বংশী বটমূলে—এই ভাবের পৃথিবী বাস্তবে আর নেই। ঠাকুর যে-দুটিকে সাধনার অন্তরায় ভাবতেন, সেই দুটিই হয়েছে ইষ্ট—কামিনী আর কাঞ্চন। দেবুদা সেদিন এইভাবে বোঝাতে চাইছিলেন ব্যাপারটা—ধর্ একালের একটা মেটিরিয়ালিস্ট ছেলে, সে প্রোমোটার, বিরাট বিরাট ফ্ল্যাট তৈরি করে লাখ লাখ টাকায় বেচে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে। পুলিশ, করপোরেশান, নেতা-টেতা সব হাতের মুঠোয়। রাজার মতো ভোগে থাকে। ছেলেমেয়েদের বিলেতে লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছে। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। একটু একটু করে বুড়ো হচ্ছে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, যৌবন তার যাবেই। যে দুর্ভোগে আছে তার তাড়াতাড়ি যাবে, যে ভোগে আছে তার হয়তো একটু দেরিতে যাবে, কিন্তু যাবেই। দেহে স্বাভাবিক কারণেই রোগ ব্যাধি আসবে। ভোগের জগতে অকারণ প্রেম থাকে না। সব কিছুই স্বার্থের চাকায় ঘোরে। বার্টার সিসটেম, তুমি কিছু দাও, ওজন করি, তারপর ওজন বুঝে তোমাকেও

আমি দোবো। ছেলেমেয়েদের কেরিয়ারের পেছনে টাকা ঢালো, সে তোমাকে 'বাবা' বলবে। যেই লাখে হবে উড়ে যাবে। বাসা খালি। জিন চড়ানো ঘোড়া তৈরিই আছে। লাফিয়ে উঠেই জগৎ ধরতে বেরিয়ে যাবে। সুন্দরী, আধুনিকা স্ত্রী হীরের নেকলেস পরে যৌবনে প্রেম-প্রেম খেলা করত। সেবার ধারেকাছেও যেতে না। সব কাজই করে দিত বাড়ির কাজের লোকেরা। বৃদ্ধ স্বামী চিকেন তন্দুর, মুর্গ মসল্লম চায় না, চায় সাহচর্য, সঙ্গ। একটু আন্তরিক প্রেম। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কেয়ার'। কে দেবে? সেভাবে তো কারোকে তৈরি করা হয়নি? নিজের তৈরি পাঁচতারা হোটেলে 'বিজনেস এগজিকিউটিভ'-এর মতো থেকেছে। সব কিছু কিনতে হয়েছে টাকা দিয়ে। প্রেম দিয়ে তো কেনা হয়নি কিছু। এই জগতে প্রেমের কারেনসি নোট অচল। জগৎটা বিশাল এক বিজনেস হাউস। তিনজাতের মানুষে ঠাসা—প্রোডিউসার, কনজিউমার, সেলসম্যান। রাজা যখন অথর্ব, সে তখন তার নিঃসঙ্গ ময়ূর সিংহাসনে বসে ভাবতে পারে, কি তাহলে হল? প্রাসাদ হল, গালচে হল, মটোর হল, নোট হল, লম্বা-চওড়া কথা হলো, অহংকারের টঙ্কার হল, শেষে তলানিতে কি পেলুম ভাই? ফক্কা! আনন্দ কোথায়? কোথায় শান্তি? রেসের ঘোড়ার জকি, সে তো রেসটাই জেনেছিল। রেস্টের কথা তো ভাবেনি। তখন সে ফিরবে অতীতে। নিজের অতীতে নয়, মানব সভ্যতার অতীতে। কম আলো, কম গতির কালে। বিশাল বিশাল গাছ, ছাড়া ছাড়া জনপদ। লোহা দিয়ে ঢালাই করা। আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির উদ্ধত অহঙ্কার যখন ছিল না, মটোর গাড়ির একজস্টের ধোঁয়া শ্বাস যখন পীড়িত হত না, জেটপ্লেন আর যন্ত্রের শব্দে পাখির ডাক চাপা পড়ে যেত না। মানুষ যখন ধীরে হাঁটত, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ত না। মানুষ যখন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এসে পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে বসে গল্প করত, মদের দোকানে ঢুকে মত্ত হত না, দিনকে রাত রাতকে দিন করত না। মন্দিরের ঘণ্টাকাঁসর, চার্চের বেল, মসজিদের আজানে যখন তার মনে অনন্তের অনুভূতি আসত, যখন উপনিষদের সুরে মানুষ জীবনের সুর বাঁধার চেষ্টা করত—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম॥

এ তোমার পরমেশ্বরের পৃথিবী, সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। তোমার

আত্মাকে পালন করবে কি ভাবে? না ত্যাগের দ্বারা, ত্যাগের মনোভাব নিয়ে। আসক্তিশূন্য হও। দিনের আকাঙ্ক্ষায় জীবনটাকে নষ্ট কোরো না। কার ধন? কে কাকে ভোগ করে? তার তখন মনে পড়বে বাইবেল, প্রথম শতাব্দীতে সন্ত ম্যাথু বলেছিলেন ঃ

Blessed are the poor in Spirit : for
theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they that mourn : for
they shall be comforted.
Blessed are the meek, for
they shall inherit the earth.
Blessed are they which do hunger
and thirst after righteousness : for
they shall be filled.
Blessed are the merciful : for
they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart : for
they shall see God.
Blessed are the peacemakers : for they
shall be called the children of God.

তখন তার মনে পড়বে ষোড়শ শতকে তুলসীদাস কি বলেছিলেন ঃ

গোধন গজধন বাজীধন, আত্তর রতন ধন খান।
যব আওত সন্তোষ-ধন, সব ধন ধুরি সমান॥

গোধন, গজধন, অশ্বধন, রতনখনি প্রভৃতি নিখিল ধন। তোমার মনে হবে তুচ্ছ ধুলো, যখন তুমি সন্তোষধন পাবে। সন্তোষরূপ ধনের তুল্য ধন আর দ্বিতীয় নেই। তার মনে পড়বে বালানন্দ ব্রহ্মচারীজির জীবনের একটি ঘটনা ঃ

বি. টি. রোডের ধারে মতিশীলের বাগানবাড়ি। গুরু বালানন্দ কলকাতায় এসে ওই বাগানবাড়ির কাছে এক পোড়ো বাড়িতে উঠেছেন। ভূতের বাড়ি বলে সেই বাড়িতে কোনো ভাড়াটে আসত না। মহারাজ একদিন শীলদের পুকুরঘাটে স্নান করতে গেছেন। তিনি জানতেন না যে,

ওই ঘাটে শীলবাড়ির মেয়েরাই শুধু স্নানে আসতেন। দারোয়ান এসেছে। রুক্ষ ভাষায় মহারাজকে অন্য কোনো ঘাটে চলে যেতে বলছে। মহারাজ দেখলেন ঘাটের কাছে রাস্তার ধারে একখানা গাড়ির মধ্যে মেয়েরা বসে রয়েছেন। মহারাজ হাসতে হাসতে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ ঘাট কার?'

দারোয়ান বললে, 'এটা মতিবাবুর ঘাট।'

মহারাজ বললেন, 'মতিবাবু কোথায়? তাঁকে ডেকে আনো।'

দারোয়ান বললে, 'মতিবাবু মারা গেছেন।'

এইবার মহারাজ হা-হা করে হেসে বললেন, 'তবে যে বললে মতিবাবুর ঘাট? তাঁর ঘাট হলে তিনি তো সঙ্গে করেই নিয়ে যেতেন। তা যখন যাননি, তখন তাঁর ঘাট বলছ কেমন করে? এ ঘাট এখন সকলের।'

তার মনে পড়বে, কবীর বলেছিলেন, না ঘর মেরা, না ঘর তেরা, দুনিয়া সবসে বসেরা। বার্ধক্য সব মানুষেরই হবে, সে বর্তমানে বসে আছে অতীতে, ভেসে চলেছে ভবিষ্যতের বিলুপ্তির দিকে। তার কানের কাছে বাইবেল বলবেন ঃ

What is a man profited, if he shall gain the whole world and *lose his own soul ?*

সে তখন বাইবেলের কথাতেই উত্তর দেবে ঃ They have sown the wind and they shall eap the whirlwind.

আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।

দেবুদা সবশেষে বললেন, 'শোনো ছোকরা, কালের হলাহল তোমাকে পান করতেই হবে। অতীত হয়ে যাওয়ার বয়েস তোমার হয়নি—খানিক দৌড়াদৌড়ি করো, ঘোড়ায় চাপো—তারপর।'

রিনঠিন চুড়ির শব্দে ঘোর কেটে গেল। আমার সর্বাঙ্গে গঙ্গার পলিমাটি। দরজার কাছে রুমকি। সাদা শাড়ি। পিঠে ভিজেচুল এলো। কপালে একটা সাদা টিপ। দেবীর মতো দেখাচ্ছে। তাকিয়ে আছে আমার দিকে অদ্ভুত চোখে। কী বলব আমি? কাছে ডাকব? না আবার পালাব? প্রশ্নটা করেই ফেললুম, 'এই, পুজোর যোগাড় তুমি করে রেখেছ?'

দেবুদা বললেন, 'আমার জানাশোনা একজন ভালো সাইকোলজিস্ট আছেন। আমার সঙ্গে চল, একটা চেকআপ করিয়ে আনি।'

—'কেন? আমার কী মাথার ব্যামো হয়েছে?'

—'প্রথম কথা, তুই হ্যালুসিনেশান দেখছিস। শেষ রাতে নৌকো চড়ে গঙ্গা বেয়ে ঠাকুর এলেন তোকে দর্শন দিতে? একমাত্র ব্লাড ইউরিয়া বাড়লে মানুষ এইসব দেখে! তোর কিডনি ঠিক কাজ করছে তো? জলটল ঠিকমতো খাস তো? মাছ-মাংস খেলে গা-বমিবমি করে?'

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন। ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে হবে। দেবুদা জেনেও ভুলে বসে আছে, মাছ-মাংস আমার জোটে না। ফলে গা-বমিবমি করে কী না, বলতে পারব না। জল আমি প্রচুর খাই, কারণ জলই আমার প্রধান খাদ্য। খিদে পেলেই জল খাই। আমার রোজগার এত সামান্য, কি করে বেঁচে আছি, ভাবলে অবাক হয়ে যাই। অনেক কায়দা করে দিন চালাতে হয়। সাবানের বদলে গায়ে গঙ্গামাটি মাখি। বেলা তিনটে, সাড়ে তিনটের সময় একবার খাই। ভাতের সঙ্গে একটু ছোলার ছাতু মেখে নিই, যাতে পেটে দমটা বেশ কিছুক্ষণ থাকে। মাঝে-মধ্যে তেলেভাজার ওপর কোঁত কোঁত করে দু'তিন গেলাস জল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেট ফুলে জয়ঢাক।

উত্তরে বললুম, 'জল আমি প্রচুর খাই, কিডনিতে কোনো সমস্যা নেই।'

—'তাহলে মাথা! কারণ তার প্রেম বোঝার ক্ষমতাটাও লোপাট হয়েছে। তোর পৃথিবীটা হয়ে গেছে অন্ধকারের পৃথিবী। কোথাও কোনো আলো নেই। রুমকি তোকে ভালোবাসে, এটা তুই বুঝিস না?'

—'তা বলে সে বলবে, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও, তুমিই আমার গুরু?'

—'সে কী রে! এই কথা বলেছে?'

—'তাহলে তোমাকে আর বলছি কী! পুজোর জোগাড়টোগাড় সব রেডি। নতুন কাপড় পরে এসে হাজির।'

—'এই যে বললি, বাবার হার্ট-অ্যাটাক!'

—'সামলে গেছে সেই রাতেই। হার্ট-অ্যাটাক নয়, কে প্রচুর সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিল।'

—'তুই কী করলি? দীক্ষা দিলি?'

—'আমি ফেরাতে পারিনি দেবুদা। আমার গুরুর দেওয়া ইষ্টমন্ত্র তাকে দিয়ে দিয়েছি।'

—'সে কী রে! তুই তো মরবি! গুরুর আদেশ ছাড়াই দীক্ষা দিয়ে দিলি?'

—'তাই তো ভয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।'

—'এ ব্যাপারে আমি তোর কী করতে পারি? বাঘ তাড়া করে এলে, গুলি করে ফিনিশ করে দিতে পারতুম। এইটুকু বলতে পারি, কাজটা তুমি ঠিক করোনি। তুমি যদি গুরুই হও, রুমকি তোমার প্রথম শিষ্যা। এইবার রুমকি তোমাকে বিয়ে করবে। তার মানে গুরু, শাস্ত্র যাতে বলছে পিতা, সেই পিতা কন্যাকে বিবাহ করছে—স্ক্যান্ডালাস! ঘোর কলি!'

—'তুমি আমাকে বাঁচাও। বিয়ে আমি করব না। সে প্রশ্নই আসে না। যার চালচুলোর ঠিক নেই, সে বিয়ে করবে কোন্ আক্কেলে?'

—'আমি বলে রাখলুম, রুমকি তোকে বিয়ে করবেই, এবং তোর টাকার কোনো অভাব থাকবে না। দিস ইজ মাই প্রেডিকশান! ধর্ম যাবে, অর্থ আসবে।'

এই জীবনে প্রথম দেবুদার ওপর আমার খুব রাগ, রাগের পর অভিমান হল, 'তোমার ধারণা, আমার গুরু হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই? সাত বছর বয়েস থেকে আমি সাধুসঙ্গ করছি!'

—'তাহলে সাধুর কমণ্ডলুও তো মস্ত সাধু! সাধুর সঙ্গে সাত ধাম ঘুরছে। স্বভাবে যে কটু সেই কটু। সাধুসঙ্গ করে তোমার হয়েছেটা কী? ভাগবত কী বলছেন শোন,

অদস্ত্যাবিনীতস্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ।
ন গুণায় ভবন্তিস্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ।।'

—'বাঙলা করে দাও।'

—'যে অস্থিরচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় আর অবিনীত আর যে বৃথাই নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করে, তার শাস্ত্র অধ্যয়ন অভিনেতার রাজবেশ

পরার মতো। যথার্থ রাজা সে কোনোদিনই হতে পারবে না।'

নিজের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করলুম। দুটো মিলছে। সত্যই আমি অস্থিরচিত্ত। কোনো কিছুই সেইভাবে ধরে থাকতে পারিনি। যাকে বলা যায় কচ্ছপের কামড়। আর ইন্দ্রিয়? সবকটাই যথেষ্ট প্রবল। সব সময়েই পাঁচটা উদ্দাম বানরের মতো লাফালাফি করে। আর একটা যেটা প্রবল, সেটা মাঝে মাঝে ঘুমোয়, মাঝে মাঝে তেড়েফুঁড়ে ওঠে। এই মনে হচ্ছে নেই, পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর ভাবে আছে।

এই ভাবনার মাঝেই দেবুদা বললেন, 'অত্যন্ত বোকার মতো কাজ করলি। ও তোর পূর্বজন্মের বউ। যাচা ধন পায়ে ঠেললি। বিধাতার বিধানের উলটো রাস্তায় গেলি। খোদার ওপর খোদকারি করলি।'

দেবুদার কথায় কেমন যেন হয়ে গেলুম। পূর্বজন্মের সম্পর্ক? হলেও হতে পারে। আমার তো উপেক্ষার অন্ত নেই। মেয়েটি ভিন্নভাষী। পিতা ছোটখাটো ব্যবসায়ী হলেও অর্থের অভাব নেই। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো। যে কোনোদিন ঘোড়ায় চেপে এসে যাবে বিত্তবান বর। বউ হয়ে চলে যাবে কলকাতার ফ্ল্যাটে। এই অঞ্চলেও একটি রাজস্থানী ছেলে আছে। রুমকিকে পছন্দ করে। তার একটা গাড়ি আছে। জীবন বড় জটিল। জট ছাড়ানো সহজ নয়। কোনো কোনো কথা আছে রূপকথার মতো।

দেবুদাকে অবশেষে বললুম, 'কিছু টাকা দান করবে? ধার চাইব না, কারণ শোধ করার গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না।'

'টাকা দিলে কী করবি?'

'আমি বেরিয়ে পড়ব। হরিদ্বার হয়ে হিমালয়।'

'তার মানে, আগে উপাধি তারপর লেখাপড়া!'

'তোমার হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢোকে না।'

'হিমালয় থেকে নেমে এসে গুরু হয়, বা বলতে পারিস গুরু হয়ে নেমে আসেন। তোর হল উল্টো। তুই গুরু হয়ে হিমালয়ে উঠবি?'

'শোনো দেবুদা, ঠাকুরের একটা গল্প শোনো, এক চোর চুরি করতে গিয়েছিল। গৃহস্থ জেগে ওঠে, চোর-চোর চিৎকার। চোর ছুটছে, পেছনে তাড়া করে আসছে গ্রামের লোক। চোর দেখলে পালাবার পথ নেই। ধরা তাকে পড়তেই হবে। তখন সে এক ফন্দি বের করলে। সামনেই একটা ছাই গাদা। সর্বাঙ্গে ছাই মেখে একটা বটগাছের তলায় ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে

পড়ল। গ্রামের লোক চোরকে আর খুঁজে পেল না। ব্যাটা পালিয়েছে! কিন্তু গ্রামে এক নতুন সাধু এসেছে, এই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। সবাই ফল-মূল প্রণামী এনে সাধুর চরণে নিবেদন করতে লাগল। সাধু তখন ভাবলে, ভেক ধরেই আমার এই অবস্থা, সত্যি সাধু হলে না-জানি আমার কী হবে? সে তখন সত্যি সাধু হওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। সবাই এসে দেখলে, বটতলা ফাঁকা। আমারও হয়ত তাই হবে।'

দেবুদা বললে, 'তোমার কাঁচকলা হবে! ঠাকুর বলতেন, ম্যাদামারাদের কিছু হয় না। রোখ চাই, তোর সেই রোখ কোথায়? তোর অনেক গুরু। মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। আর তোর যে বয়েসে তাঁরা এসেছিলেন, সেই সময়টা ছিল তোর কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকাল। মানুষের জীবনের সবচেয়ে রোম্যান্টিক সময়। ওই সময়টায় বেরিয়ে যেতে পারলে, তুই হয়তো প্রকৃতই এক বড় সন্ন্যাসী হতে পারতিস। ঠাকুর বলছেন, পাকা বাঁশ সহজে নোয়ানো যায় না। তুই পেকে গেছিস, সেইটাই হয়েছে মহা মুশকিল। তুই না ঘরকা, না ঘাটকা। তার ওপর, ঠাকুরেরই কথা, কাজলের ঘরে রয়েছিস কালি তো একটু লাগবেই!'

'তুমি রুমকির কথা বলছ?'

'কেন, রুমকি রমণী নয়? নারী মোহিনী মায়া। সে বিদ্যামায়াই হোক আর অবিদ্যামায়াই হোক। সীতা আর রামচন্দ্রের কথা স্মরণ কর। রাম অবতার। তিনি জানতেন না, হরিণ কখনো সোনার হয় না? সীতাও কি জানতেন না? সেই রামচন্দ্র সীতার মায়ায় ধনুর্বাণ নিয়ে অবোধের মতো মায়া-হরিণের পেছনে দৌড়লেন, এদিকে হয়ে গেল সীতা-হরণ! বুঝলে ভায়া, বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া এ-ঘর ও-ঘর করে?'

আমার রোখ চেপে গেল, তবে রে! স্টেশনের রাস্তা ধরলুম। দেখি তো হয় কিনা!

তুফানে উঠে বসেছি। আর কিছুপরেই ট্রেন ছাড়বে। সঙ্গে মালপত্র বিশেষ কিছুই নেই। পকেটে গোটা কুড়ি টাকা মাত্র আর খুচরো কিছু পয়সা।

জানলার ধারে বসতে পেয়েছি। এইটুকুই যা আনন্দের। বাকি সবই নিরানন্দের। মন যদি আকাশ হয়, তাহলে সেখানে রোদ নেই। ঘন কালো মেঘ। কী করতে চলেছি নিজেই জানি না। আমি কোথায় চলেছি সে-কথা কারোকে বলিনি। এমন কী দেবুকেও না। সংসারে যার কেউ নেই, সে কোথায় থাকল কোথায় গেল, সে খবরে কার কী প্রয়োজন? একটা গাছ যেমন নিজে নিজে, নিজের চেষ্টায় বেঁচে থাকে, পাতা ঝরায়, পাতা গজায়, আমাকেও সেইরকম যতদিন পারি বাঁচতে হবে। যখন আর পারব না তখন মরে যাব। নিজের ভবিষ্যৎ তো জানি, আগাছার ভবিষ্যৎ!

হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ পড়ল। এতক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও চোখে কিছু পড়ছিল না। সব তালগোল পাকানো একটা মহাব্যস্ততা। অনর্গল শব্দ, অবিরাম ছোটাছুটি। এইবার দৃষ্টিতে মন লাগিয়েছি। আর তখনই দেখতে পেলুম, হুইলারের স্টলের পাশে রুমকি দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ভাসা ভাসা, বড় বড় চোখ। ঢালু কপাল চকচক করছে। একগুছি চুল উড়ে সামনে ঝুলে পড়েছে। সবুজ শাড়ি। গোল গোল হাত। ভীষণ সুন্দর। রুমকি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে—আকাশ যেভাবে তাকিয়ে থাকে মানুষের দিকে। আকাশ কথা বলে না। মানুষ যা ভাবে আকাশ সেই ভাবনাটাকেই দৃষ্টি করে নেয়। আমি হাসলে আকাশ ঝলমল করে, আমি কাঁদলে আকাশ বিষণ্ণ হয়।

যতবারই তাকাই, দেখি রুমকি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো কোনো মানুষের মন দুর্গের মতো। অনেক গোলাগুলিতেও ভাঙে না। আমার মন ঝুরঝুরে মাটির দেয়াল। রুমকিকে দেখে ভাঙতে শুরু করেছে। আমি ওর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি।

বাঁশি বাজল। ট্রেন নড়ছে। দু'এক কদম এগিয়েই হুস্‌হুস্‌ গতিতে ছুটবে। কে যেন আমাকে ঠেলে আসন থেকে তুলে দিলে। বাঙ্কের ওপর থেকে এক ঝটকায় ব্যাগটা টেনে নিয়ে দরজার কাছে চলে এলুম। স্পিড বেড়েছে। প্ল্যাটফর্ম গলগল করে পেছনদিকে ছুটছে। ঝপ করে নেমে পড়লুম। অল্প একটু টাল গেলেও সামলে নিয়েছি।

পাশ দিয়ে ট্রেনটা হু-হু করে বেরিয়ে গেল। ঝাপটা একটা মন্তব্য কানে এল—মরার ইচ্ছে হয়েছে? তুফানের শেষ কামরাটা—তুমি পারলে না, তুমি পারবে না, বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে রোদের

লুটোপুটি। রুমকি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি এগিয়ে গেলুম। রুমকির দু'চোখ জলে টইটম্বুর। খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? কোথাও যাবে?

রুমকি কিছু একটা বলার চেষ্টা করেও বলতে পারল না। গলায় কান্না জমে আছে। শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

—আমি তোমার জন্যেই চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে এলুম। তুমি এইভাবে, এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ?

রুমকি ফিস ফিস করে বললে,—তোমার জন্যে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। তুমি নেমে না এলে আমি আত্মহত্যা করতুম।

আমার ভেতরে কিছু একটা লাফিয়ে উঠল। মাছ যেভাবে জলে লাফায়। ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না। ভালবাসতেও জানি না। এই নীরস ব্যস্তসমস্ত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, এই মেয়েটির কথা শুনে মনে হল পৃথিবীতে প্রেমের চেয়ে বড় কিছু নেই। নারীর ভালবাসাতেই জীবনের সবকিছু গোপনে আছে। সমস্ত বাদ্যযন্ত্র, সমস্ত সঙ্গীত, বৃষ্টি, ঝরণা, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, রোদ, জ্যোৎস্না, পাখি, প্রজাপতি, মেঘ, নীল আকাশ, সব—সব আছে নারীর একটি কথায়, আমি তোমাকে ভালবাসি।

রুমকির হাতে একটা টোকা মেরে বললুম, চলো।

হাত ধরার সাহস হল না। অনেক লোক, অনেকজোড়া চোখ, গনগনে রেলচাতাল।

রুমকি বললে—কোথায়?

—বাড়িতে।

—সেখানে গিয়ে কী হবে?

—আর তো কোথাও যাবার জায়গা নেই।

—আমরা কিছুদিনের জন্যে কোথাও একটা যেতে পারি।

—তোমার বাবা থানায় ডায়েরি করবেন। আমি জেলে যাব, তুমি উদ্ধার আশ্রমে।

—পুরীতে আমার পিসিমা থাকেন, পিসেমশাইয়ের বিরাট ব্যবসা। আমরা সেখানে যেতে পারি। সেইখানেই আমাদের বিয়ে হবে।

—এখন বাড়ি চলো। অনেক কিছু ভাবার আছে।

—যাই ভাব, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না।

—নিজের জীবনটা কেন নষ্ট করতে চাইছ? দারিদ্র্য জিনিসটা কী তোমার জানা নেই। সিনেমায় বড়লোকের মেয়ে গরিবের ছেলেকে বিয়ে করে। বাস্তবে তা করে না। করতে নেই। তুমি যদি এমন কর, আমাকেই আত্মহত্যা করতে হবে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে।

—তুমি তা পারবে না। তুমি আমাকে ভালবাস।

—ভালবাসি বলেই বিয়ে করতে পারব না।

—আর আমি ভালবাসি বলেই তোমাকে বিয়ে করব।

আলোচনাটা একটা বেয়াড়া জায়গায় এসে আটকে গেল। দাবা খেলায় যেমন হয়। দুজনেরই চাল আটকে গেছে। অসহায়ের মতো চারপাশে তাকালুম। ধীরে ধীরে একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। কোন ট্রেন কে জানে? কে একজন পাশ দিয়ে বলতে বলতে গেল—গীতাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি! হঠাৎ আমার খেয়াল হল, টিকিটটা ফেরত দিলে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। রুমকিকে বললুম—চলো, টিকিটটার ব্যবস্থা করি, কিছু রিফান্ড পাওয়া যেতে পারে।

—তোমার ব্যাগটা আমাকে দাও।

—তুমি আমার ব্যাগ বইবে নাকি?

—কথা বাড়িয়ো না।

—এই বিশ্রী ব্যাগ তোমার হাতে মানায় না।

—সেটা আমি বুঝব।

রুমকি ব্যাগটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। পায়ে পায়ে লোক। পিলপিল করে গেটের দিকে এগোচ্ছি। মাঝে মাঝে দু'জনে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আবার জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে পাশাপাশি চলে আসছি। মনে একটা ঘোর লেগে গেল। জীবনের শেষ পর্যন্ত এইভাবেই আমরা যদি চলে যাই ক্ষতি কী?

চিড়িয়াখানায় শীতের পাখিরা সব আসতে শুরু করেছে।

লেকের জল দেখা যাচ্ছে না। সাদা, কালো বিদেশী হাঁসের দল গায়ে

গা লাগিয়ে সাঁতার কাটছে। পিঁক পিঁক চিঁক চিঁক শব্দে মুখর। আমি আর রুমকি পাশাপাশি বসে আছি, শরীর স্পর্শ করে।

রুমকি ভালো খায়, ভালো পরে। হিংসে করছি না। প্রশংসাই করছি। মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো হওয়াই উচিত। রুমকিরা জৈন ধর্মাবলম্বী, নিরামিশাষী। তার ডান হাতের নিটোল, শীতল উপরবাহুটি আমার শীর্ণ বাঁ হাতে লেগে আছে। আমার শরীর আমার অতীত সংগ্রামের সাক্ষী। বর্তমানও কিছু প্রাচুর্যে ভরা নয়। আমার ভাতের সঙ্গে নুন জোটে না। রুমকি দুধ আর ঘিয়ে চুবে আছে।

আমাদের মুখে কথা নেই, কারণ আমরা প্রেমের কথা জানি না। শুধু দেখছি, শুধু অনুভব করছি। শীতের শীত-শীত দুপুর। রুমকি কী ভাবছে জানি না, আমি ভাবছি মেয়েটার মাথা খারাপ! পৃথিবীতে কয়েক কোটি ভালো বড়লোক ছেলে আছে, আমার মতো একটা ভিখিরিকে কেন জড়াতে চাইছে নিজের জীবনের সঙ্গে? না খেয়ে মরবে বলে?

বসে আছি পাশে গায়ে গা সেঁটে, মন কিন্তু সিঁটিয়ে আছে।

সেই এক রোগ। কেবলই ভাবছি, নষ্ট হয়ে গেলুম, খারাপ হয়ে গেলুম! মনে কুভাব আসছে। ভুরুর মাঝখানে জ্যোতিদর্শন আর হল না। ছোটখাটো একজন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, কী শঙ্করাচার্য হওয়া গেল না। একটা মেয়ের ফাঁদে পড়ে গেলুম, গোবরে জোনাকি পড়ার মতো। ভীষণ ভালো লাগছে, গান আসছে মনে। কমলালেবুর মতো নরম মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে।

আমার গুরু বলতেন, মায়া খুব সাংঘাতিক দেবী। জীবের চৈতন্য হরণ করেন। বই খুলে দেখাতেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলে গেছেন। বলতেন, এক এক করে সব লিখে রাখো। মন যখন টলবে, তখন তাঁর ছবিখানি চোখের সামনে রেখে বারে বারে পড়বে। জিভে নয়, নির্দেশ নেবে মনে। লোহায় জল ঢাললে জল ঢোকে না। লোহা জল টানে না। মাটিতে জল ঢালো, শুষে নেবে। শুকনো মাটি হলে তো কথাই নেই! সেই নোটখাতা আজো আমার কাছে আছে। মাঝে মাঝে পড়ি।

প্রথম যে কথাটি আমার খাতায় লেখা আছে, তা তো সাংঘাতিক—

'কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভেতরে অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয়—বইতে বইতে আর

ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।'

তোর মনে তুমি যেটা অভ্যাস করবে, সেইটাই তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়াবে। আমার গুরু বলেছিলেন, চীনেরা কী বলে জানো? যে কাজ তুমি ভালো ভাবে করতে চাও, সেটাকে আগে তোমার অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে এসো, তাহলে আর কোনো দিন ফাঁক পড়বে না, তুমি না করে থাকতে পারবে না, অস্বস্তি হবে।

এর পরের লেখাটি হল, 'এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে, কামিনী-কাঞ্চনও আছে।'

বলছেন যে, 'তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরই নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।'

রুমকি কনুইয়ের ধাক্কা মেরে বললে, 'একটাও কথা বলছ না কেন?'

'আমার কি রকম একটা ঘোর লেগে গেছে। অনেক কিছু ভাবছি।'

'কি ভাবছ?'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

'মাথাখারাপের কী লক্ষণ দেখলে?'

'আমার মতো একটা ভিখিরিকে বিয়ে করতে চাইছ রাজার মেয়ে হয়ে!'

'আমি রাজার মেয়ে তোমার এ ধারণা হল কী করে? আমি এক ব্যবসাদারের মেয়ে।'

'এ যুগে ব্যবসাদাররাই রাজা। তাদের অনেক টাকা। তুমি যা করতে চাইছ, তা সিনেমায় হয়। বাস্তবে হয় না, হলেও সে বিয়ে টেঁকে না, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এটা এক ধরনের পাগলামি। তা ছাড়া তুমি জোর করে আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছ। যেমনই হোক, আমি তোমার গুরু। গুরুকে কেউ স্বামী করে?'

'তুমি শাস্ত্রের কিছুই জানো না, স্বামীই তো শ্রেষ্ঠ গুরু। আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কী করেছিলেন? সারদা মাকে পুজো করেছিলেন। পায়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তুমি মা ভবতারিণী। আমারটা উল্টো, তুমি

আমার ভোলা মহেশ্বর। বাবা শ্মশানে থাকে, ছাইভস্ম মাখে।'

'এখন বলছ বটে, তখন কী আমার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরোতে পারবে?'

'সংসার চালাবার জন্যে?'

'সংসার হলে সংসার তো চালাতেই হবে। সংসার তো আর অটোমেটিক চলবে না। গাড়িতে পেট্রোল ডিজেল না ঢাললে যেমন গাড়ি চলে না, সংসারও তেমনি টাকা না ঢাললে অচল। সংসার করে বেকার বসে থাকলে চলবে না। ঠাকুর আমাকে গালাগাল দেবেন। সংসার করবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের খাওয়াবে কে? পাড়ার লোকে? গৃহস্থের কর্তব্য আছে, ঋণ আছে—দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, আবার পরিবারদের সম্বন্ধে ঋণ আছে। সতী স্ত্রী হলে তাকে প্রতিপালন; সন্তানদিগকে প্রতিপালন, যতদিন না লায়েক হয়। এই আমার ঠাকুরের কথা।'

'তাহলে শোনো, ঠাকুরের যত উপদেশ লেখা নোটখাতাটা চুরি করে আমি অনেকবার পড়েছি। সেখানে আছে, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে জাঁতি থাকে—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বলের মায়াপাশ ছেদন করবে। এটি বীরভাব। আমি তোমার সেই শক্তি। শুধু দেখে যাও, আমি তোমার কি করি, কতদূর কি করতে পারি!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম রুমকির মুখের পানে।

হাতুড়ির এক আঘাতেই দেয়ালের প্রায় সব পলেস্তারা ঝুর ঝুর করে খসে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল সেকালের পাতলা পুরনো ইট। অতীতে পাঁচ ইঞ্চি মাপের মোটা ইট পোড়াবার ভাঁটা ছিল না। এই রকমই আমি শুনেছি। সব ইটই হত তিন ইঞ্চি। সে প্রায় হবে আলিবর্দির কাল। নবাবী আমলের কথা। বর্গীদের হামলা শুরু হবে। সিরাজ সিংহাসনে বসবেন। ক্লাইভ এসে আমবাগানে নামে মাত্র একটা যুদ্ধ করবেন। একদিনেই জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হবে অতঃপর। সেই সময় আমার

কোনো পূর্বপুরুষ মুৎসুদ্দি হবেন। ইংরেজের আনুকূল্যে ধনী হবেন। জায়গাজমি কিনে গঙ্গার ধারে চকমেলান বাড়ি করবেন। চুনসুরকির গাঁথনি। অদ্ভুত তার প্ল্যান। ঘরের মধ্যে ঘর। আঁকাবাঁকা দালান। কোনো ঘরে আলোর বন্যা, কোনো ঘরে ঘুপচি অন্ধকার, রহস্যময় সিঁড়ি। চোরকুঠুরি।

তারপর তিন পুরুষে সেই সব উড়ে যাবে। ছত্রিশ ভাগ হবে। শেষে ভাগের মা গঙ্গা পাবে না। এই বাড়ির সেই দশা। পেছনের দিকটা ভেঙে মণ্ডপ হয়ে গেছে। কোন শরিক যে মালিক আমার জানা নেই। জানার কথাও নয়। আমার জন্মের আগেই সব ঘটে গেছে। আমার বাবাকে আমি দেখিনি। খুব কম বয়সেই তিনি মারা গেছেন। আমার মাকেও স্পষ্ট মনে পড়ে না। এক একজনের বরাত এই রকমই হয়।

ইতিমধ্যে দেয়ালের দশবিশখানা ইট নেমে গেছে। আমি দর্শক মাত্র। তদারকি করছে রুমকি। এখন এই বাড়ির অন্যতম মালিক রুমকি, কারণ রুমকি আমাকে বিয়ে করেছে। তার বাবা, মা কোনো আপত্তি করেননি। কেন করেননি বলতে পারব না। পরে হয়তো জানা যাবে। নিজের বরাতের ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস নেই। যখনই যা পেয়েছি, পরমুহূর্তেই তা হাতফসকে বেরিয়ে গেছে।

এখন রুমকি আমার জীবনটাকে ধরেছে। সে আমাকে তুলবে। ঠাকুর যেন বলতেন, 'মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে জাঁতি থাকে—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে। এটি বীরভাব। কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই—বর বোকাটি পেছনে বসে থাকে। কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।' ঠাকুর বলছেন, 'আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম বিলোম। বলছেন, যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব করেন, তাঁকে শক্তি বলি। প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।'

ঠাকুর আবার শিবের দুই অবস্থার কথা বলছেন—'যখন সমাধিস্থ—মহাযোগে বসে আছেন—তখন আত্মারাম। আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেমে আসেন—একটু আমি থাকে, তখন 'রাম' 'রাম' করে নৃত্য করেন।

তা আমি কী নিজেকে শিব ভাবতে পারি না? আমার গুরু তো ছিলেন শৈব। শৈব মানে কী, যিনি শিবের উপাসক। আমি মহাযোগে হয়তো যেতে পারব না কোনোদিন, তথাপি নিজের জড়ভূত আমিটাকে শিবের আমি করে রাখতে বাধা কোথায়?

ঠাকুর যেদিন এইসব কথা বলছিলেন, সেই দিনটি কত সুন্দর—মাস্টারমশাই লিখছেন—'আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল। সে আলো মন্দিরশীর্ষ, চতুর্দিকের তরুলতা ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথী বক্ষে পড়িয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এইসময় সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন।'

ঠাকুরের আবার কী সুন্দর কথা—বলছেন, 'এইরকম আছে যে, সেই মহামায়া শিবকে টপ্ করে খেয়ে ফেললেন। মার ভিতরে ষট্চক্রের জ্ঞান হলে শিব মার ঊরু দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন শিবতন্ত্রের সৃষ্টি করলেন। সেই চিচ্ছাক্তির, সেই মহামায়ার শরণাগত হতে হয়।'

রুমকিও তো সেই মহামায়া। শিবকে গিলে ফেলেছে।

এই সব ভাবছি, আর ওরা একটা একটা করে ইট খুলে যাচ্ছে।

দেয়াল ভেঙে, সামনের রকটাকে উড়িয়ে একটা দোকান করা হবে। এটা রুমকির উদ্যোগ। মূলধন তার। দুজনেই মেহনত করব। ব্যবসাটা হবে ছাপা শাড়ির। সে ভেবে-চিন্তে দেখেছে, এই জিনিস এখানে খুব চলবে। দ্বিতীয় আর কোন দোকান নেই। লোকসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। রুমকি নক্সার কাজ ভাল জানে। মাথাটা খুব ভাল।

ভেতরের উঠোন আর লম্বা একটা ঘরে কাঠের টেবিল পড়েছে। কাঠের ব্লক তৈরি হতে গেছে। পাড়ার কিছু মেয়ে চাকরিও পাবে। নামাবলীও ছাপা হবে। বড়বাজার থেকে কাপড় কেনা হবে। ভাল রঙ ভাল ডিজাইন, এক নম্বর মাল। মানুষকে সেরা জিনিস দিতে পারলে ব্যবসা জমতে বাধ্য।

রুমকির উৎসাহ দেখে আমার ঘুম-ঘুম ভাবটা আর নেই। উদ্দেশ্যহীন দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি বন্ধ হয়ে গেছে। স্বামীজির সেই কথাটি আমার বারে বারে মনে পড়ছে—সঙ্গে সেই অপূর্ব গল্প ঃ

"একটা লোক রাস্তা চলতে চলতে একটা বুড়োকে তার দরজার

গোড়ায় বসে থাকতে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে—'ভাই অমুক গ্রামটা এখান থেকে কতদূর?' বুড়োটা কোনো জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ করে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চলবার উদ্যোগ করলে। তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন করে বললে, 'আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—সেটা এই মাইল-খানেক হবে।' তখন পথিক তাকে বললে, 'তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তো তুমি একটা কথাও কইলে না—এখন যে বলছ, ব্যাপারখানা কি?' তখন বুড়ো বললে, 'ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার যে যাবার ইচ্ছে আছে ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছিল না—এখন হাঁটতে আরম্ভ করেছেন, তাই আপনাকে বললাম।'

"হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো। কাজ আরম্ভ করে দাও, বাকি সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তামাং যোগক্ষেমম্ বহাম্যহম্।।

অর্থাৎ যারা আর কারও ওপর নির্ভর না করে কেবল আমার ওপর নির্ভর করে থাকে, তাদের যা কিছু দরকার, সব আমি যুগিয়ে দিই।

"ভগবানের এই কথাটা তো আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়!"

রুমকি সেদিন রাতে আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিল—'কাজ আরম্ভ করে দাও, বাকি সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে।'

আমার পৃথিবীটা হঠাৎ আমারই চোখের সামনে কেমন ভাল হয়ে যাচ্ছে। একেবারে অবাক কাণ্ড! যাদের শয়তান ভেবেছিলুম তারা সব ভগবানের মতো আচরণ করছে। যারা একটু মাস্তান প্রকৃতির ছিল, রুমকির দিকে যাদের নজর ছিল, ভেবেছিলুম ধরে পেটাবে, কি রুমকিকে টেনে নিয়ে যাবে, তারাই এগিয়ে এল পরম বন্ধুর মতো।

এই হয়, পৃথিবীটাকে আমারা আগেই শয়তানের কারখানা ভেবে বসে থাকি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কত প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন! ঠিক এই কথাটাই বললেন, যে রঙের চশমা পরে দেখবে, সেই রঙই দেখবে। যাদের মাস্তান ভেবেছিলুম তারা ওই তথাকথিত ভদ্রলোকেদের চেয়ে অনেক অনেক ভালো। তারা যা করে নিজেদের এলাকায়। মারামারি, খুনোখুনি সবই নিজেদের হিস্যা নিয়ে নিজেদের ভেতর। সৎ, নিরীহ মানুষ এদের কাছে যদি আত্মসমর্পণ করে, এরা জান দিয়ে তাকে আগলাবে।

এই কায়দা দুটি শ্রীঠাকুর ও জননী সারদা আমাদের শিখিয়ে গেছেন।

ঠাকুর বলছেন, 'এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ। টাকা, লোকজন—অনেকে মনে করলে তোমার অনিষ্ঠ করতে পারে, তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে সায় দিয়ে যেতে হয়। তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে তোর চোদ্দপুরুষ, তোর হেনতেন, বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুশি হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।' শ্রীঠাকুর আরো বলছেন, 'অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকো-টুকো আছে? আমি বলি, আছে। কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়।'

এই আদেশে আমি চলে হাতে হাতে ফল পেয়ে গেছি। আর জননী সারদা শেখালেন আত্মসমর্পণ। রুমকি ঘরে এল। কপালে লাল গোল একটা টিপ, যেন ললাটে সূর্যোদয়। মুখটা এত সুন্দর যে আমার চোখে জল এসে গেছে। মনে হয় রান্নাঘরে ছিল। মুখটা মিহি ঘামে চকচক করছে।

আমাকে লক্ষ করে বললে, 'এ কি, চোখে জল কেন?'

আমি আমার হাতে ধরা বইটার মলাট দেখালুম।

'শ্রী সারদা দেবীর জীবনকথা, স্বামী বেদান্তানন্দ। কোত্থেকে পেলে?'

'কাল উদ্বোধন থেকে কিনেছি। যে জায়গাটা পড়ছিলুম তোমাকে

শোনাই, একটু সময় আছে?'

'আছে। পড়, পড়, শুনি।'

'আগে একটু ভূমিকা করে নিই, তাড়াহুড়ো চলবে না কিন্তু।'

'তোমার এইসব ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়ো করি? বলো!'

'মা সারদা তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসছেন গ্রামের কয়েকজন প্রাচীনার সঙ্গে। তাঁরা আসছিলেন গঙ্গাস্নানে। জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর দু ক্রোশ পথ। সেখান থেকে ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মী ও ভাইপো শিবরাম সঙ্গী হলেন। চারক্রোশ হেঁটে আরামবাগ। প্রথমে ঠিক হয়েছিল আরামবাগে রাত কাটানো হবে। বেলা তখনো অনেকটা আছে দেখে সিদ্ধান্ত হল রাত্রিবাস হবে তারকেশ্বরে। যতটা এগিয়ে থাকা যায়। একটু বিশ্রামের পর শুরু হল আবার হাঁটা। মায়ের স্বভাব ছিল নিজের শতকষ্ট হলেও অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করা। দীর্ঘপথ হাঁটার অভ্যাস তাঁর ছিল না, কষ্ট হচ্ছে, তবু তিনি তাঁদের পরিকল্পনায় রাজি হয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। অর্ধেক পথ সঙ্গীদের সঙ্গে সমান তালে চললেন কোনো রকমে, তারপর দলছাড়া হয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। সঙ্গীরা বারদুয়েক থামলেন। তাড়া দিতে লাগলেন, বেলা পড়ে আসছে, সামনেই তেলো-ভেলো আর কৈকালার অবিশাল বড় মাঠ পার হতে হবে। আশেপাশে গ্রাম নেই, লোক নেই জন নেই, খোলা মাঠ ধুধু করছে। প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো একটা পথ এঁকে-বেঁকে চলে গেছে সামনে। ডাকাতের উৎপাতের জন্যে প্রসিদ্ধ এই পথ। পথিকের করে সর্বস্ব হরণ। প্রাণেও মেরে ফেলে।'

সঙ্গীরা ভয় পাচ্ছেন দেখে মা বললেন, 'তোমরা এগিয়ে যাও, আমি ঠিক তোমাদের পেছনে পেছনেই আসছি।'

এইবার শোনো স্বামী বেদান্তানন্দ কি লিখছেন—'দেখতে দেখতে সূর্যদেব পাটে বসলেন। দিনের আলোর শেষ রেখাটুকু দিগন্তে মিলিয়ে গেল। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল ধরণীর বুকে। দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না, সারদা দেবী সঙ্গীদের আর দেখা পাবেন কি করে? অন্ধকারে একাকী তিনি পথ চলতে লাগলেন।

'এমন সময় সামনে আসতে দেখলেন অন্ধকারের চেয়ে কালো প্রকাণ্ড এক চেহারা। মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কাঁধে প্রকাণ্ড এক মোটা

লাঠি, হাতে রূপার বালা। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ও শুনলেন কর্কশ কণ্ঠস্বর—এমন সময় কে দাঁড়িয়ে ওখানে? প্রশ্ন শুনে কি তিনি ভয়ে মূর্ছা গেলেন, না দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন? ভয় তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু তার চিহ্ন তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ পেল না। দরকারমতো উত্তর যেন তাঁর মুখে যোগানো ছিল। তিনি বললেন, 'বাবা, আমার সঙ্গীরা আমায় ফেলে গেছে। আমারও মনে হচ্ছে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আমার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দেবে চল। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছিলাম। তুমি যদি আমাকে তাঁর কাছে রেখে আসতে পার বাবা, তাহলে তিনি তোমাকে খুব যত্ন করবেন'। এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি পায়ের রূপার মল দু'গাছা খুলে অপরিচিত বাগদি পুরুষের হাতে দিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে এক স্ত্রীলোক এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তিনি তখন যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন এবং সেই মেয়েটির হাত ধরে বললেন, 'আমি তোমার মেয়ে-সারদা। সঙ্গীরা ফেলে যেতে বিষম বিপদে পড়েছিলাম। ভাগ্যিস বাবা ও তুমি এসে পড়লে! নইলে কি যে করতাম'!

'তাঁর মিষ্টি কথা, সরল ব্যবহার ও ছোটদের মতো পরকে বিশ্বাস ও আপনবোধ দেখে সেই বাগদি স্ত্রী-পুরুষের প্রাণ ভালাবাসায় গলে গেল। তাদের মনে হল সারদা যেন তাদের কত জন্মের আপনার মেয়ে। বাগদি-বৌ স্বামীকে বললে, 'আমার মেয়ে এত রাতে আর চলতে পারবে না, থাকবার জায়গা দেখ'। পাশের তেলোভেলো গ্রামে এক দোকানে থাকবার ব্যবস্থা হল। মেয়েটি নিজের আঁচল পেতে তার পথে পাওয়া কন্যাটিকে শুতে দিল—আর পুরুষটি দোকান থেকে মুড়িমুড়কি কিনে এনে তাঁকে খেতে দিল। সারদাদেবী ছোট খুকিটির মতো শুয়ে শুয়ে খেতে লাগলেন।

'পরদিন সকালে তারা সারদাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে গেল তারকেশ্বরে। এক দোকানে তাঁকে বসিয়ে রেখে পুরুষটি গেল বাবা তারকনাথের পূজা দিতে ও সারদাদেবীকে ভাল করে খাওয়ানোর জন্য বাজার করতে। এদিকে তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর জন্য খুব ভাবনায় পড়েছিলেন এবং চারদিকে তাঁকে খুঁজছিলেন। দোকানের মধ্যে তাঁকে পেয়ে সকলে যখন খুব আনন্দিত, তখন বাগদি পুরুষটি ফিরল পূজা সেরে, প্রসাদ ও বাজার নিয়ে। সারদাদেবী সকলের সঙ্গে আশ্রয়দাতাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'যাত্রীর দল শ্রীশ্রীতারকনাথের পূজা দিলেন এবং আহার ও বিশ্রাম সেরে আবার বেরিয়ে পড়লেন বৈদ্যবাটীর দিকে। বাগদি স্বামী-স্ত্রীও কিছু পথ তাঁদের সঙ্গে এল। কেমনভাবে তারা সারদাদেবীর কাছে বিদায় নিল, সে কথা তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক।—একটি তো রাত। তার মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করে নিয়েছিলাম যে বিদায় নেবার সময় কাঁদতে লাগলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে এসে আমায় দেখে যেতে বার বার অনুরোধ করাতে আমার বাগদি-বাবা আসবেন বলে স্বীকার করলে অতিকষ্টে তাদেরকে ছেড়ে এলাম। আসবার সময় তারা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল এবং আমার বাগদি-মা পাশেরই ক্ষেত থেকে কতকগুলো কড়াইশুঁটি তুলে এনে আমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'মা সারদা, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলো দিয়ে খাস।'

রুমকি স্থির ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। নিচের থেকে কে একজন চিৎকার করছে, টেবিল এসেছে, টেবিল এসেছে! লম্বা লম্বা কাঠের টেবিলের অর্ডার দিয়েছিল রুমকি। কাপড় ছাপার কাজে লাগবে।

দুজনেই উঠে পড়লুম। আর সময় নেই বসে থাকার। শুরু হয়ে গেল কর্মের দিন। বেশ লাগছে এই ব্যস্ততা। জীবনের একটা নতুন মানে বেরিয়ে আসছে।

মা সারদা যেন অনুক্ষণ বলছেন ঃ

গৃহীদের বহিঃ-সন্ন্যাসের দরকার নেই। তাদের অন্তর-সন্ন্যাস আপনা হতে হবে। তবে বহিঃ-সন্ন্যাস আবার কারও কারও দরকার। তোমাদের আর ভয় কি? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে। আর সর্বদা জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন।

কেন সে আমাদের এত সাহায্য করছে? বেশ বড় একটা অর্ডার এনেছে। হাজার পিস শাড়ি সাতদিনের মধ্যে ছেপে দিতে হবে। কাপড় পার্টির, আমাদের কাজ শুধু ছেপে দেওয়া। লাভ ভালই। অর্ডারটা এনেছে হাতকাটা

শানু। এ পাড়ার কুখ্যাত মাস্তান। মুখে মদের গন্ধ। পরিষ্কার কথাবার্তা। তিন বছর আগে অ্যাকশান করতে গিয়ে ডান হাতটা কবজির কাছ থেকে নেই, উড়ে গেছে।

শানু কথা বলছে একটু দূরত্ব রেখে, 'ওস্তাদ! কাছে যাচ্ছি না, মালের গন্ধে তোমাদের অসুবিধে হবে। তোমার জন্যে একমাস লড়ে অর্ডারটা কব্জা করেছি। কাজটা ভালো করে কোরো।'

রুমকি চা আর নিমকি এনেছে। হাত নেড়ে বললে, সন্ধের পর ভদ্দরলোকে চা খায়? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও! এই মেয়েটাকে আমি আগে খারাপ চোখে দেখতুম। দু-একবার মালের মেজাজে প্যাঁকও দিয়েছি। মিথ্যে বলব না। তারপরে একদিন স্বপ্ন দেখলুম। আমার সেই হাত উড়ে যাওয়ার স্বপ্নটা লাইনের ধারে পড়ে আছি। চারপাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়া, আর রুমকি আমার মা হয়ে কাটা হাতে লাল একটা কাপড় জড়াচ্ছে। বলছে, ভয় নেই, তোর হাত আমি জুড়ে দোব। শেষ রাতের স্বপ্ন। ছাঁৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমটাকে আবার জোড়া লাগালুম। আবার স্বপ্ন। রুমকি আমাকে চামচে করে ভাত খাওয়াচ্ছে। পরপর তিনবার, একই স্বপ্ন। লে হালুয়া! পরের রাতে আবার! পরের রাতে একটা খারাপ জায়গায় আউট হয়ে পড়েছিলুম। সেই একই স্বপ্ন। তখন ভাবলুম, খারাপ চোখের জন্যে খারাপ মেয়ে আছে, দেবীর মতো একটা মেয়েকে কেন আমি কু-নজরে দেখব? আমি আমার ভগবানের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছি, রুমকির সেবা কর, তাহলে তোর ভাল হবে।'

রুমকি বলল, 'তাহলে মদ খাওয়াটা ছেড়ে দাও।'

'ওটা পারব না, তাহলে আমাকে অনেকদিন এই নোংরা পৃথিবীতে বাঁচতে হবে।'

এতক্ষণ আমি একটাও কথা বলিনি। অনুমান করার চেষ্টা করছিলুম, শানুর আসল চালটা কি?

যার আতঙ্কে পাড়ার দোকানপাট নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়। জানলার শার্সি, খড়খড়ি। মেয়েরা সব ঘরে ঢুকে পড়ে। সে একটা স্বপ্ন দেখে ভোগী থেকে যোগী হয়ে গেল! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য! রুমকি কি পরশপাথর? লোহাকে সোনা করে দিয়েছে?

প্রশ্নটা করেই ফেললুম, 'নোংরা কে করেছে, কারা করেছে?'

শানু একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসে বললে, 'নোংরা করেছে আমাদের নেতারা, আর আমাদের শুয়ার কি বাচ্চা পূর্বপুরুষরা। নিজের অবস্থা দেখে বুঝতে পারো না ওস্তাদ, আমাদের বাপঠাকুরদারা কি রকম গেঁড়ে ছিল!'

রুমকির আনা ট্রে থেকে চায়ের কাপটা অন্যমনস্কে তুলে নিতে নিতে শানু বললে, 'দাও, তোমার চা তো অমৃত, খেয়েই ফেলি।'

'বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, গরম এক কাপ করে আনি?'

'আরে ধুস, আমাকে অত খাতির কোরো না তো। যে কথাটা হচ্ছিল, আমার জীবনকাহিনীটা শুনবে? উপন্যাস-টুপন্যাস সব পানসে হয়ে যাবে। ক্লাস সেভেন অবদি আমি ক্লাসে ফার্স্ট হতুম। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোর্টে মামলা। ঠাকুর্দা উইল করে সব বড় ছেলেকে দিয়ে গেছেন। ব্যাটা বুড়োর পাপের শেষ ছিল না। নব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। ছ ফুট লম্বা, ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। জীবনের ধ্যান-জ্ঞান মেয়েমানুষ। বড় ছেলের বউকে নিয়ে বিছানায় যেতেন।

অমন সেবা নাকি আর কেউ করতে পারেনি! মল্লিকবাড়ির ভেতরের এইসব কথা অনেকেই জানে। প্রতিবাদ কেউ করেনি। সকলেরই আশা ছিল, বুড়োর পলিসি হবে—দিয়ো কিঞ্চিৎ, না করো বঞ্চিত! আরে বাবা, মেয়েদের কম ক্ষমতা! মনে নেই, হারকিউলিসকে নেড়া করে ছেড়ে দিয়েছিল! শরীরের ওপর উইল হয়ে গেল, গাড়ি, বাড়ি, বাগান সব বড় ছেলের। বাকিরা সব হারামজাদা। বাবা আমাদের নিয়ে পথে নামলেন। মামলা ঠুকলেন কোর্টে। আর আমার মা বড়লোকের আদুরী মেয়ে, বাবাকে বললে, তুমি লড়ে যাও, আমি চললুম বাগনানে বাপের বাড়িতে, সম্পত্তি উদ্ধার হলে ফিরে এসে ফুলশয্যা করব। আমার ফাইটার বাবাকে আমি ভালোবাসতুম। আমি থেকে গেলুম ফাদারের কাছে। বাপের বাড়িতে গর্ভধারিণী আমার ফুলবাগানে চাঁদের আলোয় প্রেমকাহানী শুরু করলেন। প্রেমিক নিজের মামাতো ভাই। কেস কেলেঙ্কারির! পানিফলের মতো প্রেমের ফল এসে গেল গর্ভধারিণীর গর্ভে। তিনি আমডালে ঝুলে পড়লেন আধহাত জিভ লকলকিয়ে। বাবা সেই দুঃখে ধর্মের লাইনে না গিয়ে মদের লাইনে চলে গেলেন। মন যখন ভীষণ হুহু করত তখন চলে যেতেন বেহালাপাড়ার লাল বস্তিতে। সেখানে একজন মেয়েছেলে ছিল, যাকে নাকি অবিকল আমার মায়ের মতো দেখতে ছিল। যেটুকু ছিল, তিন ছটাক জমি,

কয়েক পাটি গয়না, সেই ডোবায় ডুবে গেল। সর্বাঙ্গে সিফিলিস। লিভার শেষ বুকে যক্ষ্মা, রায়বাহাদুরের ছেলে পটল। তবে হ্যাঁ, বেশ্যা হলে কি হবে, তার দিল ছিল। আমাকে মানুষ করার চেষ্টা করেছিল বহুৎ। তার কাছে এক শিক্ষক আসতেন দেহ-জ্বালা জুড়োতে। শর্ত ছিল, আমাকে এক ঘণ্টা পড়াবার পর তবেই কাজ শুরু হবে। সে-ই আমার স্কুলের মাইনে দিত। ক্লাসে ছেলেরা খেপাত ছড়া কেটে।

আসল মা পালিয়ে গেল
বাপ মরল পথে
বেশ্যাবাড়ির দালাল
এখন সারেগামা সাধে।।

একদিন তিনটেকে বেধড়ক দিলুম। একটার ওপরের পাটির সব কটা দাঁত খুলে পড়ে গেল। সাতদিন শুয়ে শুয়ে জলসাবু। হেডমাস্টারমশাই রেগে গিয়ে, এম এ., পি আর এস, পি এইচ ডি ভুলে হুকুম দিলেন, খচ্চরটাকে উলঙ্গ করে বেধড়ক পেঁদা। দুটো বিহারী দারোয়ান তেড়ে এল দু'দিক থেকে, আমি ঝুল কেটে পগারপার!

শানু—আমি বলি গ্রেট শানু। মদের ঘোরে আমাকে একদিন বললে, 'দোস্ত বড়লোক হতে চাও?

বললুম, 'ইচ্ছে করে। অনেক বড়লোক অনেক ভাবে আমাকে হেনস্তা করেছে। আধপেটা, উপোস আমার কাছে কিছুই না। গা-সহা ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, সৎপথে বড়লোক হতে চাই।'

—হবে না ইয়ার, সোনার পাথরবাটি হয় না। সৎপথে ডাল, রোটি খাও, হরিকে গুণ গাও। বড়লোক হতে হলে ছোটলোক হতে হবে। দুনম্বর না করলে এক নম্বর হওয়া যায় না। আন্ডারস্ট্যান্ড?

—তা হলে থাক।

—আমিও সেই কথাই বলি। আমার কত আছে জানো?

—না, আমি কী করে জানব?

—দেখে কী মনে হয়?

—কিস্যু নেই।

—ভুল, ভুল, তোমার ধারণা ভুল। বাইরেটা আমার লোফারের মতো, ভেতরে আমি সম্রাট। সামনের ওই মার্কেট কমপ্লেক্সটা আমার। অবশ্যই বেনামে। আমার তিনটে মদের দোকান। দুটো লাক্সারি বাস দূরপাল্লার ভাড়া খাটে। দুবাইতে আমার ঘাঁটি আছে। বুঝে নাও কত টাকা! কিন্তু চালচলনে অহঙ্কারী বড়লোক হতে পারিনি। ঘেন্না করে ঘেন্না! অন্য লোককে, আমার চামচাদের স্কচ খাওয়াই, নিজে খাই বাংলা। খাটিয়ায় সুই, খাটে শুলে ঘুম আসে না। পান্তা-পেঁয়াজ আমার কাছে বিরিয়ানির চেয়ে মনপসন্দ। শোনো, আমার একটা প্ল্যান আছে, তোমাদের এই ছাপাই কাপড়ের কারখানাটাকে আমি ইন্টারন্যাশন্যাল করব।

—মানে?

—মানে গাঁইয়া কারবার চলবে না, একেবারে মডার্ন। কম্পিউটার ডিজাইন। অফসেট প্রিন্টিং, টাই অ্যান্ড ডাই। বেশীর ভাগটাই এক্সপোর্ট।

—সে সব কীভাবে হবে?

—সে ভাবনা আমার। টাকায় হবে। এক্সপার্ট আসবে। কাপড় আসবে সরাসরি মিল থেকে। রেডিমেড গার্মেন্টসও তৈরি হবে।

—তারপর আমাদের কী থাকবে?

—আমাদের মানে?

—মানে, আমার আর রুমকির?

—এই আমাদের মধ্যে আমি নেই, তাই না?

—তুমিই তো সব করছ, তোমার মধ্যে আমরা থাকব তো! বড়রা ছোটকে দিলে হজম করে ফেলে।

—কথাটা তুমি কিছু খারাপ বলোনি। ইচ্ছে করলে আমি তা করতে পারি। আবার এও করতে পারি, তোমাদের পাশে আমি আমারটা খুলে তোমাদেরটার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি, তবে তা করব না। কেন করব না বলো তো?

—তুমি মহৎ, তুমি আমাদের ভালোবাসো।

—তোমার মাথা! শোনো, সত্যি কথাটা পরিষ্কার করে বলা ভালো, তোমাকে নয়—ভালোবাসি রুমকিকে। প্রথমে ভালোবাসতুম না।

শানুর কথা ক্রমশ জড়িয়ে আসছে। সোজা হয়ে বসতে পারছে না, এলিয়ে পড়ছে। চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে এসেছে। ফর্সা রঙ, মুখটা টকটকে লাল। ঠোঁটে সিগারেট। লাইটার দিয়ে ধরাবার চেষ্টা করছে, হাত কাঁপছে। শেষে সিগারেটটা দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাতাসে শীতের কামড়। আরো একটু আধশোয়া হয়ে শানু বললে, 'প্রথমে আমি ভালোবাসিনি। ভালোবাসা কাকে বলে আমার জানা ছিল না। আমাকে কেউ ভালোবাসত না, আমিও কারোকে ভালোবাসতুম না। শয়তান ভালোবাসে না, প্রেম ভগবানের, প্রেম শ্রীকৃষ্ণের। তা হলে?'

আমিও বললুম, 'তা হলে?'

—তা হলে কী, জবাব দাও!

—আমি কী বলব শানু, এটা তো তোমার ব্যাপার।

—না, এটা সকলের ব্যাপার। সমাজের সমস্যা। প্রেম নয়, দেহ। রুমকিকে আমি চাই, কয়েক রাত্তিরে জন্যে। তারপর গলা টিপে মেরে খালের জলে।

—সে কী, এই যে বললে, তুমি ভালো হয়ে গেছ?

—আরে, এটা দেখি রামছাগল! তিন বছর আগে আমি এই ছিলুম। আর আজ? আজ কী?

—আজ কী?

—আরে, এটা একটা আস্ত গাড়োল! প্রশ্ন করলে প্রশ্নটাই ফিরিয়ে দেয়। এখন আমি প্রেমিক। আমি রুমকিকে ভালোবাসি। তুমি বিয়ে করলেও রুমকি আমার বউ। সে আমার কাছ থাকে, আমার হৃদয়ের বুকপকেটে। পায়ে কী আছে?

—পায়ে কী আছে মানে?

—পায়ে কী পরে আছে?

—চটি।

—খুলে আমার দু'গালে মারো পটাপট।

—কেন?

—পরস্ত্রীকে ভালোবাসার অপরাধে। আর নিঃস্বার্থ নয়, স্বার্থ। ভালোবাসি বলেই আমার সব কিছু দিয়ে যাব। আর একটা অনুরোধ, মরার সময় রুমকি যেন আমার কপালে তার ঠাণ্ডা হাতটা রাখে, আমি 'আ' বলে

চলে যাব।

—তোমার মৃত্যু! কে যায় আগে, কে যায় পরে।

—বড় জোর আর একটা মাস। লিভারে ক্যানসার।

—ক্যানসার! যার লিভারে ক্যানসার, সে বোতল বোতল মদ খাচ্ছে?

—অ্যায় চোপ। মদের মহিমা তুমি কী জানো ছোকরা? যে মরবে তার আবার অত বাছবিচার কিসের? আরো, আরো খাবো, পারলে কালই মরব। কোল পেতে আছেন আমার মা। কোন মা? গর্ভধারিণী। আরে না, জগজ্জননী। তোমার বিশ্বজোড়া কোল পাতা মা, আমি বসে আছি সেই কোলে।

শানুর গানের গলা যে এত ভালো জানা ছিল না একটা লাইনই গাইছে বারে বারে, 'তোমার বিশ্বজোড়া কোল পাতা মা, আমি বসে আছি সেই কোলে।'

রাত নামছে। অমাবস্যার অন্ধকার। আকাশে কে ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠো মুঠো তারা। রুমকি রান্নায় ব্যস্ত। এপাশ ওপাশ ছোটাছুটি করছে। যখন সে আমার বউ হয়নি তখন আমার দৃষ্টি ছিল একরকম। এখন অন্যরকম। তখন ছিল আকর্ষণ। একটা দেহ। আমরা কামনা বাসনায় সিক্ত। এখন সমর্পণ। নির্ভরতা। আত্মার আত্মীয়। অংশে অংশ মিলে বিপুল এক পূর্ণতা। ছিলাম শূন্য, হয়েছি পূর্ণ। সে তো এখন! আগে? আগে আমার সঙ্গে শানুর তো কোনো তফাৎ ছিল না। শানু প্রকাশ করে, আমি করি না। আমি সাধু নই, শয়তান। শানুই সাধু। কেন? সে মনমুখ এক করতে পেরেছে।

পৃথিবীতে এই পুরুষ জাতটাই মহাসর্বনাশের। মেয়েদের উচিত নয় এদের বিশ্বাস করা। মেয়েদের টেনে পাঁকে নামায় পুরুষরাই। প্রেম করে বিয়ে করে না। করলেও অত্যাচার করে। মেরেও ফেলতে পারে।

কিছু একটা চাপিয়েছে, সময় লাগবে হতে। সেই ফাঁকে রুমকি এসেছে।

সবাই বলছে, রুমকি সন্তানসম্ভবা। চেহারায় তাই সুন্দর একটা ঢল নেমেছে। বর্ষার শেষে টলটলে দীঘির মতো। আমরা দুজনে এই নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছি না। হতেই পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক।

রুমকি আমার একেবারে পাশটিতে এসে বসল। এই সময়টায় মেয়েদের খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সারারাত আমার বুকের কাছে

কেমন শুয়ে থাকে নিশ্চিন্ত আরামে। ব্রহ্মচারী হলে ভগবানকে পাওয়া যায় চটপট, আর গৃহী হলে পাওয়া যায় প্রেম। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে প্রার্থনা, ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম। হে দেবি। মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরমা ভার্যা দাও।

রুমকি বললে, 'শীতটা এখনো ঠিক তেমন পড়ছে না।'

—ওই দিনচারেক। মানুষের গরমে শীত তেমন পড়ে না আর।

—শোনো, একটা কথা কদিন ধরে ভাবছি।

—কী কথা?

—একই বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

—অনেক সাহায্য, অনেক উপদেশ তো পাওয়া যাচ্ছে।

—সে সব এমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে উপদেশের ঠেলায় জীবন বেরিয়ে যায়। আমি বলি কী, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

—নিজেদের বাড়ি ছেড়ে যাবে কোথায়?

—শানু বলছিল, বদলাবদলি।

—বদলাবদলি মানে?

—একটু ভেতরদিকে একটা বাগানবাড়ি আছে। সেইটার সঙ্গে এটাকে বদলে নেওয়া যায়। ওরা এখানে একটা মার্কেট করবে।

—শানু কীভাবে ঢুকছে দেখছ? এতকাল তোমার দিকে নজর ছিল, এইবার ব্যবসা আর বাড়ি। তিনটেই ছিনিয়ে নিতে চাইছে। বুজেছি, পথের মানুষকে আবার পথেই নামতে হবে। আমার শ্মশানই ভাল। যাই বলুক, শানু তোমাকে ছাড়বে না। টাকার কুমীর, দলবল আছে। ওর কাছে আমি ছারপোকা। টিপে মেরে ফেলবে। খুনও হয়ে যেতে পারি। তুমি শানুকেই কেন বিয়ে করলে না! আমি তো একটা অপদার্থ। বসে বসে কেবল ভাবি। আমি বাক্যবীর, শানু কর্মবীর। শোনো তোমাদের চক্রান্তটা ধরে ফেলেছি। তুমি আর শানু যত চেষ্টাই করো এই বাড়ি থেকে আমাকে হঠাতে পারবে না। এই বাড়ি আমার কাছে তীর্থ। আচ্ছা, তোমার পেটে কার বাচ্চা? আমার না শানুর?

রুমকির পাশ থেকে এক ঝটকায় নিজেকে তুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। রাত হয়েছে। লোক-চলাচল কমে এসেছে। ভেতরটা ঈর্ষায় পুড়ে যাচ্ছে। খাটের ওপর রুমকি বসে আছে স্থির হয়ে। চোখ দুটো পাথরের

মতো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কাছে যাই, ক্ষমা চাই। এই আমার প্রথম আঘাত। এক আঘাতেই সব চুরমার। আমার নোংরা মন আমি দেখিয়ে ফেলেছি। একবার উলঙ্গ হলে আর ঢাকাঢুকির কী অর্থ?

তবু ঘরে ফিরে গেলুম। রুমকির কাঁধে হাত রেখে ডাকলুম 'রুমকি!' হাতটা ধীরে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা ঘোরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। পাড়া নিস্তব্ধ। বিরাট একটা ঝড় আসার আগে যেমন হয়। ঘরের একপাশে পাট পাট করে সাজিয়ে রাখা সদ্য ছাপা শাড়ি। রঙের গন্ধ।

আবার আমি একা! এখন আমি কী করব?

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল ছাঁত করে। একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ আসছে নাকে। পাশটা খালি, রুমকি নেই—উঠে গেছে। রাত এখন কটা? ভোর হয়ে গেল কী? বেরিয়ে এলুম মশারির ভেতর থেকে। বেশ একটা উত্তাপের আঁচ গায়ে লাগছে। যজ্ঞবাড়ির ভিয়েন বসল নাকি?

—রুমকি!

সাড়া নেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। সর্বনাশ!

—রুমকি?

সাড়া নেই, আগুনের সাঁই সাঁই শব্দ। দরজাটা ঝলসে ক কয়লার মতো হয়ে যাচ্ছে। চুলের মতো সরু আগুনের রেখা হিল হিল করে উঠছে এখানে ওখানে।

—রুমকি?

দরজাটায় ধাক্কা মারতেই সপাটে খুলে পড়ে গেল। আগুনের জিভ বেরিয়ে এল লকলক করে। রুমকি পুড়ছে। ঝলসে কালো হয়ে গেছে। বেঁকে গেছে ধনুকের মতো।

ঝাঁপাতে গিয়েও ঝাঁপাতে পারলুম না। আগুনের ভয়। আবিষ্কার করলুম, প্রেমের চেয়ে মানুষের আত্মরক্ষার তাগিদ প্রবল। বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিক থেকে পিছিয়ে আসছি। বাথরুমের ভেতরটা পুড়ে ছারখার। গনগনে আগুন!

আমার রুমকি পুড়ে কাঠকয়লা। প্রেমের চেয়ে ভয় বড়। রান্নাঘরে

আধবালতি মাত্র জল। কলে এখন জল নেই। আসবে সেই ভোরে। এ আগুনের আমি কিছু করতে পারব না। রুমকি তো মরেই গেল, আমি বরং স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকি।

ওদিকে সে জ্বলছে, আমার প্রেম। আর রাতশেষের ফিকে অন্ধকারে রাস্তায় ছুটছে ভীরু পলাতক।

—তুই যাবি কোথায়?

—কেন, শানুর কাছে! আমার চেয়ে সাহসী। দশ-বিশটা মানুষ খতম করেছে।

—সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

—এখন আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। সে চলে গেছে।

—শানুর বাড়ির সামনে ছোটখাটো একটা জটলা। ভোরের ফিকে আলোয় একদল কালো কালো মূর্তি।

—শানু কোথায়—? শানু?

—রাত দুটো চল্লিশ মিনিটে শানু মারা গেছে।

—শানু মরে গেল। কপালে ঠাণ্ডা হাত রেখেছিল?

—কে রেখেছিল?

—আমার বউ রুমকি।

—এ পাগলটা কোত্থেকে এল?

—আচ্ছা, ওরা কী দুজনে একসঙ্গেই গেল?

—আরে এই, এটা পাগলামি করার জায়গা নয়।

—কে, কে? মেরে তাড়া না!

—আরে এটা সেই ভেণ্ডিটা।

কে একজন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। সবাই খাট, ফুল, মিছিলের কথা বলছে, দোকানপাট বন্ধের কথা বলছে। রুমকি কী জানত শানু চলে যাচ্ছে? শানু কী জানত রুমকি চলে যাচ্ছে?

—আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? এবার তোমাকে কে বাঁচাবে? থানা, পুলিশ, পোস্টমর্টেম? কত টাকা আছে? খাওয়াতে হবে! ওই বাড়িতে আর থাকতে পারবে? সর্বত্র তার স্মৃতি ছড়ানো। ওই পোড়া দেহটাকে জড়িয়ে ধরতে পারবে—পারবে ধরতে? বেঁচে থাকার অনেক দায়। দেহযন্ত্রে বন্ধ খাঁচায়, পঞ্চভূতে তোমায় নাচায়। সবাই তো চলে গেল, তুমি কেন পড়ে

আছ? তুমিও যাও! চলে যাও—যা পাওয়া যায় সে তো দেখলে। এক ছটাক সুখ তো তিন ছটাক দুঃখ। পালাও। জীবন মানেই যন্ত্রণা, তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া। মৃত্যুই হল শীতল শান্তি। কে বলেছে আগুন দগ্ধ করে? দহনেই মুক্তি, দহনেই শান্তি। নিজেকে আহুতি দাও। যেতেই যখন হবে এখুনি যাও। ওদের একা ছেড়ো না, তুমিও সঙ্গে যাও।

সময়টা হল সকাল, কলকাতার কাছাকাছি কোনও একটা পল্লী। মানুষের কলকোলাহলে জেগে উঠেছে। একালের একটি হাউসিং এস্টেট। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বিশ্রী বাড়ি। ওইরকমই একটি বাড়ির প্রবেশমুখ, সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। অপরিচ্ছন্ন, জীবনে ঝাঁট পড়ে না। চারপাশে গোটাকতক আধমরা গাছ। এক একরকম চেহারার মানুষ ঢুকছে-বেরোচ্ছে। চারপাশে বাড়ি, মাঝখানে টাক-পড়া খোলা একটা মাঠ। কোথাও পড়ে আছে প্লাস্টিকের ব্যাগ, কোথাও পড়ে আছে আইসক্রীমের কাপ। পাঁচমিশেলি আবর্জনার ছড়াছড়ি। এই মাঠেই মর্নিংওয়াক করছেন শৌখিন এক বৃদ্ধ। পরিধানে ধপধপে সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি। হাতে একটা বাহারি ছড়ি। সাঁই করে একটা সাইকেল চক্কর মেরে চলে গেল। আরোহী এক যুবক। ফ্ল্যাটের একদিকে একতলার সংলগ্ন একচিলতে জমিতে আর এক প্রবীণ মানুষ বাগান করার ব্যর্থ চেষ্টা নিত্যদিনের মতো আজও করছেন। হাতে খুরপি, মাঝে মাঝে নিচু হচ্ছেন। পরে পরেই সোজা হয়ে এক হাত দিয়ে কোমরের পিছন দিকটা চেপে ধরছেন। ভদ্রলোকের নাম নিত্যানন্দ। যিনি বেড়াচ্ছেন তাঁর নাম পরমানন্দ।

নিত্যানন্দ নিজের মনেই বলছেন, এই কোমর! সারাটা জীবন ভুগিয়ে গেল। নিচু হলে কনকন, সোজা হলে খটাস।

পরমানন্দ রাউন্ড দিতে দিতেই শুনলেন। বাগানের বেড়ার কাছাকাছি এসে বললেন, এসব নেগলেকটের ফল, কোমর হল কব্জা। তাকে কব্জায় রাখতে গেলে যোগাসন করতে হয়, রোজ ভুজঙ্গাসন কর, উপকার পাবে। ভোগটাই শিখলে, যোগটা শিখলে না। আমাকে দেখ, এই বয়সেও ফিট।

নিত্যানন্দ একটু হেসে বললেন, শুধু ফিট নয়, ফিটফাট। তুমি ভাই ব্যাচেলার মানুষ সংসারীদের শতেক জ্বালা। রিটায়ার করার পর সাহেবী কায়দায় গার্ডেনিং শুরু করলাম। না হল গার্ডেন, না গেল কোমরের

বার্ডেন। আচ্ছা, টেলিভিশনের মেয়েগুলো অমন কোমর দুলিয়ে নাচে কী করে? আমি সেদিন বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেছিলুম, তিনদিন শয্যাশ্যায়ী।

পরমানন্দ বললেন, তোমার যেমন বুদ্ধি, কোমরে বল-বিয়ারিং ফিট না করলে ও নাচ নাচা যায় না। তুমি বিকেলে এসো, ভুজঙ্গাসন প্র্যাকটিস করাব।

পরমানন্দের কথা শেষ হতে না হতেই ভিতর থেকে ভেসে এল এক আর্ত নারীকণ্ঠ, শিগ্‌গির এসো, খোকা দরজা খুলছে না। নিত্যানন্দ খুরপি ফেলে ভিতরের দিকে দৌড়লেন। পরমানন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিত্যানন্দের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন। নিত্যানন্দের ফ্ল্যাটের একটি ঘর দরজা-বন্ধ, বাইরে সবাই—নিত্যানন্দের স্ত্রী মালিনী, মেয়ে পূর্ণা।

নিত্যানন্দ—দরজা খুলছে না, ধাক্কা মেরেছ?

মালিনী— অনেকবার।

নিত্যানন্দ— অনেকবার! তাহলে কী হবে?

নিত্যানন্দের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ছড়ি হাতে পরমানন্দ। তিনি ছড়ি দিয়ে দরজায় টোকা মারতে মারতে বললেন, দরজা ভাঙতে হবে। সাইকেলে যে ছেলেটি বাইরে পাক মারছিল তার নাম মোহন। হইচই শুনে সেও ঢুকে পড়েছিল। কেউ লক্ষ্য করেনি। মোহন বললে, দাঁড়ান কাকাবাবু, ভাঙার আগে আমি বাইরের জানালা দিয়ে দেখে আসি। মোহন চলে যেতেই পরমানন্দ বললেন, এ স্কাউন্ড্রেলটা কোথা থেকে এল? পূর্ণা ভুরু কুঁচকে বলল, স্কাউন্ড্রেল বলছেন কেন? পরমানন্দ মেঝেতে ছড়ি ঠুকে বললেন, কেন বলব না। এমন কোনও পাপ নেই যা করেনি। মোহনকে আসতে দেখে নিত্যানন্দ বললেন, চুপ চুপ, আসছে। মোহন এসে বলল, ঘরে কেউ নেই, এমটি। সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন, তাহলে! মোহন দরজার ওপর দিকটা দেখিয়ে বললে, তাহলে এই, দরজার ওপর দিকে তাকান। বাইরে থেকে ছিটকিনি তোলা। পরমানন্দ এতক্ষণের সমালোচনা ভুলে বলে উঠলেন, রাইট ইউ আর। তোমার চোখ আছে, আমাদের থেকেও নেই। মোহন বললে, আপনারা এত ভয় পেলেন কেন? ভাবলেন, আত্মহত্যা করেছে। তাই না?

মালিনী বললেন, ছেলেটা বড় ডিপ্রেশানে ভুগছে। পরমানন্দ একটু

তিরিক্ষি গলায় বললেন, একালের এই এক ফ্যাশন হয়েছে। যৌবন আর ডিপ্রেশন। আমাদের কালে এসব ছিল না। নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন, আমাদের কালে টিভিও ছিল না, কম্পিউটারও ছিল না। পরমানন্দ বললেন, এর জন্য প্রয়োজন মেডিটেশন ও প্রাণায়াম। এক দুই তিন চার, চার তিন দুই এক, ভ্রমণ প্রাণায়াম। কুম্ভক নেই। একেবারে ফিতে মাপা শ্বাস-প্রশ্বাস। মনের সব বিক্ষিপ্ততা হাওয়া। যাই, আমার ফিফটি রাউন্ড এখনও বাকি। পরমানন্দ বেরিয়ে যেতেই পূর্ণা বললে, মোহনদা, দাদার কী হয়েছে জান তুমি? মোহন বললে, জানি। নিত্যানন্দ ও মালিনী একসঙ্গে বলে উঠলেন, জান তুমি? মোহন বেশ গম্ভীর গলায় বললে, এপাড়ার সকলের সব খবর আমি জানি। আমি এক যাযাবর, আমি এক টিকটিকি। দেওয়ালে দেওয়ালে আমি ঘুরি। মালিনী দুঃখের গলায় বললেন, আমাদের কিছুই বলে না। তুমি জান তো বল না। মোহন বললে, আমি বলাবলির মধ্যে নেই। আমার হল কার্য-কারণ, কারণ-কার্য, খোকা আমার বন্ধু জ্যাঠামশাই।

মালিনী অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লেন, সেই মেয়েটা? মোহন একটু বাঁকা হেসে বললে, কোনও মেয়ের জন্য কোনও ছেলে একালে বিষ খাবে না। সে হত অতীতে, ইতিহাসে। হীর-রণঝা, লায়লা-মজনু, শাহজাহান-তাজমহল। জ্যাঠাইমা, কারণ অন্য। পূর্ণা প্রাথমিক উত্তেজনাটা কেটে গেছে দেখে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, মোহনদা, চা খাবে? মোহন বললে, না, আমি কোনও বাড়িতে চা, জলখাবার, ভাত খাই না। চায়ের দোকান, হোটেল আমার জায়গা। একবারই চা খেয়েছিলাম এক বাড়িতে। পরে জানতে পারলুম, তারা কাপটা ফেলে দিয়েছিল। ভেবেছিল, আমার মতো একটা জঘন্য ছেলের জঘন্য ডিজিজ থাকাই স্বাভাবিক। ভদ্দরলোকেদের ব্যাপারই আলাদা ভাই, তাই সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারা জীবন আমি যেন ছোটলোকই থাকি।

রাত হয়েছে গুপীর চায়ের দোকান। বাইরে রোল ও চাউমিনের ঠেক। সেখানে গুপীর যৌবনবতী বউ সামাল দিচ্ছে। চেহারার চটকও আছে,

প্রদর্শনও আছে। এপাড়ার সোফিয়া লোরেন, সবাই সোফিয়া বলেই ডাকে। দোকানের ভিতরে একটা গুলতানি, তার মধ্যে মোহনও আছে। প্রশান্ত চোখে একটা ঠাকুর্দা মার্কা চশমা পরে খুব জ্ঞান দিচ্ছে। প্রশান্ত বলে তাকে কেউ আর ডাকে না। বলে জ্ঞানদা।

প্রশান্ত খুব গম্ভীর মুখে বলছে, ভারতের এখন যা অবস্থা, তাতে সব অচল হয়ে যাবে। একটা পরিবর্তন চাই। সর্বত্র দুর্নীতি, পটলে দুর্নীতি, আলুতে দুর্নীতি, চায়ে দুর্নীতি—কোনও কিছুতেই কিছু নেই। মানুষে মানুষ নেই, পুকুরে মাছ নেই।

মোহন বললে, কুকুরে কিন্তু কুকুর আছে। খেতে দিলে লেজ নাড়ে, ইট মাড়লে কেঁউ কেঁউ করে।

প্রশান্ত বললে, এই মানুষ ছাড়া আর সব ঠিক আছে। কোনও বাবা কুকুর বলবে না, আমার ছেলে-মেয়েরা আগের মতো নেই। নো জেনারেশন গ্যাপ।

হঠাৎ একটা ছেলে ঢুকল, সামান্য একটু উত্তেজিত। তাকে দেখেই মোহন বললে, কী হল রে? অমন চনমন করছিস? বাঘ বেরিয়েছে? ছেলেটি বললে, মধুচক্রে পুলিশ হানা। মোহন জিজ্ঞাসা করল, কী অপরাজিতায়? ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, বউদি, ক্যাচ-কট-কট। প্রশান্ত দার্শনিকের মতো বলে উঠল, ঘরে ঘরে ব্রথেল, যুবসমাজ জাগো, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। মোহন বললে, ধপ্পাস্ করে শুয়ে পড়। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, ক' জোড়া? ছেলেটি বলল, তিনজোড়া। প্রশান্ত বলল, খোঁজ নিয়ে দেখ, সব টিন-এজার। বুঝলে এ বাজার অর্থনীতি দেশটার বারোটা বাজাবে। লোভ, লোভ, বাইবেলে আছে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

গুপী চায়ে চিনি গুলতে গুলতে বললে, না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরাই ভাল। মরতে তো হবেই। প্রশান্ত বললে, তোমরা খাচ্ছ না, তোমার বউকে কী মধুচক্রে যেতে হচ্ছে। গতর খাটিয়ে খাচ্ছ। তোমরা হলে উজ্জ্বল উদাহরণ। মোহন তোমার কী মত?

মোহন বললে, পৃথিবীটাকে আরও একটু বুঝি তারপর বলব, কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক। আপনার টিউটোরিয়াল হোমের কী হল? সেই প্রশ্নপত্র আউট। গুপী চায়ের কাপ সাজাতে সাজাতে বলল, আ মোহন, তোমার এই এক বদ অভ্যাস, মানুষের লেজে পা দেওয়া।

প্রশান্ত বললে, না, না, ও ঠিক বলেছে, আমরা সবাই অসৎ। আমি টিউটোরিয়াল তুলে দিয়েছি। আমি সৎ হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মোহন, তুমি কী সৎ?

মোহন বললে, না, আমি একশো ভাগ অসৎ, এক অ্যান্টিসোশ্যাল।

প্রশান্ত বললে, আমি তা মনে করি না, তুমি সাহসী। তুমি যা তুমি তাই। তোমার মধ্যে অভিনয় নেই। প্রশান্ত সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই পকেটে ভরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। মোহন বললে, প্রশান্তকে আমরা জ্ঞানদা বলি, মানুষটা কিন্তু বেঁচে আছে। কিছুক্ষণ পরে মোহনও বেরিয়ে গেল। রোলকাউন্টারের সামনে সোফিয়া বললে, রাতে আসছ তো? মোহন বললে, না এলে খাব কোথায়? সোফিয়া জিজ্ঞাসা করলে, চললে কোথায়? মোহন বললে, সমাজসেবায়। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

একটা অন্ধকার ঘুপচি মতো জায়গা। কালো কালো গোটাকয়েক সিল্যুয়েট। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট হচ্ছে চেহারা। সেই অন্ধকারে মোহন প্রবেশ করল। কে যেন একজন বলে উঠল, মোহনদা। মোহন জিজ্ঞাসা করল, এখানে খোকা এসেছে? কণ্ঠস্বর বলল, না। মোহন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল, গেল কোথায় সকাল থেকে, সত্যিই স্যুইসাইড করল নাকি? কণ্ঠস্বর বললে, করতে পারে। দু'লাখ টাকা চোট হয়ে গেছে। মোহন বললে, মানে? কণ্ঠস্বর বললে, তুমি জান না, সব খবরই তো রাখ। মোহন বললে, আমি একটা খবরই রাখি। পূর্ণা আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ভালবাসা আমার মধ্যে নেই। ভালবাসার চেয়ে ভাল একটা বাসা একালে অনেক দামি। ভালবাসা নয় ভাল বাসা। এক প্রোমোটার আমার পিছনে লেগেছে। বলছে, অনন্তদের বাড়িটা ম্যানেজ করে দিতে পারলে নগদ তিন লাখ ও ফ্রি একটা ফ্ল্যাট তিনতলায়। কণ্ঠস্বর বললে, করে দাও। ওরাও তো মোটা পাবে। মোহন বললে, বাড়িটার ইতিহাস জানিস? গান্ধীজি তিন দিন কাটিয়েছিলেন। তার আগে সি আর দাশ ওখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিটিং

করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ আসতেন। ওটা জাতীয় সম্পত্তি। একটা মন্দির। প্রতিটি ইঁটে লেখা আছে বিপ্লবের কাহিনী। ওখানে পায়রার খোপ করে স্বার্থপরদের সংসার বসাবে?

কণ্ঠস্বর বললে, তোমার ইতিহাস-ভূগোল রাখ, টাকাই সব। এই যে আমার বাবার বাইপাস করাতে হবে। দেড় থেকে দু'লক্ষর ব্যাপার। এই মাসের মধ্যে নামাতে না পারলে মন্ত্র পড়তে হবে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম। মাকে বললুম, বের কর তোমার গহনাপত্র। অনেক হাঁটকা-হাঁটকির পর লেংটি ইঁদুরের লেজের মতো একটা হার বেরোল। সে কী গো এই তোমার অবস্থা। বোনের বিয়েতে গহনা গোত্রান্তর হয়ে গেছে। তোমার ওই প্রোমোটারকে আমার দিকে ঠেলে দাও, এক সপ্তাহের মধ্যে ওই ইতিহাসে বর্তমানের স্ট্রাকচার তুলে দেব। অ্যাডভান্স দু'লাখ।

মোহন বললে, কাকাবাবুর বয়স হল কত?

কণ্ঠস্বর, পঁয়ষট্টি।

মোহন বললে, ম্যাক্সিমাম। নড়বড়ে আরও ধর পাঁচ বছর। সত্তর। এই পাঁচটা বছরের দাম দু'লাখ। ভেরি কস্টলি। চোখ, হাঁটু, গাঁটের কী হাল?

কণ্ঠস্বর, গ্লুকোমা, আরথ্রাইটিস।

মোহন বললে, এবার ছুটি করে দে।

কণ্ঠস্বর, যায় না। হৃদযন্ত্র খুব দুর্বল। মাটির মা দুর্গাকে বিসর্জন দিতে চোখে জল আসে।

মোহন বললে, দু'লাখ পাবি কোথায়?

কণ্ঠস্বর বললে, ওই প্রোমোটার। এক্স জমিদারের চার ছটাক জমি।

মোহন বললে, যাবি কোথায়?

কণ্ঠস্বর, একটা খুপরি তো মিলবে।

মোহন বললে, তোর জুতোর ব্যবসার কী হল?

কণ্ঠস্বর, ক্যাপিটাল নেই।

মোহন জিজ্ঞাসা করল, চাকরি?

কণ্ঠস্বর, চাকর আছে, নো চাকরি।

মোহন জিজ্ঞেস করল, উপায়?

কণ্ঠস্বর বললে, নিরুপায়।

অদূরেই বড় রাস্তা। মাঝে মাঝে গাড়ি চলে যাচ্ছে হু-হু শব্দে। হেডলাইটের একঝলক আলোয় অন্ধকারের চরিত্ররা স্পষ্ট হতে না হতেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই আলো-আঁধারিতে ত্রস্ত নারী-কণ্ঠস্বর, দাদা এখানে আছিস?

কণ্ঠস্বর বললে, কী হল? তুই এখানে? বাবা?

নারীকণ্ঠ, না, দিদিকে থানায় নিয়ে গেছে।

কণ্ঠস্বর, কেন?

নারীকণ্ঠ, দিদি ওখানে ছিল।

কণ্ঠস্বর, কোন্‌খানে, পথ অবরোধে?

নারীকণ্ঠ, না, ওইখানে।

অন্ধকারে মোহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বুঝতে পারছিস না কেন? রেবাদের ফ্ল্যাটে, মধুচক্রে।

কণ্ঠস্বর, মাকে বল, একটা দড়ি নিয়ে যেতে, গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ুক।

মোহন বললে, কেন? এই তো জ্ঞান দিচ্ছিলিস, টাকাটাই সব। কল্যাণী তুই বাড়ি যা, আমি দেখছি।

পাড়ার নেতা বিধান বোসের ডেরা। বিধান আর মোহন মুখোমুখি।

বিধান।। মোহনানন্দ আনন্দেই আছ। একটু ভুঁড়ি নেমেছে মনে হচ্ছে।

মোহন।। উদুরি হচ্ছে দাদা।

বিধান।। কী কারণে অধমের কাছে আগমন?

মোহন।। সেবার তোমার রাইভ্যাল মুকুন্দের জিওগ্রাফি পালটে দেবার পর তুমি বর দিতে চেয়েছিলে রাজা দশরথ। কৈকেয়ী এখন বর চাইতে এসেছে। টেলিফোনটা তোল।

বিধান।। তুলে?

মেহান।। থানায় ও.সি.-কে বল, রেবাদের ঠেক থেকে মাধুরী বলে যে মেয়েটাকে তুলে এনেছে তাকে যেন ছেড়ে দেয়।

বিধান।। মাধুরী কে?

মোহন।। কল্যাণ চৌধুরীর বড় মেয়ে।

বিধান।। লাইনে নেমে পড়েছে?

মোহন।। না। অবশ্য রটে যাবে সেইরকম। মাধুরী বিউটিশিয়ানের কোর্স করেছে। ফেসিয়াল, হেয়ার ড্রেসিং এইসব। আমার ধারণা, রেবাদের ফ্ল্যাটে ও ওইসব করাতেই গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ পুলিশ-হানা।

বিধান।। বাজে জায়গায় যায় কেন?

মোহন।। বারণ করে দেব। তুমি এখন টেলিফোনটা তোল।

বিধান।। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

মোহন।। তাহলে আরও একটা বর চাই।

বিধান।। আবার?

মোহন।। তোমার কোনও কাজই সহজ নয়।

বিধান।। সহজ হলে তোমাকে বলব কেন?

মোহন।। কাজটা শুনি।

বিধান।। এক ব্যাটাকে ফাঁসাতে হবে।

মোহন।। ভুঁড়ি।

বিধান।। না, ক্যারেকটার।

মোহন।। হয়ে যাবে।

বিধান।। কী বর চাই?,

মোহন।। মাধুরীর বাবার বাইপাস করাতে হবে। তুমি বাজোরিয়াদের কাছ থেকে লাখ দুই ম্যানেজ করে দাও।

বিধান।। হয়ে যাবে।

বিধান মোহনকে বললেন, হ্যান্ডসেটটা নিয়ে এস। রিসিভারের বোতাম টিপছেন। পিঁক পিঁক করে আওয়াজ। মোহন পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে।

অনেক রাত, কল্যাণবাবুর বাড়িতে পুরো পরিবার থম মেরে বসে আছে। মোহন বসে আছে একটা টুলে। কল্যাণবাবু খাটে শুয়ে আছেন। কল্যাণবাবু

বলছেন—

কল্যাণবাবু।। এ পাড়া তাহলে ছাড়তে হবে মোহন?

মোহন।। কেন?

কল্যাণবাবু।। কলঙ্ক।

মোহন।। ও সেকালের কাঁসার বাসনে পড়ত। একালে সব স্টেনলেস স্টিল।

কল্যাণবাবু।। ব্যাপারটা যে ক্লিন একটা চক্রান্ত সেটা বুঝলে। মাঝখান থেকে মাধুরী হয়ে গেল কলগার্ল।

মোহন।। এই প্রপার্টি নিয়ে খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে মামলাটা কতদিন চলছে?

কল্যাণবাবু।। লাস্ট টেন ইয়ার্স।

মোহন।। কী অবস্থায় আছে?

কল্যাণবাবু।। ওরা নো হোয়্যার হয়ে যাবে।

মোহন।। মাধুরী, তোকে বারান্দা থেকে কে ডেকেছিল?

মাধুরী।। রেবাদি।

মোহন।। তুই রেবার কেচ্ছা শুনিসনি?

মাধুরী।। শুনেছি। বিশ্বাস করিনি। রেবাদির মেয়ে আমার সঙ্গে পড়ত।

মোহন।। রেবার মেয়ে পড়লেই রেবা ধোয়া তুলসীপাতা।

মাধুরী।। আগে কতবারই তো ওদের বাড়ি গেছি।

মোহন ।। তখন কী ওর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল?

মাধুরী।। না।

মোহন।। ওর স্বামীকে খুন করেছে। ডেডবডি পাওয়া যায়নি।

মাধুরী।। কোনও কেস হয়নি আজও।

মোহন।। তাতে কী! কানেকশান থাকলে একটা কেন, দশটা মার্ডার করা যায়। মাধুরী, এত সরল হলে এই জটিল যুগে পদে পদে বিপদ। তুই জানিস না তোদের এক শত্রু আত্মীয় রেবার ব্যবসার পার্টনার। তোর একটুও সন্দেহ হল না, একটা মেয়েমানুষের এত পয়সা হল কী করে? তোকে ডাকার কারণ?

মাধুরী।। বিউটি পার্লার খুলবে। খুব ভালভাবেই কথা বলছিল।

তোদের এই অবস্থা, একটা ইনকাম না থাকলে কী করে ' লবে। তখন যে ভেতরের ঘরে ওইসব হচ্ছিল, কী করে জানব।

মোহন।। পুলিশ রেড না হলে তোর কী অবস্থা হত বুঝতে পারছিস? আমাদের ও.সি. অত্যন্ত ভাল লোক। মুখ দেখলে মানুষ চিনতে পারেন।

মাধুরী।। আমার কী হবে মোহনদা। কাল সকালে রাস্তায় বেরোব কী করে?

মোহন।। সেইজন্যেই বসে আছি। ভোর হলেই হাওড়া।

মাধুরী।। হাওড়া কেন?

মোহন।। হাওড়া থেকে হাওয়া।

মাধুরী।। কোথায়?

মোহন।। জামশেদপুরে। আমার পিসেমশাই ডাক্তার। নাম-করা।

মাধুরী।। তারপর?

মোহন মাধুরীর কথাটি শেষ হওয়া মাত্রই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সেই গানের একটি লাইন 'তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা' উদাত্ত গলায় গেয়ে উঠল। মোহন থামা মাত্রই কল্যাণবাবু বললেন—আহা, কী গলা। এ ছেলেটা গান গেয়েই মাৎ করে দিতে পারে। কেন যে করে না! মোহনের ক্লাসিক্যাল আমি শুনেছি আসরে। মনে আছে তোমার?

মোহন।। সব মনে আছে কাকাবাবু। এত বড় দুঃসাহস, অত বড় বড় ওস্তাদদের সামনে দরবারী কানাড়া গেয়েছিলুম।

কল্যাণবাবু।। সেই গান আজও আমার কানে। জানো তো মোহন, এ বাড়িতেও গান-বাজনার যথেষ্ট চর্চা ছিল। আবদুল করিম, ফয়েজ খান, মহিষাদল রাজ এস্টেটের পুলিনবিহারী। বেহাগে সিদ্ধ ছিলেন, আসরে আমাদের বাস্তুসাপ ঢুকে পড়েছিল। গল্পকথা নয়, চোখে দেখা, তখন আমি টেন ক্লাসের ছাত্তর। তারপর, ভাগ্য আর কপাল। জীবনটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারলুম না। লাগামছাড়া ঘোড়া। যতবার চেপে বসি, ছিট্‌কে ফেলে দেয়।

মোহন।। একটা ব্যবসা তো করেছিলেন। কিসের ব্যবসা? ম্যানুফ্যাকচারিং?

কল্যাণবাবু।। না সেলিং।

মোহন।। কী সেল করতেন?

কল্যাণবাবু।। পেটারনাল প্রপারটি। বিষয়-সম্পত্তি, স্থাবর, অস্থাবর সব বেচে বেচে বছর কুড়ি খুব লপচপানি। তারপর একে একে নিবিল দেউটি। দিনগুলি মোর রইল না, সোনার খাঁচায় রইল না, নানা রঙের দিনগুলি। দারিদ্র্য, নোনাধরা দেয়াল, ঝুরঝুর বালি। একটা শাস্ত্রবাক্য শোনো মোহনলাল,

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়ঃ পত্রফলাম্বুভোজনম্।
তৃণানি শয্যা বসনঞ্চ বল্কলং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন জীবনম্।।

গৃহত্যাগ করে বনে গিয়ে বাঘ-হাতির সঙ্গে বাস করা ভাল। পাতা, ফল, জল খাও। ঘাসের বিছানা। পরনে বল্কল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ধনহীন-দরিদ্র মানুষের জীবন অপমান আর অবহেলায় অসহ্য, দুর্বিষহ। যাও, হাই উঠছে সব। দুটো বাজল, শুয়ে পড়। আবার কাল। লড়াই, লড়াই, এ লড়াই মরার লড়াই, লড়াই করে মরতে হবে।

কল্যাণবাবুদের বাড়ির বারান্দায় একটা বেতের আরাম চেয়ারে টান টান হয়ে শুয়ে আছে মোহন। বাইরে ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা ঝলক এসে পড়ছে মোহনের মুখে। ঘরে ঢুকল মাধুরী। মোহনকে ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, একটা কিছু পেতে দি না মোহনদা। তোশক, মশারি সব আছে।

মোহন।। অকারণে কাজ বাড়িয়ো না। আমি কোথায় কোথায় শুয়ে ঘুম পাকিয়েছি জানিস—ইস্টিশানের বিছানায়। সেটা কী? কাঠের বেঞ্চি। মাঠের ঘাস, বাড়ির খড়ের চাল, পার্কের পাঁচিল, কলকাতার ফুটপাথ, গঙ্গার ঘাট, নৌকোর পাটাতন, গাছের মগডাল, শ্মশানের বটতলা, ভাঙা মন্দিরের দালান, চলন্ত ট্রাক, হাসপাতালের খাট, ঝুপড়ির খাটিয়া।

মাধুরী।। আজ না হয় বিছানা।

মোহন।। কেন অমন করছিস মাধু। খাতির আমার অসহ্য লাগে। পথেই জীবন পথেই মরণ আমাদের। ফুটে যা তো। একা একটু ঝিমোতে দে।

মোহন শরীরটাকে আরো একটু এলিয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়েছে মোহন। দূর থেকে ভেসে আসছে হরিধ্বনি। ঘোলাটে অতীত স্বপ্ন হয়ে আসছে। গানের আসর, অজস্র শ্রোতা, মোহন দরবারী কানাড়ায় আলাপ করছে। ভোরের ঘোলাটে অন্ধকার, হাততালির শব্দ। একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝপ্ করে নিভে গেল। পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে নীল ধোঁয়া। বেতের চেয়ারে আধশোয়া মোহন হাততালির শব্দে সোজা হয়ে বসল। স্বপ্নের অতীত বর্তমানে এসে মিলিয়ে গেল। মোহন আপন মনেই হা-হা করে হাসছে। মোহনের হাসির শব্দে মাধুরী ছুটে এসেছে।

মাধুরী।। কী হল? হা-হা করে কংসের মতো হাসছো? এখনও ভাল করে ভোরই হল না।

মোহন।। হাসব না কেন! আমার অতীত যদি স্বপ্ন হয়ে আসে তাহলে আমার বর্তমান কেন হাসবে না।

মাধুরী।। এইটুকু সময়ের মধ্যে কী স্বপ্ন আবার দেখলে?

মোহন।। দেখলুম, বিরাট এক আসর। অজস্র শ্রোতা আর ওস্তাদ, আমি মঞ্চে বসে দরবারি কানাড়ায় গান গাইছি। গান শেষ হতেই হাততালি আর হাততালি। আর বড়ে গোলাম আলি আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খাচ্ছেন আর বলছেন, কেয়াবাত, কেয়াবাত।

মাধুরী।। একদিন তো তাই হয়েছিল।

মোহন।। একদিন, একদিন, বহুদিন, দিনের পর দিন চলে গেল। পড়ে রইল, মোহন দি অ্যান্টিসোশ্যাল। কথা শেষ করেই মোহন উঠে দাঁড়িয়ে, শরীরের দু'পাশে হাত দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিল।

মাধুরী।। শোন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যে বললে, জামশেদপুরে পালাবে, আমাকে তোমার পিসিমার কাছে রেখে আসবে। আমি বলছি, পালাব কেন, কেন পালাব?

অবাক বিস্ময়ে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল মোহন। কথা শেষ হওয়া মাত্রই মোহন উত্তেজনায় মাধুরীর দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি মেরে বলল—আমি তো সেই কথাই বলতে চাইছি। মাধুরী, পালাবি কেন? রুখে

দাঁড়া, দেখ, লেখাপড়া আমি তেমন করিনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটা আমার বেঁচে থাকার মন্ত্র—

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

মোহন আর মাধুরী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎই মাধুরী বলল, পালাতেই যদি হয় তবে একজনের সঙ্গেই পালাব।

মোহন।। মানে এ আবার কী কথা? সে কে?

মাধুরী মোহনের ডান গালে তর্জনী দিয়ে টোকা মারতে মারতে বলল, তুমি, তুমি, তুমি।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে কর্পোরেশনের সাইলেন্সার ফাটা ময়লার গাড়ি বিকট শব্দ করতে করতে চলে গেল। দূরে একজন লোক বাজখাঁই গলায় ব্রঙ্কাইটিসের কাশি কাশতে কাশতে নিজেকেই গালাগাল দিচ্ছে— শালার কাশি লাংস দুটো ফেঁড়ে ফেঁড়ে ফেলে দেবে। এই ভদ্রলোকের পল্লীকে কাশি বানিয়ে ছেড়ে দিলে। কাশি আর যেতে হবেনা।

মোহন।। নাও, ভোর হতে না হতেই শুরু হল গদাইদার কপচানি। জানিস মাধুরী, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই পাড়ায় ভোরবেলায় সংকীর্তনের দল বেরোত। গাইতে গাইতে যেত—

আর ঘুমায়ো না মন, মায়াঘোরে।
কতদিন আর রবে অচেতন।

তা তুই এ-কথাটা কী বললি?

মাধুরী।। কোন্ কথাটা?

মোহন।। আমার সঙ্গে পালাবি? আমার মতো একটা র‍্যাজাটে ছেলে যার কোনও চালচুলো নেই।

মাধুরী।। ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছ কেন? এ তো তোমার সঙ্গে আমার কথা। পলিটিক্যাল বক্তৃতা দিতে দিতে তুমি সবকিছুই বল বক্তৃতার ঢঙে। তা মহাদেবের কী ছিল? দালানকোঠা ছেড়ে দিয়ে শ্মশানে বৈঠকখানা। পার্বতী সেই মহাদেবকে পাবার জন্যই তপস্যা করেছিলেন।

মোহন।। ওইসব সাহিত্যমার্কা ন্যাকান্যাকা কথা বলিসনি তো। লায়লা-মজনু, হীর-রণঝা, শাহজাহান-তাজমহল এসব ইলেকট্রিকের আলো আর স্যাটেলাইটের যুগের আগের ঘটনা। এ যুগ হল কম্পিউটার, এ যুগ

হল কেরিয়ারের। এ যুগ হল P_3-র।

মাধুরী।। P_3?

মোহন।। কিছুই জানিস ন। ধেড়ে হয়ে বসে আছিস। শোন তিনটে পি হল, পপুলেশন, পলিউশন, পলিটিক্স।

মাধুরী।। তোমাকে ভালবাসি। পরিষ্কার সোজা কথা তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার চোখে দেখেছি আমি আমার সর্বনাশের ইশারা।

মোহন।। শোন, সভ্য মানুষের জীবনে একটা ইংরেজি আছে, সেটাকে বলে গুড মর্নিং। সেটা কী জানিস?

মাধুরী।। কী?

মোহন।। ভাঙা কাপে, কালচে রঙের তিনটে পিঁপড়ে ভাসা এককাপ তেতো চা। সেটার আশা কী আছে? না, আশার আশা ভবের আশা, আশা মাত্র হল সার। কাল সারারাত তোদের বারান্দার ব্লাডব্যাঙ্কে তা প্রায় আধবোতল রক্ত দিয়েছি, এখন একটু পুষ্টিকর চা না হলে এই চাতাল যে ভোরের কা-কা-র বদলে চা চা করবে।

অস্পষ্ট একটা কোলাহলের শব্দ দূর থেকে ভেসে এল। মোহন কান খাড়া করে বললে,

—সাতসকালে কি আবার হল!

মাধুরী।। যাই হোক, তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

মোহন।। তুই কি আমাকে রিফর্ম করতে চাস! ফুল ফুটলে ভ্রমর ছুটবেই।

মাধুরী।। আর আমি যদি শ্যামল মিত্রের সেই বিখ্যাত গান গেয়ে বলি, ফুলের বনে মধু নিতে অনেক কাঁটার জ্বালা। ভ্রমরা যাসনে সেখানে।

মোহন।। সে হল তোর বাংলা ফুল। আমি হলুম, ইংরিজি Fool। আমার মাস্টারমশাই বলতেন— Fools tread where angels dare to step in. যেতে আমাকে হবেই। গোলমালটা আসছে খেলার মাঠের দিক থেকে।

খেলার মাঠে গোলপোস্টের পেছন দিকে কৌতূহলী এক দল মানুষের জটলা। মোহন দ্রুত এগিয়ে গেল সেইদিকে। মোহন দূর থেকেই জিজ্ঞেস করছে—কী হয়েছে রে, কী হয়েছে?

মোহন এ পাড়ার অভিভাবক। সকলেই আশ্বস্ত হল। নেতা এসে গেছে। আর ভয় নেই। ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটি ছেলে বললে, এই দ্যাখো মোহনদা, একটা লাশ পড়ে আছে।

গোলপোস্টের পেছনদিকে ঝোপঝাড় আগাছার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে এক জোড়া পা। এক পায়ে জুতো, আর এক পা খালি। দেহের ঊর্ধভাগ ঝোপের অন্তরালে। যে পারছে সেই একবার করে উঁকি মারছে। ঠোঁটে ঠোঁটে প্রশ্ন ফিরছে—লোকটা কে? মোহন ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতে বলছে, এতে এত হইচই করার কি আছে! মানুষ তো আজকাল কুকুরেরও অধম। মরে গেলেই হল। লাশটা কার?

কে একজন বললে, দেখে মনে হচ্ছে সমীরদার।

—সমীর! কোন সমীর? এ পাড়ায় সাতটা সমীর আছ।

—আরে, শেয়ারের দালাল সমীর। তুমি তো চেন।

মোহনের গলায় বিস্ময়— সমীর সরকার! যাঃ, ওকে ঝেড়ে দিলে! আমি জানতুম ও হড়কাবে। ধর্মের কল বাতাসেই নড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল পুলিশের ধধ্ধড়ে জিপ। জিপটাকে আসতে দেখেই ভিড় হাওয়া। গোলপোস্টের সামনে গোলকিপারের মতো একা দাঁড়িয়ে মোহন। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বেজারমুখো দু'জন সেপাই। পুলিশের বড়বাবু আসতে আসতে দূর থেকেই বলছেন,

—কি হে মোহনলাল, আবার একটা নামিয়েছ?

—স্যার! এতকাল ক্রিমিন্যালদের চরিয়ে এ-কথা বললেন কী করে! খুনী কখনো খুনের জায়গায় থাকে? আর বডিটা দেখলেই মালুম হবে, কাঁচা হাতের কাজ।

—খুনী খুনের জায়গায় থাকে না ঠিকই, তবে আমাদের শাস্ত্র কি বলে জানো—খুনী খুনের জায়গায় ফিরে আসবেই।

—জানি স্যার। তবে এত তাড়াতড়ি নয়।

অফিসার সিপাইদের হুকুম দিলেন, সাবধানে ডেডবডি স্পর্শ না করে ঝোপটাকে একটু পরিষ্কার করতে। সিপাই দু'জন সাবধানে কচুঘেঁচুর ঝোপ সরিয়ে মৃতদেহটাকে দৃশ্যমান করল। অফিসার মোহনকে প্রশ্ন করলেন,

—চেন?

—চিনি স্যার! সমীর সরকার। লোকে বলে, সমীর শেয়ার।

অফিসার।। এই আর এক উপসর্গ ঢুকেছে শেয়ার। কিছুদিন হল, চিটফান্ড। এখন রসখ্যাপা বাঙালিকে ধরেছে শেয়ার। শেয়ারে ট্যাক্সি, শেয়ারের অটো, বাকি রয়েছে শেয়ারে বিয়ে করাটা।

মোহন।। বিয়ে জিনিসটা উঠে যাবে স্যার এখন এসে গেছে লিভ টুগেদার, ধরো আর ছাড়ো আবার ছাড়ো আর ধরো। (চিৎকার করে) জাগো বাঙালি। ডলার ছাড়াই আমেরিকান। খালি পেটে বুলি ঝেড়ে আর বুলি শুনে স্বাধীনতার ফিফটি ইয়ারস। আমি তাহলে আসি স্যার।

অফিসার।। আসবে মানে?

মোহন।। মানে আমি যাই।

অফিসার।। তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে। হাতের কাছে এমন একটা জিনিস থাকতে খুনীকে আমি কোথায় খুঁজে বেড়াব? লাশ আর কিলার একসঙ্গেই পাঠিয়ে দেব।

মোহন।। আগে সনাক্ত করুন, তারপর তো ধরবেন। নাহলে তো এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাব।

অফিসার।। কাজের সময় ইয়ার্কি নয়। আবার তোমাকে দেখলেই দুটো রসের কথা বলতে ইচ্ছা করে। জান তো পুলিশের সব থেকে বড় বন্ধু হচ্ছে ক্রিমিন্যাল। কেসটা কী বল তো?

মোহন।। কেসটা বললে—আমার খুব একজন স্নেহভাজন ফেঁসে যাবে। সেটা আমি চাই না স্যার।

অফিসার।। এই তো বলেই বিপদ করলে। তুমি যখন জান তখন না বললে আমাদের বলানোর মেথড তো তোমার জানাই আছে মোহন।

মোহন।। এই আপনাদের দোষ স্যার। থেকে থেকে পালটে যান।

পুলিশ কী কখনই মানুষ হবে না।

অফিসার।। ব্যাপারটা রেসিপ্রোকাল। তোমরা মানুষ হলে পুলিশও মানুষ হয়ে যাবে।

অফিসার মোহনের কাঁধে হাত রাখলেন। অন্তরঙ্গতা দেখলে মনে হবে যেন কতকালের বন্ধু দু'জন প্রাণের কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। এই সময় আর একটা জিপ, বেশ ঝক্‌ঝকে, রাশভারী, ঝাঁ করে ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াল। দু'জন অফিসার নামলেন। গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেলেন ঘটনাস্থলের দিকে। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ। এইবার মাপজোকের ফিতে বেরোবে। লেন্‌স, ক্যামেরা। ছাপ তোলা হবে। আরো কত কী! আপাতত স্থানীয় থানার আর কিছু করার নেই।

নিত্যানন্দের ফ্ল্যাটে নিত্যানন্দ, মালিনী, পূর্ণা। চিন্তিত মুখ। রাতে ঘুম নেই কারো চোখে। মোহন বসে আছে একটা মোড়ায়। হাঁটুর ওপর হাত দুটো টানটান। মোহনের বসার ধরনটা যোগীর মতো। কখনও সামনে ঝোঁকে না। মুখ তুলে মোহন প্রশ্ন করল,

—খোকা কোথায়?

নিত্যানন্দ।। কাল থেকে সেই যে হাওয়া হয়ে গেছে, কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

মোহন।। আপনাদের মতো ইডিয়েট...। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে...। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় একটা ডায়েরি করতে পারতেন তো!

মালিনী।। না, আমরা ভাবছিলুম, দেখি না, ফিরে আসে কি না!

মোহন একটা আক্ষেপের শব্দ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে,

—এ কী বেড়াল যে ফিরে আসবে! মানুষের ছানা! আপনাদের মতো ক্যাবলাদের সংসার করাটাই উচিত হয়নি। এখন কী হবে।

পূর্ণা প্রশ্ন করে উদ্বেগটা আরো বাড়িয়ে দিল—এখন কী হবে মোহনদা!

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কেস খুব সিরিয়াস। সমীরের কাছ থেকে খোকা শেয়ার কিনেছিল, সেই শেয়ার জাল। ট্রান্সফার করাতে গিয়ে ধরা পড়ল জাল সই। খোকার লাখ দুই টাকা চোট। সমীরের ডেডবডি গোলপাস্টের পেছনে। একটু পরেই পুলিশ কুকুর আনবে। সেই কুকুর যদি শুঁকতে শুঁকতে এই বাড়িতে আসে তাহলে কী হবে?

পূর্ণা।। এই বাড়িতে আসবে কেন?

মোহন।। মাথামোটা! এই খুনের পেছনে খোকা যদি থাকে কিছু অন্যায় হবে।

পূর্ণা।। দাদা থাকবে কেন?

মোহন।। এই কারণে থাকবে, দাদার টাকা চৌপাট হয়ে গেছে। টাকার শোক তো ভোলা যায় না। সেই শোকে খোকা যদি ঝেড়ে দিয়ে থাকে!

পূর্ণা।। দাদা খুনের এবিসি জানে না। ওরকম নরম মনের মানুষ জলজ্যান্ত একটা মানুষকে মেরে ফেলবে?

মোহন।। বাবা, টাকা কী বস্তু জান না! টাকার জন্য বাপ ছেলেকে, ছেলে বাপকে খুন করতে পারে। এটা স্বর্গ নয়, নরক পৃথিবী। এই সত্যটি ভুলো না কখনও।

নিত্যানন্দ।। আমার প্যালপিটেশান হচ্ছে।

মোহন।। হলেও কিছু করার নেই। শোন্ পূর্ণা, তোর দাদা খুন না করলেও আর একজন কেউ খুন করে তোর দাদার ঘাড়ে দায়টা চাপিয়ে দিতে পার। প্রফেশনাল খুনীরা অনেক আটঘাট বেঁধে কাজ করে। পুলিশ যখন জাল ফেলবে তখন সেই জালে রুই, কাতলা, চুনোপুঁটি সব উঠবে। খুন না করলেও হ্যারাসমেন্টটা যাবে কোথায়!

মোহন উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—যে ভাবেই হোক খোকাকে খুঁজে বের করতেই হবে। পূর্ণা, তুই বাবার জিভের তলায় একটা সরবিট্রেট দিয়ে দে।

মোহন একটা গানের দুটো কলি গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল,

এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয় সব সত্যি।
ঘুরিয়ে এই দুনিয়ার লাট্টু, ভগবান,
তুমি হারিয়েছো লেত্তি।

গুপীর চায়ের দোকানে জোর গুলতানি। পাড়ার সব বিশেষজ্ঞের জমায়েত। যত না চা উড়ছে, তার চেয়ে বেশি ছুটছে কথা। আলাদা করে বক্তাদের চেনার চেষ্টা না করাই ভাল। স্বরক্ষেপের দিকে কান রাখা যাক।

কণ্ঠস্বর ॥

১। এর পেছনে রাজপরিবারের হাত আছে। ডেফিনিট।

২। ধুস্, চার্লস একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফ্র্যাকচারড। দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে এক ঝটকায়। বউকে ভালবাসত। যে যাই বল, প্রেম মরে না। ও হল বটের শেকড়।

৩। ভাই, এই তো জীবন, হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়/কার যে কখন সন্ধে হয়। এই তো সমীর! কী লপচপানি। চলে গেল লাশকাটা ঘরে। কাল সেলাই-ফোঁড়াই হয়ে শ্মশানে, দেড় কেজি ছাই!

৪। আমি দেখছি, অনেকেরই পয়সা সহ্য হয় না। ডায়না, ডোডি কম বড়লোক। হীরের আংটিটার দাম এক লাখ বিশ হাজার পাউন্ড।

৫। শেয়ার সমীর জাস্ট তিন দিন আগে গাড়ি কিনেছে। লে হালুয়া।

৬। কার কাজ বল তো, অমাবস্যার রাতে ঝড়াকসে নামিয়ে দিল মাইরি!

৭। ওই ডায়ানার মার্সিডিজ। ফাস্ট দৌড়লেই ক্র্যাশ। সমীর ফাস্ট রান করছিল। পাঁচ বছর আগেও গুপীদার ধারের খদ্দের। পাঁচ বছর পরে তাজে ডিনার।

৮। বাঙালির এই এক রোগ। কেউ মরলেই হল, অমনি ফিলজফি। আরে বাবা বাঁচতে এসেছিস, যে ভাবেই হোক বেঁচে থেকে একদিন ফুটে যা। ইলিশ খা, ঢেঁড়স খা, রোল খা, মোগলাই খা, প্রেম কর, ঝগড়া কর, ভাব কর।

৯। লাও, শুরু হল ভাদ্দরের পচা তাল, ভড়ড় ভড়ড়।

এই কথার গজর বজরে মোহন দমকা বাতাসের মতো দোকানে ঢুকল। ঢোকা মাত্রই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোফিয়ার ঝাঁঝ। চায়ে চিনি

গুলছিল। চাপা গলায় মোহনকে বললে,—কবে তুমি ভদ্দরলোক হবে?

—ভদ্দরলোক তো হয়েই আছি।

—যার কথার ঠিক নেই সে আবার ভদ্দরলোক।

—এই লাও, কিছুই জান না, সাঁই করে একটা কথা বলে বসলে। ভদ্দরলোকের লক্ষণই হল, তার কথার ঠিক থাকবে না। বলবে এক, করবে আর এক। এত ভদ্দরলোক চারপাশে থই-থই করছে। দেখলেই তো শেখা যায়। লোনা না হলে সমুদ্রের জল হয়! ঝাল না হলে লঙ্কা হয়!

—এটা দেখি কথার ঝুড়ি।

—ওটাও তোমার ভদ্দরলোকের লক্ষণ।

—যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না, অসভ্য! তোমার জন্যে কাল রাতে আমার খাওয়াই হল না। কত কী রাঁধলুম।

—রাগ করো না। অবশ্য রাগলে তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়।

—থাক থাক, খুব হয়েছে। আমি চাউলী, চাউলীই থাকব।

—আমি বেওয়ারিশ মাল বেওয়ারিশই থাকব। মরলে মুখে কেউ জলও দেবে না, শ্রাদ্ধও করবে না।

হঠাৎ সোফিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে—খোকনকে দেখেছ? কাল থেকে একবারও?

সোফিয়া বললে—না তো!

মোহন নিজের মনেই বলে উঠল—আশ্চর্য! ছেলেটা ভ্যানিশ হয়ে গেল!

সোফিয়া বললে, তাতে তোমার কী?

—এই দেখ, ভদ্দরলোকের মতো কথা বললে। আমি ভদ্দরলোক হলে আমার কিছুই হত না। ছোটলোক হয়েই বিপদে পড়েছি। ছেলেটার খুব বিপদ। যেভাবেই হোক, ওকে বাঁচাতে হবে।

—ওর আবার কী হল, ম্যালেরিয়া, না জন্ডিস!

—দুটোই। এক গেলাস কড়া ছাড়।

—রাতে কিছু জুটেছিল?

—না।

—সেই কাল দুপুরে খেয়েছিলে, এখন বেলা এগারোটা। আমি যদি তোমার কেউ হতুম, তাহলে তোমার মতো ছেলেকে কী ভাবে টাইট দিতে

হয় দেখিয়ে দিতুম।

—তুমি যে আমার কে তুমি না জানলেও আমি জানি। কিন্তু সেই জানাটা তোমার অজানাই থেকে যাবে।

মোহন সোফিয়াকে ছেড়ে দোকানের ভেতর গুলতানিতে বেঞ্চের একপাশে বসল। মোহনকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠল—গুরু অনেকদিন বাদে মিইয়ে যাওয়া পাড়াটা আবার তেতে উঠল।

সোফিয়া মোহনের হাতে চায়ের গেলাসটা ধরাচ্ছে, মোহন সকলকে শুনিয়ে সোফিয়াকে বললে,

—সোফিয়া শুনলে, এরাই হল ভদ্রলোক। কারোর সর্বনাশ কারোর পোষ মাস।

দোকানের বয় কিশোর। বাইরে বসে কাপডিশ ধুচ্ছিল। হঠাৎ তিন লাফে দোকানে—

—পুলিশ কুকুর ছেড়েছে, শুঁকতে শুঁকতে এদিকেই আসছে।

দোকানে যারা বসেছিল, পেছনের দরজা দিয়ে নিমেষে সব হাওয়া। ওদিকে আবর্জনা ভরা একফালি পোড়ো জমি। অন্য সময় হলে যেত না। মোহন একটা পা বেঞ্চের ওপর ছড়াতে ছড়াতে বললে,

—যাঃ, সব ব্যাটা হাওয়া!

কলকাতার লাল আলোর এলাকার একটি কুঠি। তার তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে খোকন বসে আছে খাটে। এক গাল দাড়ি। বিধ্বস্ত চেহারা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে একটি মেয়ে পিঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ঘন কালো চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে, যেন ঝাউয়ের পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। মেয়েটি সুন্দরী। দেহের খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে ভাঁজে পাগল করা আকর্ষণ। মেয়েটির সঠিক নাম হারিয়ে গেছে। এ পাড়ায় তার নাম ডলি। খোকন আয়নার প্রতিচ্ছবির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। খোকনের জ্বর হয়েছে। ডলি আয়নায় খোকনের মুখ দেখতে পাচ্ছে। ডলি বলছে,

—তোমাকে দূর করে দিইনি এই তোমার বাপের ভাগ্যি। কবে কোন জন্মে চুটকি মারতে এসেছিলে সেই অধিকারে ঠাঠা দুপুরে ফুর্তি করতে চলে এলে। দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্দর ঘরের ছেলে। একেবারে নাদান। মুখটা দেখে মায়াই হচ্ছে। রাতের বাবুরা সকাল হলেই আমাদের মেয়েমানুষ বলে। তা বলুক—আসলে তো আমরা মায়ের জাত। শয়তানরা টেনে বের করে এনে মাকে মাগি বানায়। গর্ভে ছেলে এলে বাংলায় বলবে জারজ, ইংরেজিতে বাস্টার্ড, হিন্দিতে বলবে হারামি। বউয়ের পেটের ছেলে—সন্তান, আমার পেটে সেই একই বাপের ছেলে—হারামি! কী বিচার মাইরি তোমাদের!

ডলি আয়নার সামনে থেকে উঠে এসে বেশ আয়েস করে খোকনের পাশে বিছানায় আধশোয়া হল। কথা শেষ হয়নি। খোকনের উরুতে হাত রেখে বললে—দেখে মনে হচ্ছে, কিছু একটা বাধিয়ে এসেছ। খুনখারাপি করার সাহস তোমার হবে না, তবে এমন একটা কিছু দেখে ফেলেছ যাতে তুমি নিজেই খুন হয়ে যাবে।

—কী করে বুঝলে বল তো! খোকন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। ডলির শিক্ষিত হাত যেখানে সেখানে ভ্রমণ করছে। খোকনের সারা শরীর শিরশির করছে।

ডলি বললে—এই বয়েসেই হাজার খানেক লোক চরিয়েছি। মানুষের ভেতরটা দেখতে পাই। এখানে এসেছ কেন?

খোকন অসহায়ের মতো বললে—জানি না, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে এল। সেই কবে একবার দুর্গাপুজোর রাতে তোমার কাছে এসেছিলুম। সিদ্ধির ঘোরে মনে হয়েছিল, তুমিই মা দুর্গা। কিছু করতে পারিনি বলে আমাকে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি মেরেছিলে।

—খুব তেল মারতে পার মাইরি! কী মতলবে এসেছ বলো তো। ঘাপটি মেরে থাকবে কিছু দিন। এই একটা জায়গা। আমরা যেন পাপের আড়তদার! আমার রেট জানো। পকেটে কত টাকা আছে গুরু?

—একটা টাকাও নেই।

—ওরে আমার ফোতো কাপতেন রে। এসব জায়গায় আসতে গেলে ট্যাঁকের জোর থাকা চাই।

—তাহলে আমি চলেই যাই।

খোকন উঠে দরজার দিকে এগোচ্ছে। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদের কলকাতা। ডলি খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মজা দেখছে। ভীরু একটা ছেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে যাচ্ছে। কোথায় কী করে এসেছে কে জানে। ডলি বললে, এই যে দাঁড়াও, তোমাদের তো আবার নাম থাকে না, আমাদেরও অবশ্য থাকে না। এটা নামহীনদের পাড়া।

খোকন ছাতে বেরিয়ে এসেছিল। দাঁড়াও—আদেশ শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্ট্যাচুর মতো। ডলি খোকনের সামনে মুখোমুখি। ঝাঁঝালো গলায় বললে—যেতে বলতেই সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছো যে! আগের জন্মে ট্রেনিং নেওয়া বিলিতি কুকুর ছিলে বুঝি।

খোকন কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির মুখের দিকে।

ডলি আঙুল উঁচিয়ে কড়া গলায় বলল—ভেতরে চলো। ক'দিন খাওনি। মুখটা তো শুকনো আমের মতো হয়ে গেছে।

খোকন ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল আবার। মেয়েটা পাকা মাছুড়ের মতো খোকনকে খেলাচ্ছে। কতই বা বয়েস! খোকনের বয়সিই হবে। খোকনের মায়ের কথা, বোনের কথা মনে পড়ছে। তুলনা আসছে। এও মেয়ে তারাও মেয়ে। কত তফাৎ। ডলি কোলে একটা তাকিয়া নিয়ে খাটের ওপর বাবু হয়ে বসল। খোকন ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো সামনে দাঁড়িয়ে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

ডলি পান চিবোতে চিবোতে বললে—সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এস। দরজাটা বন্ধ করতেই ঘরের ঝনঝনে আলো বেশ নরম হল। খোকন দাঁড়িয়ে আছে খাড়া।

ডলি মুচকি হেসে বললে—এইবার কি হবে বলো তো!

—কি হবে?

—পয়সাকড়ি নেই তো?

—না। গোটা কুড়ি টাকা আছে।

—ওতে কি হবে! আমি রাত বিক্রি করি, দু'হাজার তিন হাজারে। দিন বিক্রি করি ঘণ্টা-মিটারে। পাঁচশো, হাজার। আমি এখন শোবো, তুমি আমার পা টিপবে। বিলিতি সাবান মেখে চান করেছি। চুলে করেছি এলো খোঁপা। পেটে পড়েছে বিরিয়ানি, চাঁপ। মুখে ঠুসেছি জর্দা পান। আর সামনে

দাঁড়িয়ে আছ তুমি উপোসী। তোমার কেসটা এবার শোনা যাক। বেশ মজা লাগছে। তোমার সেই হরিদাসের গুপ্ত কথা। নিশ্চয় একটা মেয়ে আছে। একটা ছেলে একটা মেয়ে—পৃথিবীর যত গল্পের শুরু।

ডলি সুর পালটে এক ধমক লাগাল—চাকরের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে বসতে পারছ না। মেড়া কোথাকার।

খোকন বসতে গিয়ে খাট আর নিজের পেছনের দূরত্ব অনুমান করতে না পেরে মেঝেতে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিল। ডলি খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললে—ভয় পেয়ে মানুষ কী রকম ভেড়া হয়ে যায় মাইরি।

কথা শেষ করেই ডলি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পা দুটো তুলে দিল খোকনের কোলে—পা দুটো আগে দেখ। এর নাম শ্রীচরণ। কেষ্ঠঠাকুর শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ সেবার পর শ্রীফল পেতেন। এই রকম পা দেখেছ? কী, এইতেই মরে গেলে, গলা শুকিয়ে কাঠ। এখনো যে অনেক বাকি মিঞা। কুঞ্জকানন অনেক দূর। আমার মুখের পান চিবনো খাবে? বেশ রসেছে। বহুত প্রেম। ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসো। পান খাও, পান করো। কত সুধা পৃথিবীতে। বোতল সুধা, অধর সুধা, দেহ সুধা। কত সুধা!

খোকন অবাক হয়ে পা দুটো দেখছে। মানবীর পা এত সুন্দর হয়! হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বস্ত্রের অন্তরালে আরো বিস্ময়। হিসেব করে, শাস্ত্র মেনে বাঁচতে গেলে জীবনের কিছুই দর্শন হয় না। সব বিসর্জন দিলে তবেই অর্জন হয়।

ফুটবল খেলার মাঠ। মাঝমাঠে বল। দু'দিকে দুই স্কুল টিম। সবই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হাত-পা নাড়ছে। গজর গজর কথা হচ্ছে। দুজন প্রবীণ মানুষ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে। কোনো একটা সমস্যা। যার সমাধান এই দু'জন প্রবীণ মানুষের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। এমন সময় দেখা গেল, মোটর সাইকেলে চেপে মোহন আসছে। সাদা শার্ট, সাদা ট্রাউজারে একেবারে টিপটপ।

দুই প্রবীণ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন—মোহন, মোহন!

মোটর বাইক কান্নিক মেরে রাস্তার বাঁ পাশে মাঠের ধারে চলে এল। মোহনের একটা পা মাটিতে। বাইকের চাপা গর্জন। মোহন গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—কী হল স্যার!

প্রবীণদের একজন বললেন—একবার এস না বাবা!

মোহন বাইকটাকে রাস্তার পাশে রেখে এক লাফে মাঠে পড়ে ছুটতে ছুটতে দূর থেকে বললে—শরীরটা এখনও ফিট আছে, বলুন স্যার?

মোহনের পায়ের কাছেই ফুটবল। সটান লাথি মারার লোভনীয় একটা জিনিস। মাঠের ঘাসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোহনের শৈশব ফিরে আসছিল। বলটা দেখার পর সেই অনুভূতি আরো তীব্র হল। ধাঁই করে এক শট। বলটা উড়ে গেল গোলের দিকে। সেখানে কেউ নেই, অথচ অদৃশ্য কোনো গোলকিপার বলটাকে যেন পাঞ্চ করে ফিরিয়ে দিল।

মোহনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—যাস শালা।

সঙ্গে সঙ্গে বললে—সরি স্যার। তাজ্জব ব্যাপার।

মাস্টারমশাইদের একজন বললেন—সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি বাবা। তখন থেকে এইরকমই হচ্ছে। কী ব্যাপার বলো তো!

মোহন বললে—আজকে খেলাটা বন্ধ রাখলেই পারতেন। সকালে এত বড় একটা কেলোর কীর্তি হয়ে গেল।

—কী করব! আমাদের টুর্নামেন্ট চলছে যে!

রেফারি কিছুক্ষণ চিন্তা করে রায় দিলেন—খেলা আজ বন্ধ থাকে স্যার। যে কোনো কারণেই হোক, মাঠের আবহাওয়া আজ ভাল নয়। মনে হয়, হাওয়ার জন্যেই আজ এইরকম হচ্ছে। বল ঠেলে বের করে দিচ্ছে।

শিক্ষকমশাই বললেন—কী যে বলো! হাওয়াই নেই তো হাওয়া! গাছের একটা পাতাও কি নড়ছে!

রেফারি বললেন—এ হাওয়া সে হাওয়া নয়। এই যে বলে, আবহাওয়া বার্তা, তাতে হাওয়া আছে?

—ঝোড়ো হাওয়া আছে।

—যে হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ে সে হাওয়া আছে কী? নেই। সে হাওয়ায় আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়াও নেই।

কিছুক্ষণ ভ্যাজোর ভ্যাজোর করে মাঠ ফাঁকা করে সবাই চলে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল একা মোহন। মোহন গোলপোস্টের দিকে এগিয়ে গেল আবার। প্রশ্নটা থেকেই গেল। ঘটনাটা লৌকিক না অলৌকিক! বিজ্ঞানের যুগে ভূতের অস্তিত্ব কেউ বিশ্বাস করবে! গোল-পোস্ট। পেছনে ঝোপঝাড়। ঝোপঝাড় সামান্য বিধ্বস্ত। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তাহলে?

মোহন আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল বাইকের কাছে। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকে। পড়ন্ত বেলার রোদ। মোহনের বাইক দূর থেকে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাঠটা পড়ে রইল শুনশান।

সুচন্দ্রা লাল পাড়ার এখন টপ বারবধূ। পাঁচ হাজারের কমে কথা বলে না। নামী-দামী লোক আসে, বসে, ফুর্তি করে, চলে যায়। আর আসে সবচেয়ে কুখ্যাত মানুষরা। যারা হাসতে হাসতে খুন করে। ভীষণ সাজানো-গোছানো একটি ঘর দোতলায়। যমদূতের মতো বসে আছে দুটো লোক। মদের বোতল, গেলাস, সোডা ওয়াটারের খালি বোতল। তিনটে প্লেটে মাংসের হাড়। সুচন্দ্রা প্রায় আউট। লোক দুটো নেশায় টান টান। পাপের জগতে এদের একজনের নাম পীরু, আর একজনের নাম জগা।

জগা পীরুকে বলছে—ব্যাটা ষণ্ড। মাথামোটা। তোকে বললে চমকে দিতে, আর তুই পাঠিয়ে দিলি মায়ের ভোগে।

পীরু—আরে, বুড়বাকের মতো কথা বলিস না তা! খুন তো করিসনি কোনোদিন। কারো গলা টিপে ধরলে আরো টিপতে ইচ্ছে করে। তা দম বন্ধ হয়ে গেলে আমি কি করব। শালা নেতিয়ে পড়ল।

জগা—তা লাশটা পাড়ায় না ফেলে বেপাড়ায় ফেলতে পারতিস তো!

পীরু—তোর দয়ামায়া কিস্যু নেই। মাল খেয়ে খেয়ে সব লোপাট চৌপাট হয়ে গেছে। পাড়ার জিনিস পাড়াতেই রইল। সালার বাড়ির লোকের লেবার কমে গেল। এক ছুটে এসে মড়া দেখে মরকান্না জুড়ে দেবে।

জগা—ভালই করেছিস মাথামোটা। এইবার দু'সাইডের ধোলাই খাবে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচলেও মোহন সালা কী ছাড়বে? ব্যাটা যমদূত।

পীরু—ছাড়বে ছাড়বে। দুই আর দুইয়ে চার হয় সোনা। গব্বর সিং-এর মতো গতরটাই বাগিয়েছিস। মাথায় আছে ছাই। গোবর থাকলে তবু সার হতো। হিসেবটা বোঝার চেষ্টা কর।

জগা—এর মধ্যে আবার হিসেব কী! তোর হাফ আমার হাফ।

পীরু—ওরে আমার মানিক রে! পুরো কেসটা নামালুম আমি, অপারেশন আমার। এক কোপে খতম। ঘ্যাক করে গলাটা চেপে ধরে তিনটে ঝটকা। আর তুমি মেরে দেবে হাফ! শোন নেপো, এই দইয়ের এক ছিটেও তুমি মারতে পারবে না।

জগা—যাঃ, তুই আমায় এত পেয়ার করিস, প্রসাদ না দিলে তোর দিলে লাগবে রে। তোকে তো আমি জানি। মানুষের চেহারা হলে কী হয়, আসলে একটা হাতি। যাকে ভালবাসিস তাকে শুঁড়ে তুলে পিঠে চড়াস। আর যার ওপর রেগে যাস তাকে থেঁতো করিস। তুই আর ব্যাঙ্ক তো এক রে। যতদিন থাকবে মাল সুদে বাড়বে। এইবার তোর সেই হিসেবটা বল মাইরি।

পীরু এক চুমুকে আধ গেলাস সাবড়ে জগাকে হিসেব বোঝাচ্ছে—

—শোন, মোহন খোকনকে ভালবাসে। খোকনকে কেন ভালবাসে। বল্, কেন বাসে! দেখি তোর নেশা হয়েছে কী হয়নি।

জগা একটু ভেবে বললে—খোকনের বোন পূর্ণা।

পীরু—ইয়া, মার দিয়া কেল্লা। ধরেছিস ঠিক। ষাঁড়ের কালিয়া হুইস্কি খেলে সায়েবদের মতো বুদ্ধি হয়, কী বলো বেগম সাহেবা। তুমি যে বাবা এরই মধ্যে চেত্তা খেয়ে গেল।

জগা—ওকে ছাড় এখন। তুই আটকে গেছিস, আগে বাড়ো।

পীরু—কী যেন হচ্ছিল?

জগা—হিসেব।

পীরু—হিসেব করে কী হবে! ওসব করবে ওই কেরানিরা। আমাদের হল জিও, পিও। কেউ মনে রাখবে না আমাদের। একদিন আদর করে নিজের মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছি, চিৎকার—বাপ হয়ে মেয়েকে রেপ

করতে চাইছ! আমাদের ক্যারেকটার বলে আর কিছু নেই রে জগু।

জগা—লে হালুয়া! শেষ পর্যন্ত তোরই নেশা হয়ে গেল। আরে ব্যাটাচ্ছেলে ওই হিসেব—মোহন ভালবাসে খোকনকে, আসলে ভালবাসে পূর্ণাকে, তাহলে? তাহলে কী?

পীরু—অ, তুই ওই হিসেবটা বলছিস? খোকনের দু'লাখ টাকা চোট হয়েছে, তাহলে সমীরকে খতম করার কথা ছিল মোহনের, তার আগে আমরাই ওকে শুইয়ে দিয়েছি। সমীর অনেকের টাকা মেরেছে। ব্যাটা পাপী। পাপীরা কোথায় যায়?

জগা—নরকে।

পীরু—উসকো হাম নরকমে ভেজ দিয়া। হামার কোতো, কোতো পুণ্য হল। সোব লোকের ভি কোতো আনন্দ হল। এইবার বাজি পোড়াবে, পটকা ফাটাবে। আভি তুমহার হিসাব ছোড়ো দোস্ত, এক রাউন্ড নাচা-গানা হো যায়। পীরু কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে নাচার চেষ্টা করল। পিয়া ঘর আয়া, আহা, আহা। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে টলে পড়ে গেল। সেন্টার টেবিল, মোড়া সব ছিটকে উলটে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড। পীরুর নাচ দেখে জগা খাটের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। পীরুকে বলছে—ব্যাটার লিবারে কিছু নেই, ছিবড়ে হয়ে গেছে। এই দ্যাখ, আমি স্টেজে দাঁড়িয়ে কেমন নাচি।

জগা, পীরুর কাণ্ড দেখে সুচন্দ্রা দু'হাত তুলে আতঙ্কের গলায় বলছে—উতার যাও, উতার যাও, খাট ভাঙ যায়েগা।

ওই পাড়ারই ডলির ঘরে তখন অন্য দৃশ্য। খোকন দাড়ি কামিয়েছে, চান করেছে। নিচের, নিচের ফ্ল্যাটে গুলজার। খদ্দের ঢুকছে, বেরোচ্ছে। ঘরে ঘরে প্রেম উপচে পড়ছে। কচি কলাপাতায় মোড়া বেলফুলের মালা। কারো কারো খোঁপায় জুঁইফুলের গোড়ের মালা। ফুল আর মদের গন্ধে বাতাস ভারী। ডলির ঘর সেই তুলনায় শান্ত। ছাদের নিরালায় এক টেরে। খোকনের সামনে একটা টেবিল। তার ওপর বড় প্লেটে কচুরি আর আলুর

দম।

ডলি—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমি মাসিকে বলে আসি ঘরে লোক আছে। একটাই সমস্যা আজ আর কামাই হবে না। টাকাটা আমার গ্যাঁট থেকে যাবে।

খোকন—কত টাকা?

ডলি—তা ধরো পাঁচশো।

খোকন—তুমি আমার জন্যে এতটা করবে স্বপ্নেও ভাবিনি। ভগবান দিন দিলে পাঁচশো কেন, তোমাকে আমি পাঁচ লাখ দেবো।

ডলি—গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। আগে নিজে বাঁচো। আমার যদ্দিন যৌবন আছে তদ্দিন রোজগার আছে। তোমার তো কিছুই নেই।

খোকন—খুনটা দেখে ফেলেই বিপদ করেছি। আমার মোহনদাকে একবার ধরতে পারলে এখুনি একটা রাস্তা বেরোয়। ওরা আমাকে মারবেই, কারণ এই খুনের আমিই তো একমাত্র সাক্ষী।

ডলি—ওই ছোট্ট মাথায় অত দুশ্চিন্তা আর ঢুকিও না। রাতটা আমার খাটের তলায় কাটিয়ে দাও; কারণ মাঝরাতে আমার এক বাঁধা খদ্দের আছে। চুর হয়ে ঢোকে, একটু হাতটাত বুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল হলে তোমাকে পাচার করে দোবো।

খোকন—কোথায় পাচার করবে?

ডলি—আরে দেশে কী জায়গার অভাব আছে? আমি যেভাবে পাচার হয়েছি, তুমিও সেইভাবেই পাচার হবে।

খোকন—তুমি আমার জন্য এত করছ কেন?

ডলি—ন্যাকামি করো না। কেন-র কোনও জবাব নেই। ঝপ করে মেরে দাও, আমি বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে দিয়ে যাচ্ছি।

কালীবাড়ি। মা খুবই জাগ্রত। প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন মন্দির। আরতি হচ্ছে মহা সমারোহে। মালিনী আর পূর্ণা বসে আছে হাতজোড় করে। এধারে, ওধারে আরো দু'চারজন ভক্ত। আরতি শেষ হল। সৌম্যদর্শন

পূজারী হাতে হাতে চরণামৃত দিচ্ছেন।

মালিনী চাপা স্বরে বললে—ঠাকুরমশাই! আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। ঠাকুরমশাই—দাঁড়াও মা, একটু ব্যস্ত আছি। একটু পরে সব শুনব।

ঠাকুরমশাই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উচ্চকণ্ঠে এক সুবেশ তরুণকে ডাকছেন, শোনো বাপি, শোনো বাপি।

যুবকটি ডাক শুনে মন্দিরের সামনের জমিতে উঠে এল রাস্তা থেকে। পূজারীকে প্রণাম করে বললে,

—ভালো আছেন জ্যাঠামশাই? বাবা আজ সকালেই আপনার কথাই বলছিলেন। আপনি কিন্তু অনেকদিন আমাদের বাড়িতে যাননি। একদিন আসুন না। একটু জ্যোতিষ-টোতিস হবে।

—যাবো, যাবো, তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুব দরকার।

—আমাকে বলতে পারেন।

—না, না, সে-কথা তোমাকে বলা যায় না। আমি রবিবার সকাল নটায় যাব। বাবাকে বলে রেখো।

ছেলেটি মন্দিরে মাকে প্রণাম করে চলে গেল। পূজারী সিল্কের উত্তরীয় সামলাতে সামলাতে মন্দিরের দালানে উঠে বিশ্বত্রাতার ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। ঢুলু ঢুলু চোখে মালিনীকে বললেন,

—বলো মা, তুমি যা' বলবে সব আমি জানি। এই পনের তারিখ পর্যন্ত গ্রহগুলা সব তেড়েবেঁকে আছে। সে তোমরা বুঝবে না, মহাকাশে এক মহাচক্রান্ত। এখন কেউ ভালো নেই, কেউ ভালো থাকতে পারে না। এই দেখ না, চোদ্দ বছর পর আমার বাত আবার ফিরে এসেছে। বসলে উঠতে পারি না, উঠলে বসতে পারি না। অথচ এই পা দুটো এই শরীরটাকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা কম ঘোরান ঘুরিয়েছে! তীর্থ থেকে তীর্থে। গোমুখ, গঙ্গোত্রী একসময় আমার কাছে ছিল এপাড়া-ওপাড়া। সব ওই বেটীর খেলা, হাসছে দেখো! খিল খিল করে হাসছে। আমি মাঝে মাঝে জিভটা টেন দিই। আদর, বুঝলে আদর। যা চাইবার ওই বেটীর কাছে চাও, মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই। তোমাদের ধোয়া কাপড়?

মালিনী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুরমশাই—তাহলে যাও, ভেতরে যাও। মায়ের পা দুটো জড়িয়ে

তিনবার কপাল ঠোকো। এই কথার পিঠে বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কপাল লিখিতং ধাতা কোন শালা কিং করিষ্যতি।

ঠাকুরমশাই—কে, কোন অর্বাচীন?

—আজ্ঞে, অর্বাচীন মোহন।

—তুই বাপি, এই সময় কোথা থেকে জ্বালাতে এলি। তোর তো এখন অন্য জায়গায় থাকার কথা বাপি!

—আজ্ঞে, শক্তিসাধনার পীঠস্থানেই তো এসেছি। শক্তির তো দুটো রূপ ঠাকুরমশাই, একটা সলিড, একটা লিকুইড। আচ্ছা, বলুন তো কত রকমের লবণ আছে?

—এ আবার কী অর্বাচীন প্রশ্ন বাপি! এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয়!

—এত শাস্ত্র পড়লেন, এত যজমানকে খলখলে করলেন, এই উত্তরটা জানেন না? এ হচ্ছে গোলাপি রেউড়ির মতো গোলাপি ধাঁধা। শুনুন তাহলে, লবণ, সৈন্ধব লবণ, ভাস্কর লবণ। একই লবণ, প্রথমটা সংসারির ভোগে লাগে, দ্বিতীয়টা দেবভোগে, তৃতীয়টা অম্বলের রোগীর হজমে। শক্তিও সেইরকম ঠাকুরমশাই।

—শোন্ বাপি। সাড়ে তিনশো বছরের এই কালীমন্দিরে এসে আজেবাজে কথা নাই বা বললি।

—ঠাকুরমশাই, সবই মায়ের ইচ্ছা। ছিল সিমেন্টের খরখরে মেঝে, হয়ে গেল পাথরের। দেয়ালে পিঁপড়ে পিছলে যাচ্ছে, আগে পিঠ লাগলে নুনছাল উঠে যেত। আর নিজে হয়েছেন ফ্রিজ থেকে সদ্য বের করা একটি কুলফিমালাই।

—বাপি, হাত জোড় করছি।

—আমার দিকে নয়, ওই মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ান। বলুন, মা ভবতারিণী, আমাকে চৈতন্য দাও মা, আমার অহঙ্কার কিঞ্চিৎ ছেঁটে দাও মা। আজ আছি কাল নেই মা, মরে গেলে কোনো নাম নেই মা।

মন্দিরের পেছন দিক থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ঝুমকো চুলো একটা ছেলে সিঁড়ি দিয়ে দু'ধাপ নেমেছে কি নামেনি মোহন বাঘের মতো তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঞ্জাবির সামনেটা খামচে ধরে দু'বার ঝাঁকানি মেরে মোহন গর্জে উঠল,

—শুয়োরের বাচ্চা, হারামি, তোকে এইবার কোন জগদম্বা বাঁচাবে।

মায়ের পায়ের লাল জবা এক ঝুড়ি চিবিয়ে খেলেও এই হাঁড়িকাঠেই তোর শেষ গতি।

ছেলেটির নাম পরেশ। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। তোতলাতে তোতলাতে বলছে,

—মোহনদা আমি কী করেছি?

ঠাকুরমশাই ভয়ে জড়সড় হয়ে বলছেন—বাপি, এটা মায়ের মন্দির। এখানে ওসব করে না বাপি।

মোহনের হাতের মুঠো এতটুকু আলগা হল না। পরেশের পাঞ্জাবি সেই একই কায়দায় ধরে আছে। আর একটা ঝাঁকানি মেরে বললে—ঠাকুরমশাই, সাড়ে তিনশো বছর আগে এখানে নরবলি হত। সাড়ে তিনশো বছর পরে এই নরছাগলটাকে পাওয়া গেছে। আপনি শুধু এর গলাটা আর খাঁড়াটাকে একটু পুজো করে দিন। এক কোপে নামিয়ে দি।

মোহনের এবার অন্য চেহারা, কেশর ফোলানো সিংহের মতো। একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললে—মা, অনেকদিন নিরামিষ খেয়ে আছিস মা, আজ তোর আমিষ ভোগ।

পূর্ণা এতক্ষণ থম মেরে বসেছিল। সে তরতর কর নেমে এসে মোহনের হাত ধরল,

—কী করছ মোহনদা?

—এই শুয়োরটা একটু আগে মাধুরীকে বলে এসেছে, ইজ্জত যখন একবার গেছেই তখন শরীরটাকে কাজে লাগিয়ে দু'পয়সা ইনকাম কর না। আমার হাতে ভাল ভাল খদ্দের আছে।

মোহন পরেশকে সপাটে একটা থাপ্পড় হাঁকাল। পরেশ ঠিকরে হাঁড়িকাঠের ওপর। মোহন দু'কোমরে হাত রেখে বললে—খাঁড়াটাকে আর অপবিত্র করব না ঠাকুরমশাই। এই পায়রাটার জন্যে ছোট একটা দানাই যথেষ্ট। আমার কোমরের খাপে এই মেশিনটা অনেক দিন উপোস করে আছে।

পরেশ—গুরু, বুঝতে পারিনি, সেমসাইড হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনের এক লাথি। পরেশ কোঁক করে উঠল।

মোহন—আমার পায়ে ধরে কী হবে। আমার এলাকায় মেয়েদের অসম্মান চলবে না। তোকে সবার সামনে মাধুরীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে

হবে।

পরেশ—বেইজ্জত তো আগেই হয়ে গেছে মোহনদা।

মোহনের মার শুরু হল। ঠাকুরমশাই ভয়ে মন্দিরের ঝোলা ঘণ্টাটাকে জোরে জোরে বাজাতে লাগলেন। আর গাঁক গাঁক করে চিৎকার করতে লাগলেন—জয় মা জয় মা।

একটা পুরনো বাড়ির ভাঙা ভাঙা ঘর। রাত গভীর। মোহন মদে চুর। একপাশে গুম মেরে বসে আছে। গুপীদাও অল্পবিস্তর খেয়েছে। মুখটা টকটকে লাল। সোফিয়া টগবগ করছে। যত রাত বাড়ছে ততই তার জেল্লা বাড়ছে।

মোহন গুপীকে বলছে—তুমি কী আমাকে চরিত্রহীন ভাবো?

গুপী—ঠিক উলটো ভাবি। তোমার মতো চরিত্রবান ছেলে এপাড়ায় ক'জন আছে! তুমি শেয়াল নও, তুমি বাঘ। সোফিয়ার বয়েস আমার অর্ধেক। আমি ওর বাপের বয়সী। দুটো জীবন অ্যায়সি মিলে গেছে। সোফিয়া তোমাকে ভালবাসে, তা আমি জানি; কিন্তু তুমি জান, সোফিয়া গুপী ঢ্যামনার বউ। এই অবস্থায় হিন্দি ছবি হলে কী হতো? সোফিয়া আর তুমি আমাকে হাপিস করে ম্যানহোলে ফেলে আসতে। কই তা তো তুমি করোনি মোহন। তোমার কোমরে তো সবসময় মেশিন থাকে। ছোট্ট একটা দানা, ছোট্ট একটু শব্দ, একটা কুত্তার মৃত্যু, একটা লেংটি খতম। তার বদলে তুমি কী করলে! এই শালাকে গুপীদা বলে সম্মান করলে, আগলে রাখলে। তা না হলে এই গুপীদা কবে খতম হয়ে যেত। তুমি এই খাতির কী সোফিয়ার জন্যে করো? না। গুপীর একটা অতীত আছে। পড়তি জমিদার বংশের মুক্‌খু ছেলে। যৌবনে দু'হাতে উড়িয়েছি। সোফিয়াকে ওর দাদুর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে গোটা ভারতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছি। আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস, কেন বাস মোহন?

মোহন—তুমি একটা মানুষ, সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি মানুষ। তুমি আমার মায়ের কথারই উজ্জ্বল উদাহরণ। আমার মা কে বল তো গুপীদা?

গুপী—তোমার মা তো তোমার চার বছর বয়সেই চলে গেছেন।

মোহন—গর্ভধারিণী নয়গো। আমার জীবনদায়িনী, শক্তিদায়িনী মা সারদা, ওই যে তাঁর ছবি। ওই মা বলেছিলেন, শোন মোহন, যখন যেমন তখন তেমন, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। তুমি কেঁচোর মতো বড়লোকি চাল নিয়ে গর্তে ঢুকে মরতে চাওনি। তুমিই হলে একালের জ্যান্ত স্লোগান—লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই।

রয়াল এনফিল্ড মটোর বাইকের বিকট শব্দে মোহনের গলা চাপা পড়ে গেল। সোফিয়া উৎকণ্ঠায় টানটান—

—সেই শুয়োরের বাচ্চা। মোহনদা, আসছে সে।

অন্ধকার রাত। সামনে অমাবস্যা। কালো ঘুটঘুটে নির্মেঘ আকাশ। তারার ঝাঁক ফুল ভোল্টেজে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। সেই অন্ধকারে বিশাল মোটর সাইকেল থেকে নামছে কালোয়ারের ছেলে সূরয। সবাই বলে কালা সূরয, গেরোন লাগা সূর্য। দুটো 'ম' নিয়ে পড়ে আছে। পাতি সাপ্লাই দেয় মালকোঁচা মারা সেকেলে বাপ। শিবের ভক্ত। বাড়িটাই শিবমন্দির। কালা সূরয চোরাই অস্ত্রের ব্যবসা করে। বম্বের মাফিয়াদের সঙ্গে কানেকশান। কালা সূরয গুপীর বাড়িতে ঢুকছে। কাঁধে একটা বড় ব্যাগ। সূরয সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছে। মোহন আর গুপী সুট করে বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। মোহন পাশের একটা গলিতে মোটরসাইকেল রেখেছিল। মোহন বেরিয়ে যাওয়ার সময় সোফিয়াকে বেলেছিল—শিকারটাকে আচ্ছাসে খেলাও। আজকের রাতই ওর শেষ রাত হবে। অন্ধকার গলি ধরে মোহন ছুটছে 'রতন স্টুডিও'-র দিকে।

এদিকে সূরয ঢুকছে। বড়ি চমকিলি রাত।

—মেরি দুলাড়ি। বুঢ়্ঢাটা কোথায়? গন্ধী মাল।

সোফিয়া যেন কতই প্রেমিকা। মায়া মেশানো গলা তার—সেটাকে আউট করে দিয়েছি।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কী! তুমি আমার, আমি তোমার। পুজোর সময় চম্পট। সোজা বোম্বাই। তুমি আমাকে 'সিল্কি স্মিতা' করে দেবে। লাখ লাখ টাকা, গাড়ি, বাড়ি, হীরের গয়না।

সূরয খুব খুশি—এই তো, এই তো, লাইনে এসেছ। তোমার যা ফিগার মাইরি। একটু মেকআপ মেরে নামিয়ে দিলে সব আউট। রাস্তা ঝাড়ু দেবে। খালি একটু নাচাগানা শিখতে হবে।

—আরে ইয়ার সে তো আমি জানি। বিলকুল জানি।

—তাহলে আমাদের ডানকুনির বাগানে এই শনিবার।

—হয়ে যাক। আমার সিল্কের শাড়ি আছে, নকলি সোনার গয়না আছে।

—আরে আসলি পরবে, আসলি। আমার নাম সূরয, তুমি আমার চন্দা।

ওদিকে রতন স্টুডিওর সামনে মোহন। ডাকছে—এই রতন, রতনা।

স্টুডিওর রোলিং-শাটার অর্ধেক নামানো। তলা দিয়ে গলে বেরোতে বেরোতে রতন বলছে,

—গুরু! তুমি এত রাতে!

—শিকার পড়েছে। তোর পোলারাইজটা নিয়ে শিগ্‌গির আয়। একটুও দেরি চলবে না।

এক সেকেন্ড, মালটা লোড করে নি।

—ফ্লপ করে না যেন।

—না রে বাবা, জার্মানির এক নম্বর মাল। শিওর শট। অন্ধকারে শেয়ালের চোখ।

এদের দু'জনকে রেখে আবার আমরা সোফিয়ার ঘরে যাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে সোফিয়া সূরযকে বলছে—কেমন দেখছ?

লোভে সূরযের চোখ দুটো জ্বলছে। সূরয সোফিয়ার ঘাড়ে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলছে—

পাগল হয়ে যাব। শিউজির ষাঁড় আমি।

—ষাঁড় নয়, ভাদ্দর মাসের কুকুর।

—যাঃ, নিজেকে কুকুর বলতে ইচ্ছে করে!

—আগে আলোটা নেবাও।

আলো নিবল। মোহন আর রতন নিঃশব্দে পেছনের খিড়কি দিয়ে ঢুকছে। ডানপাশে একটা উঁচু মতো জায়গায় বসে আছে গুপী। বিড়ির আগুন বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে।

মোহন গুপীকে ফিসফিস করে—বিড়ি ফেলে দাও। হাওয়া ওইদিকে বইছে। গন্ধ যাবে। সব ঠিক আছে তো!

গুপী বিড়ি ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বললে, এই মাত্র আলো নিবেছে।

মোহন আর রতন নিঃশব্দে বেড়ালের মতো ভেতরে চলে গেল। গুপী বাইরেই বসে রইল। অন্ধকারে দুটো সিল্যুয়েটের নড়াচড়া। মোহন রতনের কানে কানে জিজ্ঞেস করলে—শাটারের শব্দ হবে না তো?

—না। ক্যামেরাটা কম্পিউটারাইজড।

—সাবাস বিজ্ঞান।

সূরয ইতিমধ্যে অন্ধকারে বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। সেমিফাইনাল থেকে ফাইনালে যাবে, এমন সময় দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। সূরয চমকে উঠেছে। ঠিক দরজার সামনে দীর্ঘকায় মোহন, পাশে রতন পালোয়ান।

মোহন বরফ শীতল গলায় বললে,—সূরযবাবু, ইঁদুর কলে পড়েছ। বেশি রং নেবার চেষ্টা করো না। এই যে দেখছ যন্তরটা, পোলারাইজড ক্যামেরা। এর ভেতরে আছে তোমার মৃত্যুবাণ।

সূরয চাদর জড়ানো অবস্থায় ঘরের এক কোণে উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললে—মোহনবাবু, আপনি এইসময় এখানে?

মোহনেরও সেই একই প্রশ্ন—সূরযবাবু, আপনি এইসময় এখানে? ব্যাগে কত মাল আছে?

—কেন মোহনবাবু?

—আজ রাতে পঁচিশ হাজার ক্যাশ। এরপরে মাসে মাসে একলাখ।

—আমার সঙ্গে দিল্লাগি করছেন?

—তাহলে এই তিরিশখানা ছবি আপনার বাবার কাছে, বউয়ের

কাছে, আপনার শ্বশুর, শাশুড়ির কাছে পাঠিয়ে দিই।

—আপনার মতো লোক আমাকে ব্ল্যাকমেল করছেন।

—ও সব ঢঙের কথা খুব হয়েছে, যা বলছি তাই কর। তা না হলে আমি যা বলেছি তাই হবে।

—এতে তো সোফিয়ার ভি ক্ষোতি হোবে।

—সে জন্যে তো আমি আছি।

—দেখুন মোহনবাবু, আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো কাম হোবে না, বোরোং আপনার ক্ষোতি হোবে।

—আমার যে ক্ষতি করতে পারে সে এখনো জন্মায়নি রে শালা। এইবার আমি তোর কী হালত করি দেখ।

মোহন রতনের দিকে ফিরে বললে—এই তোর কাছে লাইটার আছে?

—আছে।

—একটা কাজ কর। এই শালার গন্ধী শার্ট, ট্রাউজার, জাঙ্গিয়া—সব বাইরের বাগানে একটা খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে লাইটার মেরে দে। ছাই করে দিয়ে চলে আয়।

সূরয একটা হুঙ্কার ছাড়ল—রতন, তুমি মোহন নও।

.মোহন বললে—রতন, তুই আমার ছাতার তলায় আছিস। তোর টিকি কেউ ছুঁতে পারবে না।

—জানি গুরু, রতন তিনবার মরতে মরতে বেঁচেছে। আমি মরতে ভয় পাই না। সূরযবাবু আজ তুমি নাঙ্গা হয়ে বাড়ি ফিরবে। কেমন লাগবে। তোমার ছেলে দেখবে, মেয়ে দেখবে।

মোহন বললে—তোমার ওপর আরো একটু কাজ হবে। কপালে একটা উল্কি করে দোবো। জীবনে উঠবে না, আর শব্দটা এতই অশ্লীল যে নিজের মুণ্ডু নিজেকেই না কাটতে হয়।

মোহন কথা বলতে বলতে ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। এ মোহন সেই মোহন, যে সবকিছু গুঁড়িয়ে দিতে পারে। দু'হাত তুলে অদ্ভুত একটা গলায় বললে—আজ, চতুর্দশী। ওর সভ্যতার খোলস পুড়িয়ে ছাই করে ঘাড় ধরে রাস্তার চৌমাথায় নিয়ে গিয়ে ল্যাম্প-পোস্টে বেঁধে রাখ। ভাবছে, ওই চাদরটা লজ্জা নিবারণ করবে। ওটাও খুলে নেওয়া হবে টান মেরে।

সূর্যকুমার! সামনের ইলেকশানে বিধানের পার্টি না কী টিকিট দিচ্ছে তোমাকে? ভেতরের খবরটা বলে দি—পার্টির ভেতরের কোঁদলে বিধান আউট হয়ে যাচ্ছে। এই ছবিগুলো পার্টিরও কাজে লাগবে। রতনে রতন চেনে। দুই মালই আউট। খামে ভরব আর ভেজে দোব।

সূরয—আমার কাছে এখন অত টাকা নেই।

মোহন—কত আছে?

সূরয—দশ, পনের হবে। দুটো বিলিতির বোতল আছে।

মোহন—রতনা ব্যাগটা সার্চ কর।

সূরয বাধা দেবার চেষ্টা করতেই মোহন মারল এক ঝটকা। সূরয পিংপং বলের মতো ঠিকরে গেল। মোহন হাসছে—

—বেটার অবস্থা দেখ রতন! বেহালার মতো করুণ!

রতন—বেহালা! জায়গা না বাজনা!

মোহন—বাজনা রে বাজনা। আজ পর্যন্ত বেহালায় করুণ সুর ছাড়া কিছু বাজতে শুনেছিস। বেহালা হল ভারতীয় নারী। কান্নার জন্যেই তার জন্ম।

রতন ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকে মোড়া ছোট একটা পুরিয়া বের করে মোহনকে দেখাল—

মোহনদা, মালটা কী?

মোহন—একবার থান্যয় ফোন কর। বুঝতে পরবে মালটা কী! নারকোটিক্স। দেশের যুবশক্তিকে গোল্লায় পাঠাবার সাদা গুঁড়ো। ভাল মাল পেয়েছিস রতন। ওইতেই বছর দশেক ঘানি ঘোরাবে। মামাদের আদরে ভাগনে ভালই থাকবে। জরিমানাও হবে যথেষ্ট।

সূরয—উল্টোটাও হতে পারে মোহনবাবু। মালটা এখন তোমার হাতে। আমি অস্বীকার করব। পুলিশ তোমাকেও চেনে। আমার চেয়ে ভাল চেনে।

মোহন—চেনা কাকে বলে, জানো তুমি সূরয। দু'রকম চেনা আছে রে মর্কট। প্রকৃত চেনা আর ওপর ওপর চেনা। তবু তোমাকে যাতে চিনতে ভুল না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব কালাচাঁদ। রতন তোর ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ আর ডটপেনটা বের কর। সূরযবাবু এইবার আমি একটা জিনিস বের করি।

মোহন কোমরের কাছ থেকে একটা রিভলভার বের করল, দু'পা পেছিয়ে গিয়ে একটা টুলে বসল। নলে একটা ফুঁ মেরে সূরযের দিকে তাক্ করে বললে—যা বলছি, ওই কাগজটা লেখ—আমি সূরয সিং, আমার নাম মহাবীর সিং। ঠিকানা, ছ'নম্বর নবকৃষ্ণ নন্দী লেন। আমি হেরোইনের চোরা চালানদার। আমার এই ব্যাগ থেকে মোহনলাল যে প্যাকেটটা বের করেছে তার মালিক আমি। হয়েছে লেখা?

সূরয—আমি বাংলা লিখতে জানি না।

মেহান—একটি থাপ্পড়ে তোমার বদন ঘুরিয়ে দেবো রাসকেল। যা বলছি লেখ্—শালা, বরাহনন্দন।

সূরয—তুমি আমায় গুলি করতে পারবে না। গুলির শব্দে লোক ছুটে আসবে। আমি মরে গেলে তোমাকে পুলিশে ধরবে। তোমার ফাঁসি হবে। এটা হিন্দি সিনেমা নয় মোহনলালবাবু।

মোহন সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে রতনকে বললে—

ওর গায়ের চাদরটা খুলে নিয়ে পাকিয়ে পাখার হুকে বাঁধ। একটা ফাঁস তৈরি কর। বহুত ভ্যানতাড়া হয়েছে। চল, ঝুলিয়ে দিয়ে থানায় যাই। একটা এফ আই আর করে আসি। সোফিয়াকে রেপ করছিল, আমরা দেখে ফেলায়, ব্যাটা পেটাইয়ের ভয়ে ঝুলে পড়েছে।

সূরয বললে—কেন অত ঝামেলা করছ মোহনলাল। তোমার অনেক ক্ষমতা, অনেক খুন করেছ তুমি, সব আমি জানি। তবু আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। আমি.জানি, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে ছারপোকার মতো টিপে মেরে ফেলতে পার। আমার অনেক পাপ। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। আমার অন্যায় হয়েছে। এইবার তোমার যা ইচ্ছে হয় আমাকে কর। তোমার কাছে সারেন্ডার করলে তুমি অপরাধীকে ক্ষমা কর, তা আমি জানি। আমি এমন কাজ আর কখনও করব না মোহনলাল। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা রইল না। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু। তুমি আমাকে ভাল হওয়ার সুযোগ দাও।

মোহন—সত্যিই তুমি আমার বন্ধু হতে চাও?

সূরয—জরুর! আমার জবানের দাম আছে।

মোহন—তাহলে বলো, এই সাদা গুঁড়োর পেছনে কে কে আছ?

সূরয—আমি তোমাকে বলব, তবে আজ নয়। আমাকে আরো একটু

জানতে হবে। আমি ছুটকোগুলোকে জানি, আসল রাজা কে জানতে পারিনি। তোমার মতো আমিও জানতে চাই, খতম করে দিতে চাই। আমার ব্যাগে পঁচিশ হাজার আছে, সোফিয়াকে দিয়ে দাও। আজ থেকে সোফিয়া আমার বন্ধু। ছবিগুলো তোমার কাছেই থাক, তাতে তোমার কাছে আমার টিকি বাঁধা থাকবে। আমি তোমার দুশমন না দোস্ত, আগে প্রমাণ করি। তুমি মনে রেখ, ওই ছবিতে সোফিয়া ভি আছে। এইবার তুমি আমার লজ্জা ফেরত দাও।

মোহন—রতন। ওর জামা, প্যান্ট ফেরত দে।

রতন—গুরু। তুমি বিশ্বাস করে বিপদে পড়বে!

সূরয তার ব্যক্তিত্ব ক্রমশই ফিরে পাচ্ছে। যতই হোক, সূরযেরও পাওয়ার আছে। টাকা আছে। নেতাদের টাকা খাওয়ায়। এক গাদা গুণ্ডা পোষে। ব্যঙ্গের গলায় রতনকে বললে—

—আরে এই ফটোওয়ালা, রাজায় রাজায় কথা হচ্ছে দোস্ত। তুমি একটু চুপ থাক। এ তোমার অন্ধকারে তসবির খ্যাঁচা নয়। এ ইস্যুটা অনেক বড়, ইন্টারন্যাশনাল।

ক্লান্ত মোহনলাল মাধুরীদের বাড়ির সামনে বাইক থেকে যখন নামল, তখন গভীর রাত। হাওয়া ঘুরে গেছ। তারাদের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। হেডলাইটের আলোয় ফাঁকা রাস্তা এক ঝলক দেখা গেল। মাধুরীদের বাড়ির ভেতর থেকে সেতারের মিহি আলাপ ভেসে আসছে। মোহন অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে, তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে কলিংবেল টিপল। সেতার আর বেল একসঙ্গে বাজছে। সেতার থেমে গেল। দরজা খুলল মাধুরী।

মাধুরী—এ কী! এত রাতে তুমি কোথা থেকে এলে?

মোহন—তোকে বড় দেখতে ইচ্ছে হল।

মাধুরী—দেখে তো মনে হচ্ছে একেবারে বিধ্বস্ত।

মোহন—সারা জীবন ছ্যাঁচড়ামি করতে করতে আমি ছিবড়ে হয়ে

গেলুম। কিছু খেতে দিবি রে!

মাধুরী—তুমি হাত-মুখ ধোবে তো।

মোহন—আরে ধুস। আমি এই বারান্দায় আমার বেতের চেয়ারটায় বসছি। তুই কুড়িয়েবাড়িয়ে যা পাস নিয়ে আয়। পেটে আগুন জ্বলছে।

মাধুরী—ও শোনো, ভাগ্যিস মনে পড়ল—একটা উটকো ছেলে এসে তোমার নামে একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

মোহন—এখানে?

মাধুরী—হ্যাঁ, এখানে।

মোহন—তার মানে সকলেই জেনে গেছে, এইটেই আমার বাড়ি। যাব্বাবা! যার কোনো চালচুলো নেই, দালান-কোঠা ফেলে দিয়ে যার শ্মশানে বৈঠকখানা, পাবলিক তার মাথার ওপর ছাত তৈরি করে দিলে! দে, দে, চিঠিটা দে। নিশ্চয় জরুরি। তুই খুলে দেখিসনি?

মাধুরী—তোমার চিঠি, তোমার অনুমতি ছাড়া পড়বো কেন?

মোহন—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?

মাধুরী—পড়বে না! রাত কত হল বল তো!

মোহন—তুই কেন জেগে আছিস?

মাধুরী—যদি বলি তোমার জন্যে!

মোহন—শোন, তুই আর আমাকে দুর্বল করে দিস না। যা, চিঠিটা নিয়ে আয়।

মাধুরী—এই বারান্দাতেই থাকবে? ভেতরে আমার ঘরে আসবে না?

মোহন—তুই একটা আইবুড়ো মেয়ে, আমি একটা আইবুড়ো ছেলে। এই গভীর রাত, সবাই ঘুমুচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলা উচিত ছিল। বারান্দা পর্যন্ত এসেছি, এইটাই তো যথেষ্ট দুঃসাহস।

মাধুরী—যাকে দেখে পাড়ার সমস্ত লোক কাঁপে, সে নিজে এত ভীতু! তুমি যখনই কলিং বেল বাজিয়েছো, জেনে রাখ, বিছানা না ছাড়লেও সবাই জেগে আছে।

মোহন—শোন বাঘকে সবাই ভয় পায়; কিন্তু তুই যদি বাঘের সামনে ভটাস্ করে একটা ছাতা খুলিস, বাঘ ভয়ে পালাবে। আমি মানুষকে মেরে চৌপাট করে দিতে ভয় পাই না; কিন্তু মেয়েদের প্রেমকে ভয় পাই। ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর ফাঁস পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

মাধুরী—যে এত ভাল গান গায়, তার ভেতরে প্রেম নেই, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে!

মোহন করুণ গলায় বলল—ভীষণ খিদে পেয়েছে রে।

মাধুরী ভেতরে চলে গেল। বারান্দার আলো-আঁধারিতে বসে আছে মোহন। হুসে হুসে ঝুলছে অর্কিডের টব। মোহনের পাশে একটা সেন্টার টেবল, অ্যাশট্রে। কে একজন সামনের পথ দিয়ে যেতে যেতে কাশছে।

মোহন জিজ্ঞেস করলে—কে যায়?

পথিক জড়ানো গলায়—কে কয়?

মোহন গলা শুনে চিনতে পেরেছে—আরে হারুদা।

হারু জড়ানো গলায় বললে—এই তো রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। এত রাতে এই ঠেকে কী করছ বাওয়া! এটা কী তোমরা কাফেটেরিয়া?

মোহন গলা নকল করে—বিরিয়ানি খাচ্ছি বাওয়া।

হারু—যার যেমন বরাত! তুমি খাচ্ছ বিরিয়ানি, আমি খাচ্ছি বিড়ি।

মোহন—কতটা চড়িয়েছ?

হারু—রোজ যা চড়াই।

মোহন—মাতাল হয়ে গেছ, বাড়ি যাও।

হারু—বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি।

হারু সুন্দর সুরেলা গলায় গান ধরল—ভালবাসা মোরে ভিকিরি করেছে, তোমারে করেছে বাড়িউলী। ঢুকলেই মুড়ো ঝ্যাঁটা, সারারাত চুলোচুলি।

মোহন—হারুদা, বাড়ি যাও প্লিজ।

হারু—দেখ মাইরি। ইংরিজি বলে অত খাতির করিসনি। বলো—এই শালা হারু বাড়ি যা। হ্যাঁগা, তুমি কে?

মোহন—তোমার মতোই এক পথহারা পথিক।

হারু—তা পথে নেমে এস ভাই, গলা জড়াজড়ি করে গান গাই।

হারু গান গাইতে গাইতে অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে চলে গেল। মাধুরী সেন্টার টেবিলে প্লেট, চামচ রাখছে। সামান্য টুং টাং শব্দ। মোহন মাধুরীকে দেখছে। মায়া আসছে, ভালবাসা জাগছে। শক্ত, উন্মত্ত পৃথিবী ক্রমশ নরম হচ্ছে। মাধুরীকে স্পর্শ করার, আদর করার বাসনা

হচ্ছে। কোথাও, কোনোখানে নতুন একটা জীবন শুরু করার ইচ্ছে।

মাধুরী বললে—এই নাও সেই চিঠি।

মোহন—তুই পড়। আমি ততক্ষণ খাই।

মাধুরী আলোর দিকে সরে গিয়ে চিঠি পড়ছে,

'মোহনদা, আমি খোকন। কাদের বক্স লেনের সাত নম্বর বাড়ির চিলেকোঠায় লুকিয়ে আছি। এপাড়ায় মেয়েটার নাম ডলি। তুমি কাল দুপুরে একবার যদি আস। তোমাকে সব কথা বলে হালকা হতে চাই। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে দেবীর মতো এই মেয়েটি। তুমি অবশ্যই আসবে। খোকন।'

মাধুরী বললে—খোকনের চিঠি। বেঁচে আছে। যাক বাবা।

মোহন বললে—কতদিন বাঁচবে! যাক, কাল যা হয় হবে। কী রেঁধেছিস মাধুরী! আগের জন্মে সিওর তুই দ্রৌপদী ছিলিস।

মাধুরী—ক্ষিধের মুখে সবই ভাল।

মোহন—তুই সব তুলে নিয়ে যা। এইখানটায় আমি একটু আরাম করি।

মোহন বেতের চেয়ারে শরীরটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে ঘাড়টাকে বাঁদিকে হেলিয়ে তার সেই বিচিত্র ভঙ্গিতে নিমেষে চলে গেল ঘুমের জগতে। স্বপ্ন দেখছে। সেই একই স্বপ্ন। রোজ আসে। বিরাট এক বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন তার মা। পেছনে একটা নদী। ঘাটে বাঁধা একটা নৌকো ঢেউয়ের দোলায় দুলছে।

মোহন—মা, তুমি কখন এলে?

মা—দেখতে এলুম, তুই কেমন পিকনিক করছিস?

মোহন—এই দেখ না মা, উনুন ধরছে না, বারে বারে নিবে যাচ্ছে।

মা—দাঁড়া, ওটা তোর কাজ নয়। আমি সূর্যের কাছ থেকে আগুন আনি। মোহন—সে তো অনেক দূরে মা, তুমি কাছে গেলে ছাই হয়ে যাবে।

মা—আমি তো ছাই হয়েই গেছি।

ঘাট থেকে নৌকো খুলে গেল। মা ভেসে যাচ্ছেন মাঝ-নদীর দিকে।

মোহন চিৎকার করে বলছে—মা, আমাকে নিয়ে যাও। এ জীবন আমার ভাল লাগছে না।

মা দূর থেকে বলছেন—তোর এখনও সময় হয়নি। অনেক বাকি। পথটা দেখে রাখ, সময় হলে চলে আসিস চিনে চিনে।

নদী, ঢেউ, দিগন্ত, জনপ্রাণীহীন বিস্তার। বাস্তবে মোহন অন্যকে কাঁদায়, স্বপ্নে সে নিজে কাঁদে।

এপার ওপার

বসে বসে হাওয়া খাচ্ছিলুম! ফুরফুরে সুন্দর বাতাস। শুনছিলুম পাখির ডাক নয় কূজন। এখানে সেইরকমই বলে। নদীকে বলে স্রোতস্বতী। কখনও বলে, তটিনী। প্রবীণরা বলেন, প্রবাহিনী। কখনও কারোকে নদী বলতে শুনলুম না। এখানে এসে প্রথম প্রথম পুরনো অভ্যাসে নদীই বলে ফেলতুম, পরে নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছি।

যেখানে বসে আছি সেটি একটি মনোরম উদ্যান। সুন্দরী অপ্সরাগণ ইতস্তত মনের হরষে বিচরণ করিতেছেন। তবে সেই একই পৃথিবীমার্কা কেস। পুরুষদের পাত্তা দিতে চায় না। একজনকে মনে ধরায় কাছাকাছি গিয়ে একটা কুপ্রস্তাব দিয়েছিলুম। বলেছিলুম, 'চল না, গড়ের মাঠে গিয়ে দু'জনে পাশাপাশি হাতে হাত রেখে বসে দশ-বিশ টাকার চিনেবাদাম খাই।'

প্রসঙ্গত বলে রাখি, পৃথিবীতে যা যা আছে স্বর্গেও তা তা আছে। অবিশ্বাসীর প্রশ্ন হতে পারে, কি করে জানলে বাছা? সোজা উত্তর, আমি স্বর্গে এসে দেখছি। একদম সরাসরি রিপোর্টিং। পৃথিবীতে থাকতে থাকতেই শুনেছিলুম, পৃথিবীটা ব্রহ্মের মায়া। ব্রহ্মা নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন দেখে চলেছেন আর পৃথিবীতে বাস্তব হয়ে সেইসব ফুটে উঠছে। কিছু ক্ষণস্থায়ী, কিছু দীর্ঘস্থায়ী। সহজ করে বললে বলতে হবে, পৃথিবীটা একটা জেরক্স কপি। দীর্ঘস্থায়ী আর ক্ষণস্থায়ী বলতে কি বোঝায় একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ধরা যাক, কলকাতার গড়ের মাঠ। মাঠ আর মনুমেন্ট দীর্ঘস্থায়ী। মনুমেন্টের তলার মানুষ, ভেলপুরিআলা, ফুচকাআলা, আখমাড়াইআলা, ছিনতাইবাজ, তেলমালিশ, প্রেমিক-প্রেমিকা, অগ্নিবর্ষী নেতা—এরা সব ক্ষণস্থায়ী মায়া।

আর একটু ক্লিয়ার করতে হলে দোলের সময় রঙ খেলার উপমায় যেতে হবে। কিছু রঙ ধোয়া মাত্রই হাওয়া। এক ধররেন বাঁদুরে রঙ আছে, তিনদিন, চারদিন এমনকি এক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে পুরোপুরি উঠতে। কাপড়ের রঙের উপমা দিয়েও বোঝান যায়। জলে পড়া মাত্রই সব রঙ ভর-ভর করে উঠে গেল। বললে, 'ফাস্ট কলার'। আর এক ধরনের রঙ আছে, কাপড় না ছেঁড়া পর্যন্ত থেকে যায়। একে বলে 'পার্মানেন্ট কালার'। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে দিয়ে এই ক্ষণমায়া আর দীর্ঘমায়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা, তামাসা, ইয়ার্কি একদম চলে না। এটা হল গিয়ে আমাদের অস্তিত্ব, অনস্তিত্বের প্রশ্ন। আমরা সত্য-সত্যই আছি না নেই। খুব মাইন্যুটলি বোঝা দরকার। স্বপ্নে খুব বিরাট একটা বাঘ এসেছিল। ভয়ে পালাতে গিয়ে মশারি-ফশারি ছিঁড়ে মেঝেতে পড়ে গেছি। ঘুম ভেঙে গেছে। এইবার এটাকে ফ্রিজ করে রেখে, বোঝার চেষ্টা করা যাক। বাঘটা স্বপ্ন, খাট থেকে মাটিতে পড়ে আছি এটা কি স্বপ্ন! তেষট্টি নম্বর বাড়ির দোতলায় সত্যশরণ পড়ে আছে, খাটে শুয়ে আছে স্ত্রী, ফুলুৎ-ফুলুৎ নাক ডাকছে, যেন রসে ভেজান দুটো ছোট মাপের লিচু দু-নাকের ফুটোয় অনবরত ওঠা-নামা করছে। ফুলুট বাঁশির মতো। ফুঁ দিলেই ফুত্। এটি কেমন করে স্বপ্ন হয়। আর কিঞ্চিৎ পরেই ওই নাসিকাদ্বয়ের অধিকারিণী জাগ্রতা হইয়া জগন্মাতা দুর্গার ন্যায় একটা হুঙ্কার ছাড়িবেন, তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপুরিতং নভঃ। মহান্ ঘোর গর্জনে...

না, এটা স্বপ্ন হতে পারে না, এ কখনই মায়া নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব! মেঝেতে যে পড়ে আছে সে বাস্তব, বিছানায় শায়িতা যিনি তিনিও বাস্তব। বৈদান্তিক মায়াবাদী বললেন, 'ধুর্ ব্যাটা! বোকা পাঁঠা! বাঘের স্বপ্ন দেখে খাট থেকে পড়ে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলে বুঝতে পারতে স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন। ঝিনুকের ভেতর মুক্তো, নারকোলের ভেতর জল যেমন। বিরাট একটা স্বপ্নের ভেতর কিছু খুচরো স্বপ্ন আর কি! দাঁড়াও, আরো একটু ক্লিয়ার করে বোঝাই। মানিব্যাগে বড় নোট-ছোট নোট, খুচরোখাচরা। ব্যাগ থেকে রোজ টাকা-পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। আলু, পটল আসছে। গপাগপ খেয়ে উড়িয়ে দিলে, তখন পয়সাও নেই, আলু-পটলও নেই। স্বপ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাগটা তখনও আছে। এইবার ধর, ব্যাগটা পকেটমার হয়ে গেল! খেল খতম! তুমি একটি স্বপ্ন-ঠাসা স্বপ্ন-ব্যাগ।'

দাঁড়াও, আর একভাবে বলি।

মোটামুটি বুঝেছি। যেটুকু বুঝিনি, সেটুকু বাঁচতে বাঁচতে বুঝে যাব।

নাছোড়বান্দা বৈদান্তিক—না হে, হচ্ছে যখন হয়ে যাক। আর একটু চাপালেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। ধর, তুমি দেখছ, একটা সাপ আর একটা ব্যাঙ। সাপটা ব্যাঙটার দিকে এগোচ্ছে। এইবার কপ্! সাপ ব্যাঙটাকে গিলে ফেলেছে। কি দেখছ?

'দেখছি ব্যাঙটা নেই, সাপটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে, পেটের কাছটা ঢ্যাবলা, ব্যাঙটা অবশ্যই ওই জায়গায় আছে।'

'সে থাক। একটু পরে ওই ফোলাটা থাকবে না।'

'সাপটা কিন্তু রয়েছে। বহাল তবিয়তেই আছে।'

'থাকবে না, আমি এক্ষুনি সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওই দেখ, ঝোপের মধ্যে থেকে একটা তাগড়া বেঁজি বেরিয়ে এল। একটু অপেক্ষা কর। কি দেখছ?'

'সাপে-নেউলে।'

'এইবার কি দেখছ?'

'সাপটা নেউলের পেটে।'

'শুরুটা কি দিয়ে করেছিলে?'

'সাপ আর ব্যাঙ দিয়ে। বেঁজিটা কিন্তু রয়েছে।'

সে ব্যবস্থাও রয়েছে। ওই দেখ, ব্যাধ।'

'তাহলে সব শেষে কি ব্যাধ! সাপ, ব্যাঙ, বেঁজি মিথ্যা, মায়া, স্বপ্ন, একমাত্র ব্যাধই সত্য।'

'না, ব্যাধের আন্ত্রিক হবে। ব্যাধও মারা যাবে।'

'তাহলে আন্ত্রিক সত্য, বি হেপাটাইটিস সত্য, ক্যানসার সত্য।'

'না। এত করে বোঝাচ্ছি, বুঝছ না কেন! স্বীকার করি, বেদান্ত খুব কঠিন ব্যাপার, তবু অনেকেই তো বুঝেছেন। যা আছে তা নেই হবে একদিন, যা নেই তা আছে হবে একদিন। সত্য যা, তাহল একটি ইরেজার। লেখা হচ্ছে আর মোছা হচ্ছে।'

পৃথিবীতে যা বুঝিনি, স্বর্গে এসে তা একেবারে ক্লিয়ার। জলবৎ তরলং। ক্লিয়ার হত না, যদি না একদিন ঘুরতে ঘুরতে সেই জায়গাটায় গিয়ে পড়তুম। দূর থেকে প্রথমে মনে হয়েছিল কুম্ভমেলা বুঝি। অশান্ত কুম্ভ

নয়, শাস্ত কুম্ভ। শত সহস্র সন্ন্যাসী চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। নট নড়ন-চড়ন। তাঁরা যে স্বর্গোদ্যানে ধ্যানস্থ তার মাঝখানে সুন্দর একটা কাঁচের ঘর। উদ্যানের প্রবেশতোরণে লেখা রয়েছে—ব্রহ্মার নিকেতন = ব্রহ্মনিকেতন। তার তলায় লেখা ইংরেজিতে, ফুললি কম্প্যুটারাইজড। টেকনোলজি ইম্পোর্টেড ফ্রম জাপান অ্যান্ড কন্ট্রোলড বাই জাপানিজ টেকনোলজিস্ট। স্যাটেলাইট কম্যুনিকেশন—কার্টসি ইউ.এস.এ। সুন্দর কিমোনো পরা শতখানেক জাপানি সুন্দরী, প্রজাপতির মতো উড়ছে।

পৃথিবীতে যে ক'বছর আমি ছিলুম, ধর্ম-কর্ম আমার ধাতে সইত না। বাড়িতে পুজোপাঠ হলে পালিয়ে গিয়ে সিনেমা হলে বসে থাকতুম, হয় জেমস বন্ড, না হয় রগরগে কোনও হিন্দি। মোগলাই আর কষা মেরে বাড়ি ফিরে আসতুম। সিন্নি, দধিকর্মা একেবারে সহ্য হত না। ভোগের খিচুড়ি মন্দ লাগত না। জীবনে একবারই ধর্মসভায় গিয়েছিলুম। বক্তা ইনিয়ে-বিনিয়ে একই কথা দেড়ঘণ্টা ধরে বলে গেলেন; রাজনৈতিক বক্তৃতার মতো, কেন্দ্র আর রাজ্যের বিষাক্ত সম্পর্ক, জীব আর ভগবানের সম্পর্ক। পাশ ফিরলেই ভগবানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাবে, তবু আমরা জীবন জীবন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথায় ভগবান! কত বড় ইডিয়েট আমরা। কত বড় জানোয়ার! আহার, নিদ্রা, মৈথুন, একেবারে কুকুর ব্র্যান্ড। দেড়ঘণ্টা ধরে খুব বকাঝকা করলেন। অনেক আগেই উঠে পড়তুম; কিন্তু ভুল করে বসে পড়েছিলুম সভার মাঝখানে। দেখতে দেখতে দেরাদুন এক্সপ্রেসের সেকেন্ড ক্লাস। যেখানেই পা ফেলবে সেখানেই মানুষ। অতক্ষণ বসে থাকার ফলে পায়ের রক্তচলাচল বন্ধ। দাঁড়ানো মাত্রই থ্যাস। ময়দার লেচির মতো লেদকে গেলুম এবং বিবাহ!

এই দ্যাখ, এই হল বাঙালির প্রবলেম। কোথা থেকে যে কোথায় যাবে, নিজেও জানে না, অন্যেও জানে না। চটিজুতো। পৃথিবীর কোন্ কাজের দেশের মানুষ চটি-জুতো পরে, ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বউকে 'শুনচো শুনচো' করে! বলা নেই, কওয়া নেই ছেলে-মেয়ে, বউ, লকস্টক ব্যারেল নিয়ে—এলুম রে বলে অন্যের বাড়িতে গিয়ে অসময়ে হাজির হয়। চোখ কপালে উঠে গেলেও মোটামাথা বুঝতে পারে না। ভাবে আনন্দে চক্ষু ছানাবড়া!

ধর্মসভায় বক্তৃতা শুনছিলুম। পায়ে ঝিনঝিনি। সেখানে বিবাহ এল

কোথা থেকে?

এল। এসে গেল। থপাস্ করে সে পড়লুম কোলাব্যাঙের মতো বউয়ের কোলে। মেরে মালাইকারি করে দিত। নেহাৎ দেড় ঘণ্টা ভগবানের প্রেমের আরকে সবাই বিভোর হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় বাড়িওলা-ভাড়াটেও কিছুক্ষণের জন্য আয় ভাই কানাই। ট্র্যাফিক পুলিশ লরির ড্রাইভারকে বলত, যাঃ, কি করছিস, টাকা পকেটে রাখ, লজেঞ্চুস কিনে খাস রামুয়া।

মেয়েটি কেবল বললে, 'কি হচ্ছে অসভ্যতা। নেমে বসুন, কাতুকুতু লাগছে যে!'

এতকাল কাঠের চেয়ারে বসেছি। সদ্যযুবতীর নরম কোল যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ধর্ম, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, গুহা, কাঁকড়া বিছে, মাধুকরী, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা সব বরবাদ। অসহায় শিশুর মতো বললুম, 'আমাকে ঝেড়ে চটের ওপর ফেলে দিন, নড়ার ক্ষমতা নেই, আমি ইচ্ছে করে পড়িনি, কোল্যাপস করেছি।'

এত পাজি মেয়ে! পাশেই পিসিমা। কোলের ওপর আমি, ডিক্লেয়ার করে দিলে চিৎকার করে, আমার ভাব হয়েছে। আর আমার কানে কানে বললে, 'বক্তৃতায় তো বৃন্দাবন দেখা গেল না, এইবার পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাবে, ভাল চাও তো ভাবে চলে যাও, আমিও তোমাতে পড়ে গেছি।'

'পড়ে গেছি', শুনে সত্যিই আমার ভাব এসে গেল। ভগবানের পাওয়ার জানি না তবে যুবতী যে 'পাওয়ার প্যাক' তৎক্ষণাৎ মালুম। ভগবান হোমিও, বরবর্ণিনী কড়া পেনিসিলিন। তাকেই জিজ্ঞেস করলুম, ফিসফিস করে, 'ভাব কি করে করতে হয়!'

সে বললে, 'উল্টো ভাব!'

'উল্টো মানে? উল্টে গিয়ে ভাবপ্রকাশ করব?'

সে বলল, 'গর্দভ।'

কোনও কোনও পরিস্থিতিতে, কোনও কোনও কণ্ঠে এই প্রাণীটি এত মহৎ ও মহনীয়! পনেরো মিনিট আমি তার ক্রোড়াসীন গর্দভ! কোল তো নয়, বেশ জমাট একটি বার্থডে কেক! কে বলেছে, স্প্রিং শুধু সোফাতেই থাকে, এইসব কোলেও থাকে।

সে বললে, 'উল্টো মানে, নিজেকে মেয়ে ভাব। যে সে মেয়ে নয়,

স্বয়ং শ্রীরাধিকা। আমাকে ভাব কৃষ্ণ। কৃষ্ণের কোলে রাধিকা, রাধিকার কোলে কৃষ্ণ নয়। চোখ দুটো আধবোজা, সর্বাঙ্গ শিথিল। বিড়বিড় করতে থাক, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ।'

সবাই বলতে লাগলেন, 'ভাই রে! সনাতন ব্রহ্মচারীর বক্তৃতা। সে কি বিফলে যাবার। চোখের সামনে সব দেখ, সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তারা তা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন।'

একজন প্রবীণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কি ব্যবস্থা?'

বক্তা বললেন, 'এই যে সামনে, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।'

প্রবীণ আশান্বিত হয়ে বললেন, 'আমাদের জন্যেও তো একই প্রেসক্রিপশান!'

বক্তা বললেন, 'একই, তবে সামান্য পরিবর্তন, যুবতী মেয়ের জায়গায় বৃদ্ধা নারীর কোল।'

এক জ্ঞানী বললেন, 'ওই প্রবচনটির রূপক আপনারা ভেদ করতে পারেননি ভাই, মাগুরমাছের ঝোল আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, যুবতী মেয়ে কিনা—পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা—ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।'

এক মহিলা, এক একজন মহিলা থাকেন না, সব ব্যাপারে কত্তাত্তি, এত বড় বড় ঢ্যালা ঢ্যালা চোখ বের করে বললেন, 'মেয়েটার কোল থেকে তো এটাকে তুলতে হয়, তা না হলে তো সারা জীবন কোলের খোকাটি হয়ে বসেই থাকবে!'

ওপাশ থেকে এক মহা শয়তান বললে, 'মাইকম্যানকে বল না, কে আর রহমানের বন্দে মাতরম্‌টা চালাতে, আপনি উঠে দাঁড়াবে।'

একগাদা লোকের সামনে আমারও খুব অস্বস্তি হচ্ছে। উঠলেই ওঠা যায়, কিন্তু জানি না, ভাব কি করে ভাঙে! সে কি ঘুম-ভাঙা! হাই তুলে উঠে বসা! হঠাৎ মনে হল, সন্ন্যাসীরাজার উত্তমকুমার। শেষ দৃশ্যটা নকল করলেই তো হয়। ভাবের ঘোরে বলতে হবে, কি বলব! সনাতন ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেছিলেন এই ভাবে, জগতের কল্যাণ হোক, বিশ্বের কল্যাণ

হোক, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করুক, অন্ধ ছুঁচে সুতো পরাক। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

না, ওভাবে না, আমার থিয়েটারের প্রতিভাটা কাজে লাগাই। একটা কীর্তনের দু'চার লাইন মাথায় আসছে। তেড়ে উঠি, হাউই যে ভাবে হুস্ করে ওঠে, তারপর যা হয় হবে। কোলের গরমে মরে যাওয়ার অবস্থা। তড়াক করে লাফিয়ে এই বলতে বলতে সামনে ষাঁড়ের মত ছুট—'ঐ যে, সুরধুনীতীরে ও কে হরি বলে নেচে যায়।' আমি যেন ধরতে ছুটছি। ওঠার সময় পরিষ্কার শুনলুম, মেয়েটি বললে, 'যাঃ শালা, লে হালুয়া!'

কেউ ল্যাং মারল কি না কি হল বুঝতে পারলুম না, ধপাস্ করে পড়ে গেলুম। গায়ের ওপর ঠকাস-ঠকাস করে কি সব পড়তে লাগল। প্রথমে ভাবলুম, কোয়ার্টার ডাউন স্টোন চিপস্ কেউ মুঠো মুঠো ছুঁড়ছে। মুখের সামনে একটা এসে পড়ল। বাতাসা। হরির লুঠ দিচ্ছে।

পড়ে যাওয়াটা পাবলিক খুব নিলে। ওটা জেনুইন, অভিনয় ছিল না তো। তাই। সেই মেয়েটি ছুটে এসে আমার মাথাটা কোলে তুলে নিতে নিতে বলল, 'মাল'। আমি গানের শেষ দু'লাইনের আগের লাইনটা কান্নার সুরে বললুম, 'সে তো এমনি করে বাঁশি ধরে মজাইত গোপিকায়।'

ওই সমাবেশের মধ্যে থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন ছিটকে। একেবারে কাটা কলাগাছের মতো সপাটে আমার পায়ে। পুরাকালে স্বামীর মৃত্যুর পর যে-নাটক দেখা যেত। সতীলক্ষ্মী আছাড় খাইয়া পতিদেবতার পদযুগলে। আধবোজা চোখে ভাবছি, এইবার লেবড়ে আলতা মাখিয়ে পায়ের ছাপ না তুলে নেয়!

আধঘণ্টার মধ্যে আমি প্রভুতে পরিণত হলুম। ধোলাইয়ের বদলে গলায় গোটা কয়েক গোড়ের মালা। আমাদের রমণীরা বাস্তবিকই কি ভক্তিপরায়ণা। দু-হাত দূরে শালোয়ার-কামিজ পরা এক যৌবনবতী হাঁটু গেড়ে বসে অঝোরে কেঁদে চলেছে। আমার কোলদাত্রী, সর্বাভিজ্ঞা, কানে কানে বললে, পিট পিট করে ওর বুকের দিকে তাকাবে না, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।'

ধরেছিল ঠিক। মেয়েদের কি ভগবানদত্ত ক্ষমতা! একবার তাকিয়েই চোখসাঁট। রাধাভাব চটকে গিয়ে কৃষ্ণভাব। নারীদের ভয়ঙ্কর অধিকার বোধের পরিচয় তখুনই পেয়ে গেলুম, যখন কানে আবার সতর্কবাণী হল,

'চোখ গেলে দোবো শালা!'

এই শালাটা যে কি মধুর! প্রেম আর আত্মীয়তায় চুর হয়ে থাকা মাতালের মতো! কতরকমের শালা আছে। দাদু আমাকে ছেলেবেলায় আদর করে শালা বলতেন। 'এই শ্যালা এদিকে আয়।' মুখে একটা ডিম-সন্দেশ পুরে দিলেন, সেকালের বিখ্যাত। এটি হল দাদুর শালা। সন্দেশের চেয়েও মধুর। এর সম্পূর্ণ বিপরীত, রাস্তার শালা। 'শালা, মেরে থোবনা ফাটিয়ে দোবো।' শ্বশুরবাড়ির শালা। দুর্গাপুজো আর ভাইফোঁটায় এঁদের সংখ্যা ও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। লাউ, শসা, কুমড়ো, কাঁঠালের যেমন বিচি, বউয়ের তেমনি শালা। আতার বিচির মতো। সবটাই মুখে পুরতে হয়। সিডলেস আতা হয় না। তবে হ্যাঁ, কাশীর পেয়ারার বিচি কম। সল্টলেকে বিশাল বাড়ির মালিক, উচ্চপদাসীন, পাইপ ঠোঁটে, শালা, শালা নয় শ্যালক। তিনি বোনের খবর অবশ্যই রাখবেন না। এঁরা বউ-অন্ত প্রাণ। তিনি প্রভুর সমান। এঁর যত রোমান্স জাম্পার পরা শালীদের সঙ্গে। চোখে বাদামী রঙের নিকলসন সানগ্লাস পরে কাঁধে কাঁধ ঠেসে ছবি তোলেন। পেছনে মানালির চালচিত্র। মাথার সামনে ইঁদুরের পিঠে খাওয়া টাক, পেছন থেকে চুল টেনে এনে ঢাকার চেষ্টা। বউয়ের কাছে স্বামী ফাংশনাল! ত্রেতায় হাতপাখা, দ্বাপরে ফ্যান, কলিতে কুলার। স্বামী আর টাকা সমার্থ। টাকার টাক থাকলে কিচ্ছু যায় আসে না। সেই একই মানুষ শালীসঙ্গে ডেকরেটিভ। এই হল নরপ্রকৃতি। স্বর্গে স্বর্গবাসী মার্কিনীরা ফোর্ডের টাকায় হিউম্যান স্টাডিসেন্টার খুলেছে। পৃথিবীর মানুষের নেচার স্টাডি করছে। সে এক এলাহি ব্যাপার।

ভিড়ের মধ্যে এক সাংবাদিক ছিলেন, এক বিদেশী কাগজের স্পিরিচ্যুয়াল রিপোর্টার বা কালামনিস্ট। দিশি কাগজ স্পিরিচ্যুয়াল ব্যাপার ঘৃণায় ত্যাগ করেছে। বোতলের স্পিরিট ছাড়া অন্য স্পিরিটে বিশ্বাস করে না। সাংবাদিক এগিয়ে এসে বিনীতভাবে বললেন, 'জাস্ট টেন মিনিটস সময় দেবেন?'

বিখ্যাত মানুষরা যেভাবে ইন্টরাভিউ দেন সেইভাবেই শুরু হল :

প্রশ্ন : আচ্ছা, একস্কিউজ মি, আপনি ইচ্ছে করে পড়ে গেলেন, না আপনাকে কেউ ফেলে দিলে?

উত্তর : না, কেউ ফেলে দেয়নি, আমি পড়ে গেছি।

প্রশ্ন : তার মানে ইচ্ছে করে!

উত্তর : আজ্ঞে না, স্বেচ্ছায়।

প্রশ্ন : ইচ্ছা আর স্বেচ্ছায় কি তফাৎ।

উত্তর : ইচ্ছার মধ্যে একটা মতলব থাকে, একটা পরিকল্পনা থাকে। একটা উদাহরণ দি, ধরুন আমি একটা ইট ছুঁড়ে মারলুম, মাথা ফেটে গেল, ছ'টা স্টিচ। আবার একটা থান ইট হাতের আলসেতে ছিল, নিচে রাস্তা দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিল, হঠাৎ ইটটা তার মাথায় পড়ল, হাসপাতাল। একটায় আমার অসৎ ইচ্ছা, আর একটায় তাঁর ইচ্ছা।

প্রশ্ন : হোয়াট ইউ মিন বাই তাঁর?

উত্তর : সেই বড়কর্তা, যিনি লাট্টুর মতো পৃথিবীটাকে ঘোরাচ্ছেন। চাঁদ, তারা, সূর্য ওঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন।

প্রশ্ন : অর্থাৎ, আপনি এই বলতে চাইছেন, ইটটা যেভাবে আলসে থেকে মাথায় পড়েছিল, আপনি সেইভাবে কোলে পড়েছিলেন। ওই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে ওই ইটটার কোনও পার্থক্য ছিল না!

উত্তর : অবশ্যই ছিল। ইট অচেতন, জড় পদার্থ, আমি জীবন্ত সচেতন প্রাণী। ওই মুহূর্তে আমার মন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আর আমার দেহটা মনের হ্যাঙার (hanger) থেকে জামা খুলে পড়ে যাওয়ার মতো ঝপাৎ করে কোলে গিয়ে পড়েছিল। এই দেহ আত্মা পোশাক ভিন্ন আর কিছু নয়। ইংরেজিতে লিখুন, Soul with a body।

প্রশ্ন : যাক, ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে অন্য প্রশ্ন করছি, কোলে বসে থাকতে আপনার কেমন লাগছিল?

উত্তর : আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন অকেজো। তখন আমার কোনও বোধ ছিল না। আমি বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কি ভাসমান—বোঝার উপায় ছিল না।

প্রশ্ন : মেন্টাল প্যারালিসিস! আপনার কি মৃগী আছে?

উত্তর : আজ্ঞে না।

প্রশ্ন : ব্লাড প্রেশার?

উত্তর : নর্মাল।

প্রশ্ন : আগে কখনও এমন হয়েছে?

উত্তর : ভগবানের কথা শুনলেই অল্পস্বল্প আমার হত, আজ একেবারে ভয়ঙ্কর রকমের।

সাংবাদিক বললেন, 'আপনার অনুমতি নিয়ে এঁকে একটি মাত্র প্রশ্ন করব, কোলে নিয়ে আপনার কেমন লাগছিল!'

মেয়েটির সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'মনে হচ্ছিল, ভগবানকে কোলে নিয়ে বসে আছি। অনন্তকাল ওইভাবেই বসে থাকি।'

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারলুম না। ভগবান ওপর থেকে চিনে লণ্ঠনের মতো পূর্ণিমার চাঁদ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। হবি তো হ, বসন্তকাল। একটা কোকিলেরও আমার অবস্থা। ডেকে ডেকে শেষ হয়ে গেল। এমন একটা ছোঁয়াচে বাতাস বইছে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত খবরের ঢাকনা খুলে প্রেমিক-প্রেমিকারা বেরিয়ে এসেছে। কলকাতার রাস্তা দিয়ে মিছিল করে কেওড়াতলার দিকে চলেছে। শুচ্ছি, উঠছি, বসছি। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। নিচে, নির্জন চওড়া রাস্তা। ওপারে একটা পার্ক। বট্‌ল পাম গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরোবরের চাঁদ চিক্‌চিকে জল। মন্থর পায়ে জীবনানন্দের কবিতা হাঁটছে, 'রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায়/আমারো চোখের ঘুম খসেছিল, হায়,/বসন্তের দেশে/জীবনের-যৌবনের!—আমি জেগে,—ঘুমন্ত শুয়ে সে!'

বালিশ থেকে মাথা তুলে মা বললেন, 'কালই তুলিয়ে আয়, এ কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। লবঙ্গতেল নেই?'

'আছে মা।'

'তুলোয় করে একটু গুঁজে দে না। হবে না কিছুই, তবু। দন্তশূলের দাওয়াই উৎপাটন!'

মা ভেবেছেন, আমার সেই পুরনো দাঁতের যন্ত্রণা আবার শুরু হয়েছে। কোনও যন্ত্রণাই আমার সহ্য হয় না। দাঁতের যন্ত্রণা একেবারেই নয়। মায়ের কাছেই শুনেছি, আর একটি অনুরূপ যন্ত্রণা—গর্ভযন্ত্রণা। আমারই কারণে মা যা পেয়েছিলেন।

একই বড় ঘরে এপাশে, ওপাশে দুটো বিছানা। একটাতে আমি, একটাতে মা। এই ঘরটা ছিল বাবার। নামী ডাক্তার ছিলেন। শল্য চিকিৎসক। হঠাৎ একদিন সকালে চা খেতে খেতে, আমাদের সঙ্গে রসিকতা করতে করতে হঠাৎ চলে গেলেন। শেষ কথাটা সম্পূর্ণ করতে

পারেননি। শব্দটা ছিল, 'ব্যা'। ওটা আজও আমার কাছে একটা ধাঁধা। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। পণ্ডিতরা বলেছিলেন, তোমাকে ব্যাকরণ পড়তে বলেছিলেন। আর একদল বললেন, মৃত্যুর চোখে সব মানুষই ছাগল। ধরলেই ব্যা ব্যা। তোমার বাবা একটা মাত্র ব্যা বলে বেরিয়ে গেলেন। আমি একটা ফার্মে আর্টিকল ক্লার্ক। সেখানে নিত্য শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা হত। তাঁরা বলেছিলেন, তোমার বাবা বলে গেলেন, ব্যবসা কর। অনেকদিন পরে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। মা বলেছিলেন, ওটা আমাকে বলে গেছেন, সুধাময়ী ব্যবহারটা ভাল কর। এই বহুতল স্বর্গের কোথায় তিনি আছেন, অনুসন্ধানেই অনেকটা সময় গেল। স্বর্গের অনুসন্ধান বিভাগেও বিশাল বিশাল কম্পিউটার। একটি আমেরিকান মেয়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। মেয়েটি রজনীশের আশ্রমে দীর্ঘকাল ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ছিল। প্রাণায়ামে বসে কুম্ভক করে দম নিতে ভুলে গিয়েছিল। ভীষণ ভুলো স্বভাবের মেয়ে। সেই কুম্ভক আটকে সোজা স্বর্গে। কয়েকদিন আগেই স্বর্গের সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরিয়েছে। পাপ-পুণ্য খতিয়ে দেখে স্বয়ং ভোলা মহেশ্বর রায় দিয়েছেন, ও ওঙ্কারে চেপে স্বর্গে এসেছে। ওর আর পুনর্জন্ম হবে না। সেই মেয়েটি কম্পিউটার ঘাঁটাঘাঁটি করে বললে, আই অ্যাম সরি। ইওর এক্সফাদার জাস্ট নাও আয়ারল্যান্ডে এক বিপ্লবীর ঘরে জন্মালেন, স্ক্রিনে ছবিটা দেখ। হেসে ফেললুম, বাবার কি অবস্থা! অতবড় একজন শল্য চিকিৎসক! সদ্যোজাত শিশুটি। লাল একটা পোকার মতো শরীর। এক সুন্দরী সিস্টার এক হাতে দুটো পা ধরে শিশুটিকে ঝুলিয়ে দোলাচ্ছেন আর ছোট্ট নিতম্বে চাপড় মারছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর ফুসফুস দুটো তো বেলুনের মতো চুপসে থাকে, সে দুটোকে এইভাবে ফোলাতে হয়। ওঁয়া ওঁয়া করে না-কাঁদা পর্যন্ত নিস্তার নেই। বাবার এ-পক্ষের মা'টি ভারি সুন্দরী। এক মাথা সোনালি চুল, মিষ্টি মুখ।

ব্যা বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছিলেন জানা হল না। স্বর্গে এসে একটা মজা হয়েছে, ইচ্ছে মাত্রই অতীতে চলে যেতে পারছি। আম থেকে আঁটি বেরিয়ে যাওয়ার মতো আমার বেঁচে থাকাটা বেরিয়ে গেছে। মা জেগে আছেন দেখে বারান্দা থেকে ঘরে এসে মায়ের পাশে বিছানায় বসলুম। মা শুয়ে আছেন। শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না। আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'লাগালি না। দে না একটু তুলো গুঁজে।'

ইতস্তত করে বললুম, 'মা, দাঁত নয়, আমি আজ পড়ে গেছি।'

মা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'কোথায়! কখন পড়লি? খুব লেগেছে?'

'ভীষণ যন্ত্রণা মা!'

'কি করে পড়লি?'

'দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেলুম।'

'শক্ত জায়গায়?'

'না, স্পঞ্জের মতো নরম, কোলে।'

'কার কোলে?'

মা'কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা গুঁজে বললুম, 'মা, আমি প্রেমে পড়ে গেছি।'

মা নীরবে গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। বেশ বুঝলুম আমার বৃদ্ধা মায়ের হাত কাঁপছে। মা আর ছেলের সংসারে তৃতীয় চরিত্রের প্রবেশে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, এই হয়তো ভাবছেন। কর্তৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। ছেলে পর হয়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ে করবি?'

'তুমি যদি অনুমতি দাও!'

'মেয়েটি কেমন, আধুনিকা?'

'না, দেখলে তোমার ভালই লাগবে।'

ফোন বেজে উঠল। এই গভীর রাতে কার আবার কি হল! ফোনটা বাবার নামে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে এক-একটা ফোন আসে, ডাক্তারবাবু কি ঘুমোচ্ছেন? রিসিভার তুললুম—হ্যালো! সাড়াশব্দ নেই, লাইনে কেউ একজন আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের দীর্ঘ শব্দ। —হ্যালো! কোনও সাড়া নেই। —হ্যালো! এইবার ভারি মিষ্টি একটি নারীকণ্ঠ—ঘুমোতে পারছি না। আমার কাছে চলে এস। বিছানায় চাঁদের আলো।

লাইন ছেড়ে দিল। ডায়াল টোনে কুলকুচোর শব্দ। ভালই করেছে। মায়ের সামনে কথা বলতে পারতুম না। এইটুকু শুনেই শরীরে পিপারমিন্টের স্রোত।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'ঘোস্ট কল।'

মা বললেন, 'মেয়েটি যদি ভাল হয়, তাহলে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেল! বাড়িটা খুব ফাঁকা হয়ে গেছে।'

আমার বাবার গাড়িটা গ্যারেজে রয়েছে। একবার ভাবা হয়েছিল বিক্রি করে দেওয়া হোক। পরে মা বললেন, গাড়িটা রাখার মতো রোজগার বাড়াও। আমার মা যেমন বাবাকে চালাতেন, সেইরকম আমাকেও চালাতেন। মায়ের অভিধানে 'হার' শব্দটা নেই। শেষ রাত। মা গভীর ঘুমে। পা টিপে টিপে টেলিফোনের কাছে গেলুম।

সে-ই ধরেছে। বোধহয় আশা করেছিল ফোন আসবে।

'শোনো, চাঁদ এখনও রয়েছে আকাশে। বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।' রোজই আমি মর্নিংওয়াকে যাই, আজ না হয় এক ঘণ্টা আগে মর্নিং-ড্রাইভে যাচ্ছি। প্রতিদিনই মা আমার পরে ওঠেন। বেড়িয়ে এসে দু'জনে একসঙ্গে চা খাই গল্প করতে করতে। ছেড়ে আসা জীবনটা আমার খুব সুখেরই ছিল। সবই আমার মায়ের কৃপা!

শেষ রাতে প্রস্ফুটিত যুবতীদের কুঞ্জ থেকে নির্গত শ্রীরাধিকার মতো দেখায়। বিরহমাখা, রাতলাগা মুখ। ভাবতেই পারেনি, আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে আসব। ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে উৎকণ্ঠিত মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে। একবার এদিকে তাকাচ্ছে, একবার ওদিকে। ল্যাম্পপোস্টের বাসি আলোয় চূর্ণ চুল চিকচিক করছে। রাজপথে কোনও পথচারী নেই। দর্জির ফিতের মতো লম্বা পড়ে আছে। হঠাৎ গাড়িটা থামায় চমকে গেছে। একটা হাত বাড়িয়ে খপ্ করে ডানহাতটা চেপে ধরতেই ভেবেছে কোনও বদমাইশ। যেই দেখেছে, আমি, সঙ্গে সঙ্গে সেই উক্তি, 'শালা'!

গাড়ি চলেছে প্রিন্সেপ-এর দিকে। ভোরের গোলাপি আকাশের গায়ে গেরুয়া গঙ্গা দেখব। একা নয়। দু'জনে দেখব। হাতে হাত রাখব। আঙুল নিয়ে খেলা করব। কাঁধে শিথিল হাত রাখব। খোঁপার ঘর্ষণ। মণিবন্ধে ঘড়ির টিক্-টিক্। সময় চলিয়া যায়।

জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার এই অনবদ্য শালাটি কোথা থেকে পেলে!'

গম্ভীর গলায় বললে, 'নিজস্ব।'

আমার পৃথিবী, আমার আকাশ, গঙ্গা, আমার প্রেমিকা, আমার ঘড়ি—সব পড়ে আছে ওই সবুজ গ্রহে। এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না।

শেষ রাতের স্বপ্নের মতো। কিছু মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে না। আমার ঘুম ভেঙে গেছে। আমার হাতঘড়ি খুলে পড়ে গেছে।

সাধু-সমাবেশে বোকার মতো দাঁড়িয়ে। বোকা বললে ঠিক হবে না। পৃথিবীর বাংলা অভিধানে একটি শব্দ আছে, বিমূঢ়। আমার সেই অবস্থা। সেখানে আমার সুখ ছিল, দুঃখ ছিল। খেলনা নিয়ে খেলা ছিল। থালা-বাটি-জামা-জুতো। মার্কেটিং, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন। আমাদের একটা ছেলে হল। হয়েই মারা গেল। আমার বউ স্বাগতার সেই মুহূর্তটা স্বপ্ন হলেও যেন চিরবাস্তব। জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'যাঃ, শালা, হয়েই মরে গেল'! যেন দেশলাই কাঠি, জ্বলেই নিভে গেল।

কাঁচের চার চৌকো। ভেতরে কেউ নেই। ঘর আছে বাসিন্দা নেই। অথচ লেখা রয়েছে ব্রহ্মনিলয়। তিনি কোথায়! মহিলা জাপানি টেকনোলজিস্ট দুঃখের গলায় বললেন, ভারত থেকে এলে, অথচ শূন্যের ধারণা নেই তোমার! ব্রহ্ম ইজ জিরো। একটা গোল শূন্য। একের পরে পরে শূন্য বসাও, লক্ষ, কোটি, কোটি কোটি। একটা মুছে দাও সব শূন্য। একটা বসিয়ে দাও আবার সব পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন করলুম, 'একটা কোথা থেকে পাচ্ছেন মশাই?'

পেছন থেকে খুব পরিচিত গলায় কে বললে, 'গর্দভ শালা! ওই একটাই তো ভগবান! ভগবানকে তুলে নাও, সব শূন্য, ভগবানকে বসিয়ে দাও, সব পরিপূর্ণ।'

আনন্দে আমার চিৎকার, 'তুমি!'

স্বাগতা বললে, 'আরে এই মাত্র এলুম।'

'কিসে করে এলে?'

'বি হেপাটাইটিসে এলুম।'

'ক'দিন লাগল?'

'পৃথিবীর হিসেবে দিন পনের।'

'আমার বাহনটা দ্রুত ছিল। বারো ঘণ্টায় এসে গেছি।'

স্বাগতা হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি আর কথা বোলো না। তুমি যেভাবে এলে, ওর চেয়ে অগৌরবের আসা আর কি হতে পারে! ওটা একটা মৃত্যু! ওটাকে বলে, কেলেঙ্কারি!'

জাপানি মেয়েটি হাসি-হাসি মুখে আমাদের উচ্ছ্বাস দেখছিল, প্রশ্ন করলে, 'লাভার্স?'

উত্তর দিলুম, 'লাভার্স তো বটেই, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। স্বামী-স্ত্রী।'

সে অবাক হয়ে বললে, 'বিয়ের পরেও এত প্রেম!'

স্বাগতা বললে, 'ওইটাই যে আমরা সেধেছি ম্যাডাম!'

ম্যাডাম বললে, 'তাহলে তোমরা এই ব্রহ্ম ডিভিসানে বেশিক্ষণ থেকো না। দেখেছ, এখানে কারা ধ্যানে বসে আছেন, কপিল, শঙ্করাচার্য, গৌতম বুদ্ধ। তোমরা প্রেম ডিভিসানে চলে যাও। ওটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ডেপার্টমেন্ট। ওখানে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রয়েছেন, রয়েছেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, বৃন্দাবনের গোপীরা রয়েছে।'

আমি বললুম, 'আর তো এদিকে আসা হবে না, সুযোগ যখন এসেছে ব্রহ্মটা বুঝেই যাই। পৃথিবীতে এইরকম বলে, সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে একমাত্র ব্রহ্মই বাদ। ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। বর্ণনাতীত। আদি, অন্তহীন একটা বিশ্রী, ভীতিপ্রদ ব্যাপার।'

জাপানী এক্সপার্ট বললেন, 'কম্পিউটার আসার আগে পর্যন্ত সেইরকমই ছিল। এখন কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই হেডফোনটা কানে দাও।'

অদ্ভুত একটা শব্দ। মনে হচ্ছে, মেঘের নাক ডাকছে, অথবা নাকে মেঘ ডাকছে! এইটাই হল প্রণব, এইটাই সেই ওঙ্কার। বিশ্বব্যাপী যে-ধ্বনি অনবরত উঠছে। সিদ্ধ সাধক যন্ত্র ছাড়াই শুনতে পান। পৃথিবীতে এইরকমই শুনে এসেছি। সাধারণ মানুষের নাক ডাকে। ব্রহ্মবিদ সিদ্ধ হলে নাকের বদলে নাভি ডাকে। সেখান থেকে অনবরত ওঙ্কার ধ্বনি উঠতে থাকে। একে বলে, কসমিক সাউন্ড, মিউজিক অফ দি স্ফিয়ারস। বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের অস্তিত্বের এইটি একটি নির্ভুল প্রমাণ। সামনের একটা স্ক্রিনে আলোর বিন্দু, আলোর ঝরনা, আলোর ছোট-বড় ঢেউ, আলোর সরলরেখা, আলোর বিস্ফোরণ। একটা তাণ্ডব চলেছে। এইটা হল ইচ্ছার তরঙ্গ। সৃষ্টির পেছনে কাজ করছে এই ইচ্ছা আর চৈতন্য। এর কোনও শরীর নেই। এর উপস্থিতি সর্বত্র। দৃশ্য, অদৃশ্য জগৎ এর মধ্যেই রয়েছে। জার আছে। এই যে আলোর বিন্দু, ফুটছে, নিভছে, এ হল জন্ম-মৃত্যু। এর

সব কিছুর মধ্যে একটা করে কোড আছে, আমরা সেগুলো ডিকোড করার চেষ্টা করছি।'

'তাহলে আমরা প্রেমের দিকে যাই।'

'যাওয়ার আগে আমার জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি কি ভাবে এলে! তোমার বউ হাসাহাসি করছিল। এটা নারীর চিরকালীন কৌতূহল!'

'ও তো হাসবেই। ওর জন্যেই তো আমাকে মরতে হল। আমরা দু'জনে মাকে নিয়ে কাশী গেছি। চলে আসার আগের দিন ওনার ইচ্ছে হল, কাশীর বিখ্যাত মালাই খাবেন। বেশ খাও, নিয়ে এলুম মালাই।'

স্বাগতা হই হই করে বললে, 'এবার তুমি চুপ কর, আমাকে বলতে দাও।'

'বেশ, বল।'

স্বাগতা বলতে লাগল, 'দিদি, আমি বারবার সাবধান করছি, দেখ বাঙালির পেট, অসাধারণ অপূর্ব করতে করতে অতটা খেয়ো না, সহ্য হবে না। বিজ্ঞের মতো বলল, আমি তো পশ্চিমবাংলায় বসে খাচ্ছি না, খাচ্ছি কাশীতে। জলের গুণে সব হজম হয়ে যাবে। সত্যিই তাই, মানুষটাই হজম হয়ে গেল। রাত বারোটা থেকে শুরু হল। ভোরবেলা অক্কা। বারাণসী থেকে সোজা বাবার বাহনের লেজ ধরে এখানে।'

'তুমি হাসছ! তোমার দুঃখ হয়নি?'

'আমি তো গাধাটাকে এখানে দেখে হাসছি। সরি!'

'ও তোমার ভালবাসার গাধা।'

'আমার জীবনটা শেষ করে দিয়ে এখানে চলে এসেছে, আবার দাঁত বের করে হাসি হচ্ছে!'

জাপানি এক্সপার্ট হাসতে হাসতে বললে, 'সো সুইট! আমি ভাবছি, তোমাদের দুজনের নাম স্পনসর করব।'

'কোথায়?'

'আমাদের ডিভাইন ক্লাবে, আদর্শ দম্পতি হিসেবে!'

স্বাগতা উৎসাহিত হয়ে বললে, 'কি কি দেবে? কালার টিভি! দু'হাজার পি এম পি-ও জাপানি মিউজিক সিস্টেম! টুইন টাব ওয়াশিং মেসিন। মরিসাসে ভ্রমণের ফ্রি ব্যবস্থা।'

ভদ্রমহিলা হা-হা করে হেসে বললে, 'সবে এসেছ তো! তাই এখনও

পৃথিবীতেই পড়ে আছ। পুরোটা গুটিয়ে আনতে পারনি! ডিভাইন ক্লাবের সদস্য হলে তোমরা ভগবানের পার্ষদ হতে পারবে, দু-বেলা তাঁর দেখা পাবে। ওই কাউন্সিলের এক্সজিকিউটিভ কমিটিতে কারা আছেন জান—জেসাস ক্রাইস্ট, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, সন্তুতুকারাম, মীরাবাঈ।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা নদীর তীরে এসে হাজির। একজন লাল একটা গামছা দিয়ে মাছ ধরছিলেন। খুব চেনা চেনা মনে হল। স্বাগতা বললে, 'কি গো, চিনতে পারছ না! আমাদের ঠাকুর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।'

'নদীটার নাম কী?'

'এই তো সেই বৈতরণী। এইটা পেরিয়ে স্বর্গে আসতে হয়। লেখাপড়া কিসুই করনি।'

'আরে, আমি তো জানি, পঞ্চপাণ্ডবরা যে পথে মহাপ্রস্থান করেছিলেন সেইটাই পথ।'

'তোমার মাথা। ওঁরা পথ ভুল করে কাবুলে চলে গিয়েছিলেন, ওই জন্যে দেখছ না কাবুলে চির কুরুক্ষেত্র।'

'তা বটে। শোনো স্বাগতা, আমার অনেকদিনের ইচ্ছে, ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলব।'

'বল না।'

'কি বলব?'

'বল, স্বামীজির বাড়ি মঠ নিয়েছে। শুনলে খুশি হবেন।'

আমি খুব কাছে গিয়ে ভক্তি করে বললুম, 'ঠাকুর প্রণাম নেবেন। স্বামীজির বাড়ি...।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে অমলিন হেসে বললেন, 'নরেনের বাড়ি তো মানুষের হৃদয়! দশ-বিশ কাঠা জমির ওপর ইটের পাঁজা নরেনের বাড়ি হতে যাবে কোন্ দুঃখ। দূর শালা! তোদের আসল প্রশ্ন, আমি কি ধরছি! শোন, আমি ধরছি না, ধরে ছাড়ছি। দুঃখ ছেঁকে তুলে নিয়ে আনন্দ ঢুকিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। বদ্ধগুলোকে মুক্ত করে দিচ্ছি। আমার এই গামছাটা দিয়ে রগড়ে রগড়ে চান করিয়ে দিচ্ছি। পৃথিবীতেও আমার এই কাজই ছিল, এখানে রামপ্রসাদকেও সঙ্গে পেয়েছি। গিরিশ ডিরেক্টর।'

আমরা প্রণাম করে সরে এলুম!

স্বর্গে একটাই অসুবিধে, এখানে অন্ধকার নেই, দুঃখ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, রাজনীতি নেই, সংসার নেই, ডেলি-প্যাসেঞ্জার নেই, নার্সিং হোম, হাসপাতাল নেই। পৃথিবীর মানুষগুলো এপারে আসামাত্রই রামকৃষ্ণ গামছা দিয়ে রগড়ে পারে তুলে দিচ্ছেন।

আমরা একটা গাছতলায় বসেছি। এখানে শ্রম নেই, বিশ্রামও নেই। এমনি বসে আছি। হঠাৎ দেখি, সেই অপ্সরা, হাতে বিশাল একটা ব্যাগ। পাশে এসে বসল পা ছড়িয়ে। ঝোলাতে প্রচুর চিনেবাদাম। সেই যে সকালে বলেছিলুম, চিনেবাদাম খাওয়ার কথা। এখানে অবশ্য সবসময়েই সকাল। দিন-রাতের হিসেব এলেই জ্যোতিষ, জোতিষী, গ্রহরত্নম এসে পড়বে। কাগজে 'আজকের দিনটি কেমন যাবে', পড়তে ইচ্ছে করবে।

স্বাগতা বললে, 'তোমাকে ভীষণ চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি বল তো!'

'পৃথিবীতে আমার অনেক ছবি আছে। ওখানে আমার নাম ছিল, সেন্ট মেরি।'

আমার চোখ প্রায় কপালে ওঠে আর কি! কাকে কি বলেছি তখন। একটাই বাঁচোয়া, এখানে কাম নেই। এখানে আছে প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান। স্বর্গটা যেন মলাট-খোলা গীতা! সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করলুম। প্রণাম করা মাত্রই গির্জার ঘণ্টা, অরগ্যান সব বেজে উঠল। কোথায় বাজছে!

সেন্ট আমাদের বিস্ময় দেখে বললেন, 'আমার ভেতরে বাজছে। আমিই চার্চ। মহাপ্রভুকে প্রণাম করলে, খোল, করতাল, কীর্তন শুনতে পাবে। রামপ্রসাদকে প্রণাম করলেই রামপ্রসাদী।'

স্বাগতা সেন্ট মেরির হাত দুটো ধরে বললে, 'মাতাজী! আমার ছেলেটাকে এখানে খুঁজে দিতে পার মা! জন্মাল আর কোল খালি করে চলে এল। আমার একমাত্র ছেলে।'

সেন্ট বললেন, 'তুমি কাঁদার চেষ্টা করছ! পারবে না, আমাদের কান্নাটা পৃথিবীতেই পড়ে আছে। যীশুর যন্ত্রণা পৃথিবীতেই পড়ে আছে ক্রুশ হয়ে। গৌতমের দুঃখ পৃথিবীতেই পড়ে আছে স্তূপ হয়ে। তোমার ছেলে! আচ্ছা, চলো গাছের কাছে যাই, কল্পবৃক্ষ। যা চাইবে, তাই পাবে। তার তলায় তোমরা বসে শুধু ইচ্ছা করবে। সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে তোমাদের

ছেলে।'

মোটা গুঁড়িওলা সুন্দর একটা গাছ। অদ্ভুত ধরনের পাতা, যেন হাসি-হাসি এক দেবতা, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রয়েছেন। আমরা ভয়ে ভয়ে তার তলায় বসে যেই ইচ্ছে করেছি :

সুন্দর চেহারার এক যুবক, পরিধান দামী পোশাক, হাতে বিলিতি ব্রিফ কেস, সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা ঘাবড়ে গিয়ে দুজনে একইসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, 'কোথা থেকে এলে বাবা!'

'ফ্রম ন্যুইয়র্ক।'

'অ্যাঁ, সে কি, তোমার তো এখানে থাকার কথা।'

'সো আই ওয়াজ দেয়ার। নাও আই অ্যাম হিয়ার। হেয়্যার ইজ দিস প্লেস!'

'দিস ইজ ইন হেভন বাবা।'

'মাই গড! আমি স্টক এক্সচেঞ্জে যাব বলে ড্রাইভ করছিলুম অ্যান্ড এ ক্র্যাশ, অ্যান্ড আই অ্যাম ইন হেভেন। দ্যাট ইজ আই এম ডেড দেয়ার!'

স্বাগতার সেই বিখ্যাত উক্তি, 'যাঃ শালা!'

সেন্ট মেরির মুখে অপূর্ব সেই হাসি, যা আমরা পৃথিবীর ছবিতে দেখি। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ছেলে কোথায় হয়েছিল?'

'কলকাতায়।'

'ওখানে এইরকম ম্যাজিক হতে পারে, মরা ছেলে দেখিয়ে জ্যান্ত ছেলে অন্যহাতে পাচার!' '

স্বাগতা বললে, 'যাঃ শালা, নিজের জ্যান্ত ছেলেটাকে এবার সত্যি-সত্যিই মেরে ফেললুম।'

মেরি মাতা বললেন, 'উঠে এস, উঠে এস, সাংঘাতিক গাছ। যা ইচ্ছে করবে তাই হবে।'

আমি বললুম, 'স্বাগতা ওরা একা একা পৃথিবীতে পড়ে আছে, আমার মা, তোমার বাবা, তুলে আনলে হয় না!'

স্বাগতা দুষ্টু-দুষ্টু হেসে বললে, 'তাঁরা ভীষণ আনন্দে আছে। আমি দুজনের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।'

এইবার আমার বলার পালা, 'যাঃ শালা!'

হাতের প্যাঁচ

ছোট, মাঝারি, বড়, কি গল্প আপনি চান বলুন, পেশাদার কলম ঠিক নামিয়ে দেবে। কত স্লিপ? আজকাল তো আর সাহিত্য নেই, আছে স্লিপ। সম্পাদক মহাশয়রা আজকাল আর লেখা চান না। লেখা আজকাল আবার একসঙ্গে আসে না। বড় বড় লেখকরা স্লিপ দিতে থাকেন। সম্পাদক মহাশয়রা প্রশ্ন করেন, 'কাল ক'স্লিপ দিচ্ছেন! অন্তত পাঁচ স্লিপ দিন।' সাহিত্যের জগতে আর ফলপাকড়ের জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। আগে আম বিক্রি হত টাকায় পাঁচটা হিসেবে। এখন পনের টাকা কিলো। লিচু বিক্রি হত শ' দরে। লিচুরও এখন কিলো। যুগ পালটে গেছে।

আমি একটা বড় গল্প লেখার বায়না পেয়েছি। চল্লিশ স্লিপ। তার কম বা বেশি নয়। সেদিন সরকারি অফিসে লিফটে উঠেছিলুম। দেখি লেখা রয়েছে সিকস্টিন পার্সনস। প্রশ্ন জাগল, হাতির মতো চেহারার ষোল জন উঠলে কি হবে! নির্দেশ অনুসারে তো ষোলজনই হল। চল্লিশ স্লিপে যদি চল্লিশ হাজার শব্দ হয়ে যায়। সে তো তাহলে উপন্যাসই হয়ে গেল!

বড় গল্প কাকে বলে আমি জানি না। ছোট গল্পকে টেনে বাড়ালেই মনে হয় বড় গল্প হয়। আউর থোরা হেঁইয়ো, বড় গল্প হইল। উপন্যাস-উপন্যাস একটা ভাব থাকবে। যেমন শীত-শীত ভাব। ছুঁচো আর হাতি। ছুঁচো দেখে এক পণ্ডিত বলেছিলেন, এ হল রাজার হাতি, না খেয়ে খেয়ে এই রকম হয়ে গেছে। আর হাতি দেখে বলেছিলেন, এ·ব্যাটা রাজার ছুঁচো, খেয়ে খেয়ে অমন হয়েছে। ছোট গল্প আর বড় গল্প। একই ব্যাপার।

কি গল্প লেখা হবে! প্রেমের গল্প। বিচ্ছিন্নতার গল্প! হতাশার গল্প! রাজনৈতিক গল্প! নাকি ভূতের গল্প! প্রেমের গল্পই চেষ্টা করা যাক। গল্প আর রান্না একেবারে এক জিনিস। নানা উপাদান। নানা মশলা। তারপর আগুনে চাপিয়ে নাড়াচাড়া। যাকে বলে হেলুনি মারা। বা কষা। মাংস যত কষবে ততই তার প্রাণমাতানো গন্ধ বেরোবে। এক-এক রান্নার এক-এক

উপাদান। প্রেমের গল্পের প্রধান উপাদান হল, একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেমন ডিমের কারির প্রধান উপাদান হল, ডিম আর পেঁয়াজ। মাংসের কালিয়ার প্রধান উপাদান হল, মাংস আর আলু।

একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেন আলু আর পটল, ভাসছে জলে। জল হল সমাজ। এরপর মশলা চাই। তেল চাই, নুন চাই। তা না হলে, তরকারি না হয়ে—হয়ে যাবে আলু সেদ্ধ, পটল সেদ্ধ। শুধু প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে কত দূর যাওয়া যায়। কত কথাই বা বলানো যায়। মিতালি, আমি তোমাকে ভালবাসি। সোমেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। এ ভাবে বেশিক্ষণ চালানো যায় না। তা ছাড়া একালের প্রেমে ভালবাসা শব্দটাই উচ্চারিত হয় না। ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। অ্যাকশনের যুগ। ধর তক্তা, মার পেরেকের যুগ। মধ্যযুগের প্রেমে, অনেক হিলি হিলি বিলি বিলি কাণ্ড হত। পাতার পর পাতা কবিতা। ফুল। কোকিলের ডাক। চাঁদ। সরোবর। বাতাস। দীর্ঘশ্বাস। মধ্যযুগের প্রেমে বিরহের ভাগ ছিল বেশি। কারণ, তখন ফ্রি মিক্সিং ছিল না। প্রেমিক আর প্রেমিকার মুখোমুখি দেখা হওয়ার উপায় ছিল না। বারান্দায় প্রেমিকা, ল্যাম্পপোস্টের তলায় প্রেমিক। যমুনায় জল ভরতে চলেছেন প্রেমিকা, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন প্রেমিক। নিশি জাগছেন রাই, কবি গাইছেন, তুমি যার আসার আশায় আছো, তার আসার আশা নাই। নট-ঘট শ্যামরায় চলিল আজ মথুরায়। প্রেমের এই ফোঁসফোঁসানি একালে অচল। দেহাতীত প্রেম কেউ বিশ্বাস করবে না। সমালোচকরা তুলো ধুনো দেবেন। প্রেমের সঙ্গে সেক্স চাই-ই চাই। রূপ বর্ণনায় এখন কবিতাও হয় না। গদ্য-সাহিত্য তো দূরের কথা। 'চুল তার কবেকার'—একটা সময় পর্যন্ত বেশ ছিল। এখন খোলাখুলির যুগ। একালের সিনেমায় জোড়া ঠোঁটের মাঝখানে আর যোজন তিনেকের ব্যবধান থাকে না। চুম্বক আর লোহা-সম কাছাকাছি হওয়া মাত্রই টানাটানি। জোড়াজুড়ি।

আমার উপাদান আমি গুছিয়ে ফেলি। বেকার প্রেমিক, বেকার প্রেমিকা। প্রেমিকের পিতার কারখানায় চলেছে লাগাতার ধর্মঘট। মা বাতের রুগী। যত না কাজ করেন, কোঁত পাড়েন তার চেয়ে বেশি। আর সূর্য ওঠা থেকে, মশারিতে ঢোকা পর্যন্ত ঝগড়া করেন প্রাণ খুলে। প্রেমিকের একজন অবিবাহিতা বোন থাকবে। যুবতী। ম্যাগনাম স্বাস্থ্যের অধিকারী।

পথে বেরনোমাত্রই দশ-বিশটা নানা চেহারার, নানা পোশাকের ছেলে পেছন পেছন চলতে থাকে। লেজের বদলে রুমাল নাড়ে। প্রেমিক ভাড়া থাকবে দু-কামরার একটি বাড়িতে। একটি ঘর বড়। একটি ঘর ছোট। বাথরুম কমন। সব লেখকই আশা করেন, তাঁর গল্প নিয়ে সিনেমা হোক। কোনও ভাল পরিচালকের হাতে পড়ুক। কাহিনীটিকে প্রথম থেকেই সেই কারণে ক্যামেরার চোখে দেখতে হবে। সিনারিয়ো করতে করতে এগোতে হবে। সামান্য বাম-বাম ভাব থাকা চাই। ক্যাপিটালিস্ট প্রেম নিয়ে হিন্দি বাণিজ্যিক ছায়াছবি হতে পারে। তাতে পয়সা আছে, সম্মান নেই।

আমার এই কাহিনী যখন মুভি-ক্যামেরা ধরবে, তখন শুরুর শটটা হবে এইরকম :

ধোঁয়া। ভলকে ভলকে ধোঁয়া। আকাশে উঠে এলো। চুলের মতো খুলে খুলে যাচ্ছে। নরম ধোঁয়া। মধ্যবিত্ত ধোঁয়া। মারোয়াড়ির বেআইনি গুদামে আগুন-লাগা ধোঁয়া নয়। কয়েক জোড়া উনুনের ধোঁয়া একসঙ্গে আকাশে উঠছে। সেই আকাশে উড়ছে বাবু-কলকাতার পয়রা। পায়রা ছাড়া ভাল ছবি হয় না। পায়রা হল প্রতীক। ভালভাবে লাগদাঁই করে লাগাতে পারলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যায়। পায়রা দিয়ে মৃত্যু খুব সুন্দর বোঝানো যায়। সিনেমার মৃত্যু বড় হাস্যকর। না মরলে মরা কেমন করে মরার মতো হবে? সব কিছুর অভিনয় সম্ভব, মৃত্যুর অভিনয় অসম্ভব। অভিনেতাদের কাছে মৃত্যু একটা কঠিন সাবজেক্ট। মারছি না, অথচ মরতে হচ্ছে। ক্যামেরা সরে গেলেই উঠে বসে, কই রে সিগারেট নিয়ে আয়, নিয়ে আয় জোড়া ওমলেট, ডবল হাফ চা। যে মৃত্যুর পর মানুষকে শ্মশানে গিয়ে চিতায় শুতে হয়, এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। এ হল গিয়ে পরিচালকের নির্দেশিত মৃত্যু। ক'জন আর মৃত্যুকে সে-ভাবে দেখার সুযোগ পান। মৃত্যু ঘটে নিভৃতে, একান্তে। মৃত্যু মানুষের বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার। একান্ত আপনজন শিয়রে বসে থেকেও বুঝতে পারে না, মানুষটা কখন কিভাবে হঠাৎ চলে গেল, তার দেহ-জামাজোড়া ছেড়ে। সেই শ্বাসকষ্ট, সামান্য এক চিলতে বাতাসের জন্যে ভেতরের আকুলি-বিকুলি। দুটো চোখের ঠেলে বেরিয়ে আসা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হলেই কি আর মৃত্যু হল। সেই কারণে সিনেমার মৃত্যু সব একই ধরনের। মাথাটা বালিশ থেকে উঠতে উঠতে ধপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবহ সংগীত।

বেহালায় প্যাথসের টান। ক্যামেরা ক্লোজ-আপে অভিনেতার মুখ ধরছে। অভিনেতার তখন অগ্নি-পরীক্ষা। তারস্বরে চিৎকার—'চোখের পাতা পিটপিট করে না যেন, ড্যাবা ড্যাবা উর্ধ্বনেত্র।' এই একটা শটই যে কতবার রি-টেক করতে হয়। কখনও পাতা পড়ে যায়, কখনও ড্যাবা কমে আসে, কখনও মৃতের চোখে জল এসে পড়ে। সেই কারণে মৃত্যুর আজকাল একটা পেটেন্ট চেহারা হয়েছে সিনেমার পর্দায়। সেকেন্ড-গ্রেড পরিচালকরা তার বাইরে আসতে পারছেন না। প্রথম সারির পরিচালকরা মৃত্যুকে নিয়ে গেছেন আর্টের পর্যায়ে। তাঁরা করেন কি, ক্যামেরাকে ক্লোজ-আপে এনে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখটা ধরেন। ছটফট, ছটফট, বালিশে মাথা চালাচালি। দু'হাত কোনওরকমে ওপরে তুলে কারোকে ধরার বা খোঁজার চেষ্টা। অস্ফুটে কারো নাম ধরে ডাকা, 'সুধা! সুধা!' তারপর একপাশে ঘাড় কাত করে এলিয়ে পড়া। কাট্। পরের শট, ফড়ফড়, ফড়ফড় একঝাঁক পায়রা যেন কারোর তাড়া খেয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে, বিশাল বৃত্ত রচনা করে উড়তে লাগল। এরপর এক রাউন্ড আন্তরিক কান্না। কান্নার দৃশ্যে আমাদের অভিনেত্রীদের কোনও জুড়ি নেই। একবারে ফাটিয়ে দিতে পারেন। যাকে বলে কেঁদে মাত করা; অনেক পরিচালক আবার রেলগাড়ির সাহায্য নেন। সিটি বাজিয়ে হু হু করে ট্রেন চলে গেল দূর থেকে দূরে। বুক কাঁপিয়ে। লোহার রেলে চাকার শব্দ। মন হু হু-করানো সিটি। সব মিলিয়ে এমন একটা এফেক্ট। আত্মা রেলে চেপে পরবাস থেকে চলেছে স্ববাসে। পায়রা দিয়ে জমিদারের লাম্পট্য বোঝানো যায়। চকমিলান বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পায়রাদের দানা খাওয়াতে খাওয়াতে বয়স্যকে বলছে, ওই অমুকের স্ত্রীকে তাহলে আজ রাতেই তোলার ব্যবস্থা কর। আবার জোতদারের অত্যাচার বোঝাবার জন্যে বেড়াল আর পায়রা একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বাড়ির চালে লাউ ফলে আছে। তার আড়াল থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে পাঁশুটে রঙের একটা বেড়াল। ইয়া এক হুলো। আর অদূরে নিশ্চিন্ত মনে ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে নিরীহ এক পায়রা। দর্শকের আসনে বসে আতঙ্কে আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মানুষের সামগ্রিক নিপীড়ন বোঝাতে ক্রুশবিদ্ধ যিশু তো হামেশাই পর্দায় আসেন।

এখন হল প্রতীকের যুগ। লোগোর যুগ। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, এক-একবার, এক-একরকম লোগো। কোনওবার হাতি, কোনওবার

ভাল্লুক। কোনওবার গোল গোল চাকা। তা আমার কাহিনীর চিত্ররূপে প্রথমেই থাকবে পর্দাজোড়া নরম, মিষ্টি, ধোঁয়া। তার ওপর দুলতে থাকবে টাইটেল। আবহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে দমকা কাশির শব্দ, কাকের কর্কশ চিৎকার। ব্যাটারি ডাউন গাড়ির বারে বারে স্টার্ট নেবার চেষ্টায় সেল্‌ফ্‌ মারার শব্দ। দু'পক্ষের কদর্য ঝগড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ। বেতারে প্রভাতী সংগীত। কলতলায় বাসন ফেলার আচমকা শব্দ। কোনও যন্ত্র ব্যবহার করা হবে না। স্রেফ শব্দ। বাজারের কোলাহল। কলের বাঁশি। সব মিলিয়ে তৈরি হবে টাইট্‌ল্‌ মিউজিক। আজকাল বিদেশী বইতে এই কায়দাই চলেছে।

এইবার ক্যামেরা ছাদের ভাঙা আলসে বেয়ে, বারান্দার ভাঙা রেলিং বেয়ে নেমে আসবে, শ্যাওলা ধরা চৌকো উঠানে। ক্লোজ আপে তিনটে তোলা উনুন। এই ভাঙা সাবেক বাড়িতে তিনটি পরিবার বাস করে। এখন সমস্যা হল, বাড়ি তৈরির মতো গল্পটাকে আমি কিভাবে খাড়া করব। কুস্তির মতো গল্প লেখারও দুটো ধরন আছে—একটা হল ফ্রি স্টাইল। অর্থাৎ শুরু করে দাও, তারপর যেখানে যায় যাক। লিখতে লিখতে ভাব, ভাবতে ভাবতে লেখ। শেষ পর্যন্ত গল্পের চরিত্ররাই লেখকের গলায় দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায়। দিল্লিতে এক বিখ্যাত নামী লেখক বসবাস করতেন। খুব সায়েবী-ভাবাপন্ন। তাঁর একটা বিশাল বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল। রোজ সকালে সেই দুর্বল বুদ্ধিজীবী তাঁর সবল কুকুরটিকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। প্রায়ই দেখা যেত, ব্যাপারটা উল্টে গেছে। কুকুরই বাবুকে নিয়ে বেড়াচ্ছে। টানতে টানতে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দিকেই যেতে হচ্ছে। চরিত্র নিয়ে লেখক বেড়াতে বেরিয়েছেন, শেষে চরিত্ররাই লেখককে টানতে থাকে।

আর একটা হল কুস্তি। নিয়ম মেনে। প্রথা মেনে। কম্পোজ করে। স্টাইল রেস্টলিং। প্ল্যান করে লেখা। কার সঙ্গে কী হবে। গল্পর কাঠামোটা পুরো ভেবে নিয়ে, খড় বেঁধে মাটি চড়িয়ে যাও। সাহিত্যে আমরা যাকে গল্প বলি সিনেমায় সেইটাকেই বলে স্টোরি। আমার এই স্টোরি ফ্রি-স্টাইলেই চলুক। আঁতেল গল্প সেইভাবেই এগোয়। আমার যখন যা মনে হবে, তাই নামিয়ে যাব, তারপর ফিনিশ করে, মেজে-ঘষে ছেড়ে দেব। যেমন এখন আমার মনে হচ্ছে, গল্পের প্রেমিক, প্রেমিকা এই একই বাড়িতে বসবাস করবে। একটা তোলা উনুন প্রেমিক-পরিবারের, আর একটা তোলা

উনুন প্রেমিকা-পরিবারের। এই দুটো উনুনই জীবনের প্রতীক। জীবন জ্বলছে গুমরে গুমরে। যত না পুড়ছে তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া ছাড়ছে। এইবার তৃতীয় উনুনটি কার। তৃতীয় উনুনটা অবশ্যই আর একটি পরিবারের, কিন্তু এই কাহিনীতে সেই পরিবারটির কি ভূমিকা হবে?

এই পরিবারটিকেই আগে প্রতিষ্ঠিত করা যাক। বড় বড় সাহিত্যিক আর বাঘা বাঘা সমালোচক ও সমালোচিকাদের সঙ্গে সামান্য মেলামেশা করে একটা কথা শিখেছি—চরিত্রকে, ঘটনাকে 'এসট্যাবলিশ' করা। আধ্যাত্মিক জগতের ভাষায় বলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রথমত, চরিত্রকে এমনভাবে আঁকতে হবে, যেন বইয়ের পাতা থেকে তার শ্বাসপ্রশ্বাস আমাদের গায়ে এসে লাগে। যেন চিমটি কাটলে, উঃ করে ওঠে। জনৈক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, আপনার একটি চরিত্র আর-একটি চরিত্রকে বলবে, 'সুধা আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।' তা সেই কথাটা বলে ফেললেই হয়; তা না, সুধাময় আসছে রাস্তার একপাশ দিয়ে। কেন একপাশ দিয়ে আসছে, প্রায় এক প্যারা জুড়ে তার ব্যাখ্যা। সুধাময় সাবধানী। তার পিতাও খুব সাবধানী ছিলেন। সুধাময়ের এক বন্ধু বড়দিনে, পার্ক স্ট্রিটে কথা বলতে বলতে হাঁটতে হাঁটতে, অন্যমনস্ক হয়ে পাশে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানওভার হয়ে গিয়েছিল। সে-দৃশ্য সুধাময় আজও ভুলতে পারেনি। রক্তাক্ত, থ্যাঁতলানো একটা দেহ। সুধাময়ের একটা প্রশ্নের পুরো জবাব সমাপ্ত করে যেতে পারেনি। সে হাসছিল। হাসতে হাসতে নিমেষে মারা গেল। ওই একটা ঘটনায় সুধাময়ের পাকাপাকিভাবে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ এলেই সে লাফিয়ে পাশে সরে যায়। এত পাশে, যে একবার নর্দমায় পড়ে পা ভেঙে তিন মাস বিছানায় পড়েছিল। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় চলতে চলতে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল। দেখলে, দূর থেকে একটা হলদে ট্যাক্সি আসছে। পেছনের আসনে প্রশান্তর বোন বসে আছে। এয়ার হস্টেস। ভীষণ অহঙ্কারী। এক সময় সুধাময়ের ছাত্রী ছিল। মেয়েটির খোঁপার দিকে সুধাময়ের দৃষ্টি চলে গেল। সে নিজেকে তিরস্কার করল। মেয়েদের খোঁপা, তাও আবার ছাত্রী, সেই খোঁপার দিকে এই বয়সে নজর চলে যাওয়া খুবই অন্যায়। ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর সুধাময় রাস্তার দিকে তাকাল। একটা শালপাতার ঠোঙা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই প্লাস্টিক

আর কাগজের যুগে এই বস্তু এখনও আছে। সুধাময় নিজের সঙ্গে তুলনা করল। তার মতো মিসফিট মানুষের তুল্য এই ঠোঙা এখনও দু'একটা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। ঠোঙাটাকে একটা লাথি মেরে সুধাময় বেশ তৃপ্তি পেল। এইরকম একটা লাথি নিজের নিতম্বে মারতে পারলে সুধাময় খুব খুশি হত। নিজেকে নিজে লাথি মারা যায় না। এইটাই এক দুঃখ। সেই বেড়ালছানাটা একইভাবে বসে আছে দরজার বাইরে, একপাশে। বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেরোবার সময় যে-অবস্থায় দেখে গিয়েছিল, ঠিক সেই একই অবস্থায় বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। দাঁতাল শূকরের মতো ভয়ঙ্কর এই পৃথিবীতে হঠাৎ এসে পড়ে ক্ষুদ্র এই প্রাণীটি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সুধাময়ের খুব ইচ্ছে করছিল অসহায়, ভীত প্রাণীটিকে তুলে ভেতরে নিয়ে যায়। ভয়ে পারল না। পৃথিবীর ভয়ে নয়। ভয় সুধাকে। যে কোনও রোমশ প্রাণীর কাছাকাছি এলেই সুধার অ্যালার্জি হয়। রাতে হাঁপানির মতো হয়। নিঃসঙ্গ, ভীত বেড়ালটার কথা চিন্তা করতে করতে সুধাময় দোতলায় উঠতে লাগল। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের আগা ভেঙে ভেঙে গেছে। মেরামত অবশ্যই করা উচিত। একটু অন্যমনস্ক হলেই পতন অবধারিত। বহুবার পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। সারাবার সঙ্গতি নেই। সুধাময় সিঁড়িটার নাম রেখেছে সচেতনতা। সুধাময় যৌবনে কবিতা লিখত। অভ্যাসটা ধরে রাখতে পারলে কবি হিসেবে এতদিনে তার খুব নাম হত। সংসার তার এই প্রতিভাকে জাগাবার বদলে, জল ঢেলে দিল। সুধাময় বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এল। বারান্দায় শেষ বেলার ছায়া নেমে এসেছে। সুধা শুয়েছিল খাটে। কপালে হাত রেখে। সুধাময় সেইদিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার আজও কি জ্বর আসবে?'

'ওই একই প্রশ্ন নিয়ে, আসার আগেই, জ্বরকে বিছানায় বরণ করব বলে শুয়ে পড়েছি।'

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মন থেকে জোর করে অসুখটাকে তাড়াও। তোমার একটা ম্যানিয়া এসে গেছে।' কপাল থেকে হাত সরিয়ে সুধা করুণ চোখে সুধাময়ের দিকে তাকাল। এই ম্যানিয়া শব্দটা শুনলে তার ভেতরে একটা চাপা ক্রোধ ধিকিয়ে ওঠে। ক্ষতবিক্ষত সুধাময়ের দিকে তাকালে সেই ক্রোধ পরিণত হয় চাপা অভিমানে। দু'চোখের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে মাত্র। তার ভেতরের

জলও শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। সুধা আধবোজা চোখে দেখতে লাগল, সুধাময় পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙারে রেখে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসল। সুধাময় ঠোঁটে একটা সিগারেট লাগাল। সিগারেটের কাগজটা জড়িয়ে গেল ঠোঁটের সঙ্গে। বেশ বুঝতে পারল শরীর শুকিয়ে আসছে। সিগারেট খুলে নিতে গিয়ে অল্প একটু কাগজ ছিঁড়ে ঠোঁটেই লেগে রইল। সুধাময় দু'তিনবার থু থু করেও কাগজটা ছাড়াতে পারল না। তখন আঙুল দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে, জিভ বুলিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সিগারেট লাগাল। ছেঁড়া অংশ দিয়ে কয়েক কুঁচি তামাক জিভে এসে গেল। সিগারেট খুলে সুধাময় আবার থু থু করল।

সুধা খাট থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি আবার গা গুলোচ্ছে। আমি কিন্তু তোমাকে বারে বারে বলেছি, খালি পেটে থেকো না। তোমার পুরনো আলসার। এই সময় তুমি দয়া করে বিছানায় পড়ে যেও না। একটু কিছু মুখে দাও। কিছু না পারো তো, একটা বাতাসা, এক গেলাস জল।'

পর পর তিনটে দেশলাই কাঠি জ্বলল না। একটার বারুদ ঘষতে ঘষতে ক্ষয়ে গেল। একটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। আর একটার বারুদ খুলে জ্বলতে জ্বলতে বারান্দার বাইরে ছিটকে চলে গেল। সুধাময় অবাক হয়ে দেশলাইটার দিকে তাকাল। এই রকম তো হয় না কখনো। সুধাময় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দার বাইরে। ঘরে এসে খাটের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। ভুরুর মাঝখানের কপালটা দু-আঙুলে টিপে ধরে বললে, 'সুধা, মাথাটা আজ ভীষণ ধরেছে। কপালের কাছটা একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, 'এই একটা কথা বলাতে আপনি কত কাণ্ড করলেন, তাই না?'

'তুমি একটা আকাট মূর্খ! এইটুকু বোধ তোমার এল না, একে বলে বিল্ড-আপ করা। ওয়ার্মিং-আপও বলা যায়। একই সঙ্গে কত কি বোঝানো হল। এইটাই হল ক্লাসিক্যাল স্টাইল। টমাস মান, আঁদ্রে জিদ, এই কায়দায় লিখতেন। গল্পের চরিত্রকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তার ম্যানারস্, ম্যানারিজম। চেহারার কোনও বর্ণনা নেই; কিন্তু যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, একহারা, সাধারণ উচ্চতার একটি লোক। এক সময়

রঙ ফর্সা ছিল, এখন তামাটে। সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। হাতের শিরা জেগে আছে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। লোকটি সামান্য পরিশ্রমেই ঘেমে যায়। চোখ দুটো কোটরগত হলেও অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। চেহারায় একটা অভিজাত্যের ভাব এখনও ফুটে আছে। এই সমাজে লোকটি মিসফিট হলেও, অলস নয়, সংগ্রামী।'

কত কি শেখার আছে, তাই না! আমি তৃতীয় উনুনটিকে আগে এসট্যাবলিস করি। ক্ল্যাসিকাল জার্মান-সাহিত্যিকদের কায়দায়। উনুন দিয়ে যেন মানুষ চেনা যায়। যেমন ছড়ি দিয়ে বাবু। দরজার পাল্লায় একটা ছড়ি ঝুলছে। লোকটির আর ঘরে ঢোকা হল না। বেরিয়ে গেল। অনেকটা পরে ফিরে এল একটা কুড়ুল নিয়ে। বউয়ের বিছানায় মহাজনের মুণ্ডু খুলে পড়ে গেল। সেই রকম অ্যাশটেরতে পোড়া সিগারেট। স্ত্রীর প্রেমিকের সিগারেট অবৈধ ধোঁয়া ছাড়ে। শ্বশুর মহাশয়ের সিগারেট ছাড়ে তিরিক্ষি ধোঁয়া। বন্ধুর সিগারেটের মজলিশি ধোঁয়া। দারোগার সিগারেটের ধোঁয়ায় রুলের গুঁতো। ছেলের বন্ধুর সিগারেটের ধোঁয়া কেয়ার ফ্রি। পিতার সিগারেটের ধোঁয়ায় চাপা আতঙ্ক, এরপর জীবনমঞ্চে কোন দৃশ্য আসছে।

তৃতীয় উনুনটা ঢালাই লোহার। মাটির উনুন ধরে মায়ের বুকের স্নেহের আগুন। এই লোহার উনুনে যেন বউ পোড়ানো আগুন। উনুনটার চেহারা যেন গেস্টাপোর মতো। সলিড লোহা। গা'টা খসখসে। ভেতরের চাপা নিষ্ঠুরতা যেন ফুস্কুড়ির মতো ফুটে উঠেছে। অন্য দুটো উনুনের চেয়ে এই উনুনের আগুন যেন বেশি লাল। প্রথম উনুনটি তুলে নিয়ে গেল সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবক। প্রখ্যাত সাহিত্যিকের জার্মান কায়দায় যুবকটিকে একটু এসট্যাবলিশ করা যাক।

ছোট একটি ঘর। সেই ঘরে ইটের পর ইট দিয়ে উঁচু করা একটি চৌপায়া। আধময়লা একটি মশারি। সেই মশারির ভেতর যুবকটি শুয়ে ছিল। সাদা পাজামা আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে। ছোট একটা মাথার বালিস। গামছা জড়ানো। গামছা জড়াবার কারণ, বালিশের খোলে দুটো ফুটো তৈরি হয়েছে। ফুটো হবার কারণ, এই পরিবারে একটা আদুরে বেড়াল আছে। সাদার ওপর হলদে। মুখটা ভারি মিষ্টি। পোখরাজের মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। লেজটা চামরের মতো মোটা। লোভে ভর্তি থুপথুপে একটা বেড়াল। বেড়ালটার পেট কোনও সময় ঢুকে থাকে না। সব সময়

ভরভর্তি। সব সময় হাসিখুশি। হয় খাচ্ছে, না হয় ঘুমোচ্ছে। না হয় দুর্দান্ত খেলায় মেতে আছে আপনমনে। নানারকম খেলা আবিষ্কার করার অসাধারণ প্রতিভা আছে বেড়ালটার। চাদরের ঝোলা অংশে ঝুলে ঝুলে খেলে। দেশলাইয়ের খালি প্যাকেটে দু' পায়ে পাকা ফুটবলারের মতো ড্রিবল করে। হাওয়াই চটি চারপায়ে আঁকড়ে ধরে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে। কামড়াতে থাকে। কখনও লেজটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে অকারণে ঘরময় ছোটাছুটি করে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে তাকায়। তারপর আবার দৌড়োয়। তড়াং করে বিছানায় লফিয়ে উঠে খচমচ, খচমচ এ-পাশে ও-পাশে দৌড়ে চাদরের ঝোলা অংশ বেয়ে ধুপ করে মাটিতে পড়ে। এই বেড়ালটাই বালিশটা ছিঁড়েছে। তার এই অপরাধের জন্যে কেউ অসন্তুষ্ট হয়নি, বরং বেশ গর্বিত। ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছিল, তাই যুবকটির মা নতুন একটা গামছা দিয়ে বালিশটা বেঁধে দিয়েছেন। মেয়েকে বলেছেন, বালিশে দুটো তাপ্পি মেরে দিস। তার আর সময় হচ্ছে না। এটা তার অবহেলা নয়; সত্যিই সময়ের বড় অভাব। সৃষ্টি সংসারের কাজ, তিন বাড়িতে টিউশানি রবীন্দ্রসংগীত শিখতে যাওয়া আর ছোট্ট একটা প্রেম। তার দোষ নেই। সত্যিই সময়ের অভাব।

সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করা উচিত। বেড়ালের অংশটাকে এত বড় করার কারণ, বেড়াল আর বিছানা একটা সংসারকে প্রকাশ করে। উচ্চবিত্ত, ভোগী, স্বার্থপরের সংসারে, বিছানা খুব টিপটপ থাকে। বালিশের খুব বাহার। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। কলেজের কমন-রুমের মতো একটা লিভিং-রুম। আলাদা খাবার ঘর। সেই সব বাড়িতে বিছানার ওপর চাঁদের হাটবাজার বসে না। সেই সব বাড়িতে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। ঢুকলেই দেখমার। রাতের বেলায় টানটান বিছানায় শয্যাগ্রহণকারী আলতো করে শরীরটা ছেড়ে দেন। চাদর কুঁচকে শয্যার সৌন্দর্য নষ্ট হবার ভয়ে সাবধানে শরীর তুলে পাশ ফেরেন। এই ধরনের অধিকাংশ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তেমন ভাল থাকে না। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ডিভোর্স না হলে 'সোশ্যাল প্রেস্টিজ' বাড়ে না। যে মহিলা যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন ততই তাঁর সম্মান আর ব্যক্তিত্ব বেড়ে যাবে। সোসাইটির ওপর তাঁর একটা গ্রিপ এসে যাবে। তাঁর চুল তত ছোট হবে। জীবনে আর কুলিয়ে উঠতে পারেন না তাই নেড়ার আগের স্তরে এসে থেমে যান। যে

পুরুষ যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন, ডিভোর্সি মহলে তাঁর আকর্ষণ তত বেড়ে যাবে। মুখে একটা উদাসীনতা। কঠিন একটা পাকাপাকা ভাব। অর্থাৎ স্টিল থেকে টেম্পারড স্টিল। সোনা থেকে পাকা সোনা। আনাড়ি স্বামী আর কি। মেয়েরা নেড়ে চেড়ে একটু ফ্রাই করে ছেড়ে দেয়। ফ্রায়েড হতে হতে ডিপ ফ্রাই হয়ে ঈশ্বরের কাটলেট। ডিভোর্সিদের একটা বৃত্ত তাকে। বৃত্তাকারে নৃত্য।

এ ছাড়ছে, সে ধরছে। সে আবার ছাড়ছে তো ও ধরছে। এই ধরাধরি আর ছাড়াছাড়ি হতে হতে দেখা গেল, সাত-আট বছর পরে প্রথমাটি আবার প্রথমের কাছে ফিরে এসেছেন। তখন দুজনেই বলছেন, 'কি আশ্চর্য মাইরি, শুধু ওয়ার্লড ইজ রাউন্ড নয়, ম্যারেজ ইজ অলসো রাউন্ড। চলো দাঁত বাঁধিয়ে আসি।'

আর বেড়াল। এরই মধ্যে এই কাহিনীতে দুটো বেড়াল এসে গেছে। প্রথম বেড়ালটি এসেছে উদাহরণে। সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সুধাময়কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অসহায় একটি বেড়ালছানা এনেছেন। পৃথিবী হল গেস্টাপোর পায়ের বুটজুতো আর বেড়াল হল অসহায় জীবন। এ কাহিনীর বেড়াল এই পরিবারের জীবনদর্শন। অভাবের কুম্মির পরিবারটিকে চিউইংগামের মতো চিবোলেও, মানুষগুলো ফ্যান-ফোন-ফ্রিজ-মারুতিঅলা পরিবারের সদস্যদের মতো নীচ আর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়নি। ঐশ্বর্যশালীর নাস্তিকতা অথবা ভীতআস্তিকতা নয়, মেঠো মানুষের সহজ সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসে পরিবারটি চালিত। গৃহকর্ত্রীর চিৎকার-চেঁচামেচি, তাঁর বাইরের দিক, ভেতরে তুলতুলে সাদা ভাল্লুকের মতো, স্নেহ-ভালবাসা-মমতা-উদারতা ঘাপটি মেরে বসে আছে।

পাজামা আর গেঞ্জি-পরা যুবকটি যদি আমাদের এই কাহিনীর নায়ক হয় তাহলে তার কিছু গুণ থাকা চাই। ছেলেটি সম্প্রতি বাংলায় এম এ করেছে। ভীষণ সরল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সন্দেহবাদী নয়। বাঁচতে ভালবাসে। মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। অতীতের গল্প তাকে টানে। তার ভবিষ্যৎ হতাশায় ভরা নয়। বয়সের তুলনায় বুদ্ধি পাকেনি। সকলের সব কথাই সে বিশ্বাস করে। ঠকলেও তার জ্ঞান হয় না। ক্ষমাশীল। 'যাক-গে, একটা দুটো লোক ওরকম করতেই পারে'—বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। বাবা, মা, বোন—তিনজনকেই সে খুব ভালবাসে। তিনজনের জন্যেই সে

জীবন দিতে পারে। তার মৃত্যুভয় নেই। নিজে অসম্ভব কষ্ট করতে পারে। সাজ-পোশাকের কাপ্তেনি তার অসহ্য লাগে, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন। সে অলস নয়, কিন্তু ঠেলে না তুললে, ভোরবেলা সে কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ঘুম থেকে ওটার পরও নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়। মনে হয়, সারারাত সে যেন লড়াই করে উঠল। সে নিজেই বলে 'ডিংডং-ব্যাটল'।

এইবার ছেলেটির একটা সুন্দর নাম রাখা যাক। এমন একটি ছেলের নাম শঙ্কর ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। 'নিউমারোলজি' বলে একটা শাস্ত্র আছে। বিজ্ঞানের বাইরে। সেই শাস্ত্র অনুসারে শঙ্কর নামের ছেলেরা ভাল হতে বাধ্য। এই যে শঙ্করের চরিত্রটা এইরকম হয়ে গেল, এরপর আর প্রেমের গল্প হয় না। এই ছেলে কখনও প্রেম করতে পারে না। কারণ শঙ্কর নিজের জামার বুক পকেটে উদ্বোধন থেকে কেনা স্বামী বিবেকানন্দের ছোট্ট একটি ছবি রাখে। সত্যি রাখে। এটা গল্প নয়। মুভি ক্যামেরার বদলে এবার আমি নিজে আসরে নেমে পড়লুম। সেই ঘটনাটির মতো, শঙ্কর আমার গলায় চেন দিয়ে টানছে।

শঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুমি স্বামীজির ছবি সবসময় বুক পকেটে রাখ কেন? ভণ্ডামি! গলায় গুরুদেবের লকেট ঝুলিয়ে অনেক পরমার্থী দেহার্থী হয়ে বেশ্যালয়ে যায়।'

'সে কে কি করে আমি জানি না। আমার জানার দরকার নেই। আমি একটা শক্তির স্পর্শ পাই বলে রাখি। একটা আদর্শ আমার হাত ধরে রাখে সব সময়। আমার হতাশা কেটে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারবো না কোনওদিন; কিন্তু তাঁর ত্যাগ, বিবেক বৈরাগ্য যদি সামান্য স্পর্শ দিতে পারে আমাকে, এ জীবনে আমার কোনও দুঃখ থাকবে না, হতাশা থাকবে না।'

'কেন তুমি তো ফোর্ড অথবা গেটি কি ওনাসিসের ছবি রাখতে পারো। তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিংডম গড়ে তুলতে পারো। ত্যাগ তো নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। তুমি জীবনের পজিটিভ-সাইডটা নিচ্ছ না কেন; তার কারণ তোমার অক্ষমতা। ভাবে যা করা যায়, কাজে তা করা যায় না। ধরতে গেলে শক্তি চাই, ছাড়তে গেলে শক্তির প্রয়োজন হয় না। দুর্বলের আলগা হাত থেকে তো সবই খুলে পড়ে যায়। সেইটাকেই ত্যাগ বলা

হোক। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।'

'ভোগের একটা ব্যাকরণ আছে। সিঁড়ি আছে। ধাপ আছে। ত্যাগের কোনও ব্যাকরণ নেই। ত্যাগ করতে গেলে কি ভীষণ শক্তির প্রয়োজন আপনার ধারণা নেই। ছেঁড়া, তালি মারা একটা জামা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হলেও মন টেনে ধরে। ভোগ বসে আছে মনের ভেতরে, কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে। অহরহ ফুঁ মেরে চলেছে বিষয়ের ব্লোয়ার। আরো চাই, আরো চাই, সদাসর্বদা এই সংকীর্তন চলেছে। এই যা পেলুম, পরমুহূর্তেই তাতে আর মন ভরে না, অন্য কিছু চাই। চাওয়া, পাওয়া না পাওয়া, পুড়ে যাওয়া ছাই। এ এস এইচ। এ এস...এস।'

'আমার কি মনে হয় জান, ধর্ম, ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আদর্শ, সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য—সবই হল দুর্বলের বলিষ্ঠতা। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি। তুমি বাংলার এম এ, তোমার দ্বারা তা আর কিছু করা সম্ভব নয়। স্কুল মাস্টারি জোটানও শক্ত। তুমি এখন সন্ন্যাসীও হয়ে যেতে পার। আবার কেউ যদি তোমাকে বলে, আমার অসুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে কর, তোমাকে আমি আমার কোম্পানির বিরাট একজন একজিকিউটিভ করে দেব, তাহলেই তোমার মতিগতি বদলে যাবে। ব্যাঙ্গালোরে সাজানো অফিসে গিয়ে বসবে। সাজানো কোয়ার্টার। লাল গাড়ি। স্যুট, টাই, পার্টি, ড্রিংকস। সোসাইটি। কলগার্লস।'

শঙ্কর বললে, 'ঠিক হচ্ছে না। গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে। দার্শনিক তর্কবিতর্কে না গিয়ে, একপাশে বসে নিরাসক্ত হয়ে দেখুন, আমি কি করি। কি ভাবে আমি ফুটে উঠি। ভাল, ক্ষমতাশালী লেখকরা পাকামো না করে জীবনকে অনুসরণ করেন। জীবন সৃষ্টি করেন স্বয়ং ঈশ্বর। এক-এক জীবন এক-এক রকম। জন্মানোমাত্রই জীবন-ঘড়ির টিকটিক শুরু হয়ে গেল। সব মানুষেরই ভেতরে একটা ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ি ঠিক করে একজন মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে কেমন থাকবে, তার শরীর, তার মানসিক অবস্থা, তার অনুভূতি তার কর্মতৎপরতা। রোজ সূর্য উঠছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জোয়ার আসছে নদীতে ভাঁটা পড়ছে। বিভিন্ন গতিতে গ্রহ ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সূর্যের গতি, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে জীবনের অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ভূমিকম্পের সাইক্‌ল্ আছে, ঋতুচক্র আছে, আবহাওয়ার পরিবর্তনেরও একটা সাইক্‌ল্ আছে। মানুষের

মন মগজ, ভালো লাগা, না-লাগা, কাজ করার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই এই ঘড়ির নিয়ন্ত্রণে। যদি পারেন ডক্টর হেরম্যান সোবোদার, দি পিরিয়ডস অফ হিউম্যান লাইফ বইটা পড়ে নেবেন। মানুষ যা ভাবে তাই করে, যা ভাবে না, তা করে না, করলেও জোর করে করে। আর এই ভাবনাটা নিয়ন্ত্রণ করে তার জন্মকালীন ঘড়ি।'

আমার চরিত্রের হাতে মার খেয়ে আমি থেবড়ে বসে পড়লুম।

শঙ্কর যে জায়গাটায় শোয়, তার মাথার কাছে একটা কুলুঙ্গি। সেইখানে একটা টেবিল ঘড়ি। মরচে ধরা। তবে অ্যালার্মের শব্দটা ভারি সাংঘাতিক। সেই শব্দে পুরো বাড়ি জেগে ওঠে। শঙ্করের একটা হিসেব আছে। অ্যালার্মটা যখন বাজে তখন উনুনটা ধরে আসে। শঙ্কর চৌকি থেকে নেমে, ঘুম চোখে সোজা এগিয়ে যায় বাইরে, যেখানে উনুনটা অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে। উনুনটাকে সোজা তুলে এনে রান্নাঘরে বসিয়ে দেয়। একটু দেরি করলেই তার অধৈর্য মা তুলে আনবেন। মা বাতে ক্রমশ বেঁকে আসছেন। কোমরে স্পন্ডিলোসিস। শঙ্কর মাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে, আর বোনকে ভালবাসে ফুলের মতো। সমস্ত কায়িক পরিশ্রম থেকে দূরে রাখতে চায়। শঙ্করের মানসিকতা হল সংসারের সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা তার ওপর দিয়েই যাক। অনাহার, অসুখ, অপমান— যা কিছু অশুভ সব বহে যাক তার ওপর দিয়ে, বাকি সকলে ওরই মধ্যে একটু আড়ালে, একটু সুখে থাকুক। দুঃখটাকে শঙ্কর ভীষণ ভালবাসে। কষ্টে মানুষ পবিত্র হয়, চরিত্রবান হয়। প্রাচুর্যে মানুষ চরিত্রহীন হয়। জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়। শঙ্কর নিজের কাজ নিজেই করে নিতে ভালবাসে। গরম, জ্বলন্ত উনুনটাকে রান্নাঘরে পাচার করে দিয়ে, শঙ্কর বিছানা তুলবে। বোন শ্যামলী তাকে সাহায্য করতে চাইলেও শঙ্কর সাহায্য নেবে না। ছেলেবেলায় তার আদর্শবাদী শিক্ষক তার মনে একটি মন্ত্র লিখে গিয়ে গেছেন চিরতরে, সেল্‌ফ্‌ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ। বিছানা তোলার পর শঙ্কর মুখ ধোবে।

উঠান। কল। জল পড়ছে সরু সুতোর মতো। উঠানটা শ্যাওলা ধরাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার। ঝকঝকে পরিষ্কার। এর জন্যে সমস্ত কৃতিত্বই শঙ্করের পাওনা। শঙ্করের মা একবার পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন টিনের বালতির ওপর। ঈশ্বরের অসীম কৃপা। কোমরটা ভাঙেনি। সামনের একটা দাঁত খুলে পড়ে গিয়েছিল। দাঁতটা একটু নড়বড়েই ছিল। সেই দিন

থেকে শঙ্করের কাজ হয়েছে, পাথর মেরে উঠান পরিষ্কার। বাঙালির মজা হল, নিজেরা ভাল কিছু করবে না। অন্যে কেউ কিছু করলে হাসাহাসি হবে। এই উঠান পরিষ্কার নিয়ে নানা কথা শঙ্করের কানে আসে। বেকার ছেলে অফুরন্ত সময় কি আর করবে। একটা কিছু তো করতে হবে! এ-কথাও কানে এসেছে, শরীরটা পুরুষের হলেও মন আর স্বভাবটা মেয়েমানুষের। উনুনে কয়লা দিচ্ছে, দুপুরে গুল দিচ্ছে। কলতলায় চাল ধুচ্ছে। শঙ্কর মনে মনে ভাবে—মুখ দিয়েছেন যিনি, বাত দিয়েছেন তিনি।

কলতলায় যাবার সময় শঙ্কর খড়ম পরে। চিৎপুর থেকে খুঁজে খুঁজে এক জোড়া খড়ম কিনে এনেছে। পায়ের তলাটা নোঙরা হয়ে গেলে তার বিশ্রী লাগে। খড়মের খটাস্ খটাস্ শব্দে সকলকে সচকিত করে শঙ্কর কলতলায় গিয়ে দাঁড়াল। শঙ্কর গামছার বদলে ব্যবহার করে একটুকরো সাদা কাপড়। গামছা জিনিসটাকে সে অপছন্দ করে। তোয়ালে বড়লোকের এবং অস্বাস্থ্যকর। শঙ্কর এক মিটার মার্কিন কিনে এনে নিজেই মেশিন চালিয়ে ধার দুটো সেলাই করে নেয়। তার সেই শিক্ষাগুরু বলতেন, লিভ ইন স্টাইল। বাঁচাটা যেন রুচিসম্মত হয়। অঢেল খরচ না-করেও রুচিসম্মত বাঁচা যায়।

বাঙালির জীবন হল, জল আর কল। কলতলা খালি যাবার উপায় নেই। কেউ না কেউ থাকবেই। শঙ্কর খড়ম পায়ে কলতলায় গিয়ে দাঁতে বুরুষ ঘষতে লাগল। আর সেই সময় দ্বিতীয় উনুনটি তুলতে এল আরতি। তীব্র চেহারা। যেমন রঙ, তেমনি ধারালো চোখ-মুখ। চোখ দুটো যেন ছুরি ছোলা। খুব নাম করা ভাস্কর কেটেছেন। পটলচেরা। মণি দুটো জ্বলজ্বল করছে। শঙ্করের কলতলায় আসা আর আরতির উনুন তুলতে আসা রোজই এক সময় হয়। এই নিয়ে তৃতীয় পরিবারটিতে নানা আলাপ-আলোচনা। আরতিদের উনুনটা আকারে বেশ বড়। এক একবারে সের পাঁচেক কয়লা ধরে। আগুনও হয় তেমনি গনগনে। আরতি একহারা, লম্বা। শঙ্কর রোজই দেখে, আরতি নানাভাবে চেষ্টা করছে উনুনটাকে কায়দা করার। পারছে না। তখন শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে বলে, 'দেখি সরুন'। তারপর উনুনটাকে অক্লেশে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় তাদের রান্নাঘরে। এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ফিরে আসে কলতলায়। রোজই আরতি কিছু বলতে চায়। বলা আর হয় না, কারণ শঙ্কর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। কোনও দিকে তাকায়

না। তার মুখে ব্রাশ। গায়ের ওপর সাদা মার্কিনের টুকরো। আরতির জীবনের ঘোরালো একটা ইতিহাস আছে। কে বলেছে বাঙালি ইতিহাস বিমুখ। পারিবারিক ইতিহাস কারোর অজানা থাকে না। কোনওভাবেই চেপে রাখার উপায় নেই। কোথা দিয়ে ঠিক বেরোবেই বেরোবে। আরতির বাবার আর্থিক অবস্থা একসময় খুবই ভাল ছিল। মধ্য কলকাতায় সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। বাড়ির পেছনে লন ছিল, ফুলগাছ ছিল, দোলনা ছিল। একটা গোমড়ামুখো ভকসহল গাড়ি ছিল। আরতিকে দেখলেই বোঝা যায়, আরতির মা খুব সুন্দরী ছিলেন। বিদূষী মহিলা; একটু বিলিতিভাবাপন্ন। আরতির বাবার বিশাল এক ব্যবসা ছিল। দুই পুরুষের ব্যবসা। পিতামহ ফেঁদেছিলেন, পিতা বাড়িয়েছিলেন। আরতির বাবা আধুনিক করেছিলেন। কারবারটা ছিল এনামেলিং-এর। এনামেলের হাজাররকম জিনিসপত্র তৈরি হত। রপ্তানি হত বিদেশে। বিশাল কারখানা ছিল ওপারে। গঙ্গার ওই কূলে। রপ্তানির সূত্রে আরতির বাবা বহুবার বিদেশে গেছেন। বিবাহ করেছিলেন এক অতি সম্পন্ন স্টিভেডারের সুন্দরী মেয়েকে। মেয়েটি ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে অনেকটা মৌচাকের মতো। সব সময়ই সে চাকে মৌমাছি বিড়বিড় করে। করে। আরতির রাসায়নিক পিতা জীবন আর জগতকে কর্মযোগীর দৃষ্টিতে নিয়েছিলেন। খাটবেন, খুটবেন, অর্থ উপার্জন করবেন, কিছু মানুষের কর্ম-সংস্থান করবেন। দিনের শেষে ফিরে আসবেন সুখী গৃহকোণে। সেই গৃহকোণ অবাঞ্ছিত উপদ্রবে আর সুখী রইল না। তিনি ভেবেছিলেন বাঙালি মেয়ে এক স্বামীতেই সন্তুষ্ট থাকবে। তা আর হল কই! বাড়ি, গাড়ি, বিত্ত, আদর্শবাদী স্বামী, স্বাভাবিক এইসব পাওনার ঊর্ধ্বে একটু হিং-এর গন্ধ। একটু পাপ। একটু বিশ্বাসঘাতকতা। একটু লুকোচুরির আকর্ষণ কারো কারো কাছে অনেক বেশি। থ্রম্বোসিস শুধু মানুষের হয় না, ভাগ্যেরও হয়। আরতির যখন তিন-চার বছর বয়েস, আরতির মা গৃহত্যাগ করলেন এক তরুণ পাঞ্জাবী শিল্পপতির সঙ্গে। দিল্লিতে তাঁর বিশাল এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা। কে জানে ভদ্রমহিলা এখন কেমন আছেন। যৌবন কি ধরা আছে দেহে। থ্রম্বোসিসের প্রথম আক্রমণ। আরতির বাবা করুণাকেতন প্রথম ধাক্কাটা কাটালেন। এল দ্বিতীয় আঘাত। কারখানায় শুরু হল ধর্মঘট। ভাঙচুর, খুনোখুনি। হল লকআউট। কারখানার ভেতরে

জঙ্গল তৈরি হয়ে গেল। যন্ত্রে মরচে ধরে গেল। করোগেটের চাল খুলে খুলে পড়ে গেল। ঝড়ে চিমনি দুমড়ে গেল। পেছনের পাঁচিল ভেঙে মালপত্র চুরি হয়ে গেল। করুণাকেতন বেধড়ক ধোলাই খেয়ে হাসপাতালে পড়ে রইলেন তিনমাস। এদিকে এনামেলের জায়গায় এসে গেল স্টেনলেস স্টিল, প্লাস্টিক, হিট রেজিসটেন্ট গ্লাস। পুরো ব্যবসা চৌপাট হয়ে গেল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো। বাড়ি গেল, লন গেল, দোলনা গেল, টেনিস কোর্ট গেল। এইবার তিন নম্বর স্ট্রোক। ভাগ্য আর দেহ দুটোই সেই আঘাতে টাইসনের ঘুষি খাওয়া বক্সারের মতো লুটিয়ে পড়ল রিং-এ। এক থেকে দশ গুণে গেলেন রেফারি। করুণাকেতন উঠতে পারলেন না। মায়ের দেনা শোধ করছে আরতি। মাসের রোজগার সাতশো টাকা। ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট। আরতির দিকে অনেকেরই নজর আছে। সেই সর্বনাশ আর পৌষ মাসের গল্প। মা যার চরিত্রহীনা, সেই মেয়ে ক'দিন আর ঠিক থাকতে পারে। তিমির বাচ্চা, তিমিই হবে। অনেকেই দাঁতে দাঁত মিশমিশ করে বলে, আঃ, একবার বাগে পেলে হয়। পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ আছে, যাদের দিবারাত্র এক চিন্তা, কখন একটা মেয়েকে ক্যাঁক করে ধরবো। সামনে দিয়ে কোনও মেয়ে চলে গেলে ভাবে, এই যাঃ, চলে গেল। চোখে শিকারী বেড়ালের ঘুটঘুটে দৃষ্টি। এদিকে তাকাচ্ছে, ওদিকে তাকাচ্ছে। বন্ধুর বাড়িতে গেছে, বন্ধুর স্ত্রী চা দিতে এসেছে। সেন্টার টেবিলে চা রাখার জন্যে নিচু হয়েছে, অমনি, বাপ করে উঠল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'কি হল ভাই সন্তু, চা পড়ল গায়ে?' বন্ধুর স্ত্রী জানে কি হয়েছে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বুকে আঁচল টেনে দিল। আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়াল না। চলে গেল ভেতরে। চলে যাবার পর স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা তোমার কোথাকার আমদানি! চোখে আবার খাবো দৃষ্টি! অসভ্য।'

না, এইবার তৃতীয় উনুনটাকে এশট্যাবলিশ করা যাক। রোগা, পাতলা, অ্যানিমিক এক মহিলা, চেহারা দেখে বয়েস বোঝার উপায় নেই। কুড়িও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। ঢালাই উনুন, কয়লাটয়লা পড়ে বিশ, ত্রিশ কেজি ওজন হয়েছে। অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে উনুনটাকে ভেতরে নিয়ে গেল। পরক্ষণেই, বাইরের রকে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে একপাশে বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে দামড়াপানা

একটা লোক বেরিয়ে এসে, আকাটের মতো বললে, ‘কি, আজ চা-টা হবে? চাঁটা না খেলে তোমার দেখি গতর আর নড়েই না। যে পুজোর যা নৈবেদ্য। বাবু এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছেন; ওদিকে আমার দোকান লাটে উঠুক।’

শঙ্কর এই দৃশ্য রোজই দেখে। দেখে, একটা পেটমোটা যমদূতের মতো লোক, অসুস্থ, ক্ষীণজীবী এক মহিলাকে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করছে। কে বলেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ স্বাধীন হয়েছে, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসার হিন্দুসভ্যতা এক সুপ্রাচীন সভ্যতা। বিশ্বের গৌরব। দামড়া লোকটা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। হাতিবাগানে স্টল আছে। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে, নেশা করে। রোজই বৌটাকে ঘরে খিল দিয়ে পেটায়। অন্যেরা প্রতিবাদ করেছিল, ভদ্রলোকের পাড়ায় একি ছোটলোকমি। রোজ রাতে চিৎকার, চেঁচামেচি। দামড়া এখন পলিসি পাল্টেছে। বউয়ের মুখে গামছা পুরে পেটায়। আবার রোজ সকালে টেরিকটনের পাঞ্জাবি, চুস্ত পাজামা পরে, মশলা চিবোতে চিবোতে ব্যবসায় যায়। তখন বোঝাই দায়, লোকটা ইতর না লোকটা ভদ্রলোক। তখন সে রতনবাবু। দুটো পয়সার মুখ দেখেছে। রতনবাবু আবার পার্টি করেন। বলা যায় না, দেশের যা অবস্থা হচ্ছে, এই মালই হয় তো মন্ত্রী হয়ে বসবেন। হয় তো শিক্ষামন্ত্রী হবেন।

শঙ্কর ব্রহ্মদৈত্যের মতো,খড়ম খট্‌খটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোখে। তার সেই ছোট ঘরে চারখানা থান ইট আছে। সেই ইট চারটে সরিয়ে প্রাণ ভরে ডন মারে। পঞ্চাশটার কম নয়। শ’খানেক বৈঠক। জানালার গরাদ ধরে ঝুলে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ব্যায়াম হয়ে যাবার পর, পুরো দু-মুঠো ছোলা খায়। চারটে বাতাসা দিয়ে। তারপর এক লোটা জল। এরপর সে একটা ব্যাগ বগলে বাজারে যায়। শঙ্কর বেশ গুছিয়ে বাজার করতে পারে। সাতটাকা হল তার বাজেট। মাসে দুশো দশ টাকা। মাছ, মাংস, ডিম খাওয়ার পয়সা নেই। এক প্যাকেট দুধ আসে। দু’বার চা হয়। সকালে একবার, বিকেলে একবার। একটু বেড়াল খায়। যে-টুকু বাঁচে, সেইটুকু সে জোর করে মাকে খাইয়ে দেয়। শঙ্করের বাবার, প্যাকেটের দুধ খাওয়ায় ভীষণ আপত্তি। সংসারের খরচ শঙ্করই কন্ট্রোল করে। মাসে সাতশো টাকার এক পয়সা বেশি খরচ করলে চলবে না। বরং কিছু বাঁচলে ভাল হয়। তিনশো টাকার

মতো বাড়ি ভাড়া। শঙ্করদের অবস্থাও এক সময় বেশ ভাল ছিল। বাবা হঠাৎ বসে যাওয়ায় সংসারটা দমে গেছে। শঙ্কর ভাবে, তা যাকগে। চিরকাল মানুষের সমান যায় না। জন্মেছি, জলে পড়েছি। সাঁতার কাটতেই হবে। স্রোতের অনুকূলে, স্রোতের বিপরীতে। যখন, যেমন! হাত-পা সর্বক্ষণ ছুঁড়তেই হবে। তা না হলেই ভুস। অতল তলে। শঙ্কর যেভাবে বেঁচে আছে, সেই বাঁচাটাই তার ভীষণ ভাল লাগে। সকালে ছোলার বদলে ডিম আর টোস্ট হলে তার খুব খারাপ লাগবে। ডাল, ভাত আর যে-কোনও একটা তরকারির বেশি অন্য কিছু হলে সে খেতেই পারবেনা।

শঙ্কর যেমন শঙ্করদের সংসার চালায়, আরতি সেইরকম চালায় আরতিদের সংসার। শঙ্কর ছেলে, আরতি মেয়ে। শঙ্কর আর আরতি প্রায় একই সময়ে রাস্তায় নামল। দু'জনেরই হাতে ব্যাগ। আরতির ব্যাগটা সুন্দর, শঙ্করের ব্যাগটা সাদামাটা। আরতির রুচিটা একটু অন্যরকম। তাদের ঘরদোর ওরই মধ্যে বেশ সাজানো-গোছানো। প্রতি মাসে কোনও একটা জায়গা থেকে বেশ কিছু টাকা আসে। আমি জানি কোথা থেকে আসে! আরতির বাবার কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড করা আছে। সেই সুদে কোনওরকমে চলে যায়। দুজনের সংসার। ঝামেলা তেমন নেই। আরতি জীবনের সুদিন দেখেছে; তাই এই দুর্দিনে সে একটু বিষণ্ণ। রাস্তায় বেরোলে তার বিষণ্ণতা বেশি বোঝা যায়। উদাস দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলে। যেন সে হেঁটে চলেছে জগৎ-সংসারের বাইরে দিয়ে।

শঙ্কর রাস্তায় বেরোলেই পাড়ার কয়েকটা বাচ্চা তাকে ঘিরে ধরে। ওরা সব শঙ্করের বন্ধু। বাচ্চাগুলোকে শঙ্কর ভীষণ ভালবাসে। তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সমবয়সী। খেলার কথা, পড়ার কথা, খাওয়ার কথা। বাড়িতে কিছু তৈরি হলে শঙ্করের জন্যে নিয়ে আসে পকেটে করে। ঠোঙায় করে। এই বাচ্চাদের সঙ্গে শঙ্কর মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করে। সে বেশ মজা। কেউ নিয়ে এল আলু। কেউ নিয়ে এল ময়দা। কেউ তেল। বনস্পতি। শঙ্করেরও সমান ভাগ থাকে। একটা কেরোসিন কুকার আছে। অপুদের বাড়ির ছাদে, জমে গেল বনভোজন। শঙ্কর রাঁধে, বাচ্চারা জোগাড়ে। কখনও কখনও শ্যামলী এসে যোগ দেয়, সেদিন রান্নাটা বেশ খোলতাই হয়। শালপাতা। লুচি, আলুরদম, শুকনো শুকনো। শঙ্কর সন্ধেবেলা বাচ্চাগুলোকে এক জায়গায় করে পড়তে বসায়। তখন তার

ভূমিকা শিক্ষকের। এদের কারোরই অবস্থা তেমন ভাল নয়। শঙ্করের একটাই ভয়, পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় ওরা যেন বড়লোকদের কাছে হেরে না যায়। যত সুযোগ ওরাই তো গ্রাস করে নিচ্ছে। ভাল বাড়ি। ভাল স্কুল, ভাল খাওয়া, ভাল পরা। রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি হাঁকিয়ে যায়, তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এদের সঙ্গে ট্রেনের এক কামরায় ভ্রমণ করা যায় না। সিনেমা, থিয়েটারে বসা যায় না। রেস্তোরাঁয় ঢোকা যায় না। এদের অর্থের উৎস হল ব্যবসার দুনম্বরী পয়সা। চাকরি হলে বাঁ হাতের কামাই। পয়সার জোরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, বিলেত, সুন্দরী স্ত্রী। পৃথিবীর সমস্ত ঝোল এরা নিজেদের কোলেই টানছে। একটা বাচ্চা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার চিকিৎসার জন্যে শঙ্কর সাহায্য সংগ্রহে বেরিয়েছিল। পাড়ার সকলেই সামর্থ্য অনুসারে যে যা পারলেন, দিলেন। পাড়ার বড়লোক শিল্পপতি মানিক ব্রহ্ম বললেন, 'চাঁদা তুলে তুমি ক'জনের চিকিৎসা করাবে? সারা দেশটাই তো অসুস্থ। এই সব দায়িত্ব হল স্টেটের।' ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের সমস্যাটা কি বল তো, এই রকেটের যুগে আমরা এখনও পড়ে আছি পল্লীমঙ্গলের আইডিয়া নিয়ে। ও-সব বাজে কাজ ছেড়ে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর। কিছু মরবে, কিছু বাঁচবে। যাদের বাঁচার অধিকার নেই, তাদের মরতে দাও। একটা গাছে যত ফল ধরে সবই কি আর বাঁচে, পাকে? কিছু পাখিতে ফেলে দেয় ঠুকরে। কিছু,পড়ে যায় ঝড়ে। কিছুতে পোকা লেগে যায়। জীবজগতের এই হল নিয়ম। তুমি কি করবে, আমিই বা কি করব!' মানিক ব্রহ্ম আচ্ছা করে উপদেশ পাম্প করে শঙ্করকে ছেড়ে দিলেন। এদেশে তিনটে জিনিস খুব সহজে পাওয়া যায় বিনা পয়সায়। কলের জল, উপদেশ আর গণধোলাই।

অপুটাকে দেখতে ভারি সুন্দর; কিন্তু ভাগ্যটা ভীষণ অসুন্দর। তিনবছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছে। ভদ্রলোক হাওড়ার এক ঢালাই কারখানায় কাজ করতেন। সেইখানে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। স্ত্রী, ছেলে, বৃদ্ধা মা আর সাবেককালের একটা একতলা বাড়ি রেখে গেছেন। অপুর মা যে কীভাবে সংসার চালান, শঙ্কর তা জানে না। সবাই আশা করেছিলেন, অপুর মা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াবে। অন্তত পাড়ার লোক একজন সুন্দরী, যুবতী ঝি পাবে। সে গুড়ে বালি। অপুর মা আজ সাত-সাতটা বছর

ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রঘরের বউদের যেমন চালানো উচিত। এই নিয়েও গবেষণার শেষ নেই। একটা সিদ্ধান্তে এসে এখন সবাই বেশ সন্তুষ্ট, অপুর মা লুকিয়ে দেহ-ব্যবসা করে। আরে ছিঃ ছিঃ। এই ছি-ছি শব্দটা বলতে পারায় সকলেরই বেশ কোষ্ঠ-সাফ।

অপু শঙ্করের হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললে, 'মা তিলের নাড়ু করেছিল, তোমার জন্যে নিয়ে এলুম। জিনিসটা কেমন হয়েছে, খেয়ে বল তো। তুমি তো তিলের নাড়ু ভালবাস!'

'ভালবাসি মানে! তিলের নাড়ু আমার জীবন। গোলাপের গন্ধ আছে?

'না গো, গোলাপ আমরা পাবো কোথায়। শোনো না, আমি অনেক অনেক বড় হয়ে, যখন তোমার মতো বড় হয়ে যাব, তখন তো আমি চাকরি করব, তখন তোমাকে আমি গোলাপ দিয়ে তিলের নাড়ু খাওয়াব, প্যাঁড়া খাওয়াব।'

'বড় হলেই কি আর চাকরি পাওয়া যায় রে অপু। এই তো দেখ না, আমি বড় হয়ে বসে আছি।'

'তুমি চাকরি পাওনি তো, সে বেশ হয়েছে। কেন বল তো, তুমি চাকরি পেলে, রোজ ন'টার সময় বেরিয়ে যাবে, আর রাত ন'টায় ফিরে আসবে, তাহলে আমাদের কি হবে, বল। তুমি শঙ্করদা চাকরি কোরো না। তুমি একটা দোকান দাও। আমার মা বলছিল, আমাদের রাস্তার দিকের ঘরের দেয়ালটা ভাঙলে সুন্দর একটা দোকানঘর হবে। সেখানে একটা দর্জির দোকান করলে কেমন হয়! তা মা বললে, আমি তো ছাঁটকাট বেশ ভালই জানি, সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ থাকলে করা যেত। তুমি আজ মায়ের সঙ্গে কথা বল না শঙ্করদা। আমার তাহলে টেরিফিক আনন্দ হয়।'

'তোর না অপু কোনও বুদ্ধি নেই, একেবারে গবেট মেরে যাচ্চিস। অঙ্কে তুই রসগোল্লা পাবি। দোকান করতে গেলে টাকা চাই। অ্যাতো, অ্যাতো টাকা। সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে পাঁঠা!'

'টাকা?' কথা হচ্ছিল রকে বসে। অপু গালে হাত রাখল। শঙ্কর অপুর সেই ভঙ্গিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোড়ক খুলে একটা তিলের নাড়ু মুখে ফেলল। বেশ মুচমুচে। পাকটা বেশ ভালই হয়েছে।

অপু হঠাৎ যেন আশার আলো দেখতে পেল। গাল থেকে হাত সরিয়ে শঙ্করের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বললে, 'নো প্রবলেম! আমরা এ বছর মা দুর্গার পুজো করবো। বারোয়ারি।'

'হচ্ছে দোকানের কথা, তুই চলে গেলি দুর্গাপুজোয়। তুই কেমন করে ফার্স্টসেকেন্ড হোস। আয়, তোর মাথাটা ওপেন করে দেখি।'

'শোনো না, আমার প্ল্যানটা। তারপর তুমি আমাকে গাধা বলো গাধা, পাঁঠা বল পাঁঠা। আমরা ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে অনেক টাকা চাঁদা তুলবো; তারপর ছোট্ট এতটুকু একটা মূর্তি এনে পুজো করে, বাকি টাকায় দোকান।'

শঙ্কর অপুর মাথায় টাক করে একটা গাট্টা মেরে বললে, 'ওরে আমার চাঁদুরে! তারপর গণধোলাই। হাতে হাতকড়া। কোমরে দড়ি। কি প্ল্যানই বের করলে।'

'তা হলেও তুমি একবার আমার মায়ের সঙ্গে কথা বল। জান তো, তোমাদের বাড়ির ওই রতনবাবু মাকে খুব জপাচ্ছে। লেডিজ টেলারিং করবে। লোকটা একেবারে দু-নম্বরী। যখন তখন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কাল রাতে চুল্লু খেয়ে এসেছিল। আমি কিন্তু একদিন পেছন থেকে ঝেড়ে দোবো, লোকটা কাল রাতে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেছিল। শঙ্করদা তুমি আমার মাকে ভালবাস তো?'

'ভীষণ! যারা সৎপথে থেকে লড়াই করে, আমি তাদের সকলকেই ভালবাসি।'

'মা-ও তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। তুমি একটা কিছু কর শঙ্করদা।'

'দাঁড়া, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি ভেবে দেখি। আজ দুপুরে তুই আমাকে মিট কর। তারপর দু'জনে মিলে লড়ে যাব। তুই ভাইরাস কাকে বলে জানিস?'

'না গো।'

'ভাইরাস এমন রোগ জীবাণু, যা কোনও ওষুধে মরে না। এই রতন-টতন হল সেই ভাইরাস।'

'তিলের নাড়ু কেমন খেলে?'

'জমে গেছে।'

'মাকে গিয়ে বলতে হবে। মা তোমাকে ভীষণ খাওয়াতে ভালবাসে। বলে, আমার যদি সেরকম অবস্থা হত, তাহলে তোর শঙ্করদাকে আমি

রোজ রোজ নানারকম করে করে খাওয়াতুম। আমার মা কত কি যে করতে জানে।'

'সে আর কি হবে। বেশি বাজে বাজে খাবি না। পেলেও না। ডাল, ভাত, একটা যে কোনও তরকারি, বাকি সব বোগাস। এই নে, এই দুটো নাড়ু তুই খা।'

'আমি তো খেয়েছি।'

'তবু খা। আমি দিচ্ছি।'

শঙ্কর শিশুমহল ছেড়ে উঠে পড়ল। শঙ্করের কড়া নিয়ম, এইবার সব পড়তে বসবে। সবাই জানে, ঠিক মতো লেখাপড়া না করলে শঙ্করদা আর ভালবাসবে না। তা ছাড়া শঙ্করদা ওই বড় বাড়ির ছেলেদের দেখিয়ে বলে দিয়েছে, ওদের হারাতে হবে। লেখাপড়ায়, খেলাধুলোয়, শরীর-স্বাস্থ্যে। ওই যে ছাইরঙের বাড়ির ছেলেরা খুব কেতা মেরে, সাদা প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি পরে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে বেরোয়। ব্যাট, লেগগার্ড, গ্লাভস, টুপি, ওয়াটার বটল, হটবক্সে লাঞ্চ। শঙ্করদা বলেছে, তোরা কাঠের বল আর দিশি ব্যাটে অনেক বড় খেলোয়াড় হবি। শরীরটাকে আগে ভাল করে পেটা। লোহা তৈরি কর। লোহা। শঙ্কর যা বলে, এরা তাই শোনে। শুধু শোনে না, প্রত্যেকে ভালভাবে গড়ে উঠছে।

শঙ্কর যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন মনে হয় রাস্তার দু'ধারে আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। এ-পাড়ার প্রতিটি মানুষ তাকে ভীষণ ভালবাসে, কারণ শঙ্কর সকলের। শঙ্করের সেই শিক্ষকমহাশয় অনেকদিন আগে শঙ্করকে বলেছিলেন, 'দেখ শঙ্কর, ভাগ্য কাকে বলে জান?'

'গ্রহ।'

'না, গ্রহ যাদের ভাগ্য, তারা হল দুর্বল, স্বার্থপর। একটা জিনিস চিরকালের জন্যে জেনে রাখ, সবলের জন্যে গ্রহ, নক্ষত্র, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, পাথর নয়। তুমি আর তোমার পৃথিবী। মাঝখানে কেউ নেই, মাথার ওপরেও কেউ নেই। এই পৃথিবীর সঙ্গে যে-সম্পর্ক তুমি গড়ে তুলবে সেইটাই তোমার ভাগ্য। পৃথিবীর সঙ্গে যদি ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পার, তাহলেই তুমি সফল মানুষ। কৃতী পুরুষ। পৃথিবী মানে শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু, প্রকৃতি। আর পৃথিবীর সঙ্গে যদি তোমার ঘৃণার সম্পর্ক হয়, তাহলে অন্যভাবে তুমি যত সফলই হও, পৃথিবী তোমার কাছে

আর স্বর্গ থাকে না, হয়ে যাবে নরক।' শিক্ষকমহাশয় বারে বারে ইংরেজি করে বলেছিলেন, 'ইউ অ্যান্ড ইওর ওয়ার্লর্ড।

শঙ্কর সেই শিক্ষাটিই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে হয়েছে। এখন স্বভাবে এসে গেছে। এখন সে চেষ্টা না করেও ভালবাসতে পারে। কোনও কারণ ছাড়াই আনন্দে থাকতে পারে, আনন্দ বিলোতে পারে। শঙ্কর যে বাজারে বাজার করে সেই বাজারের বাইরে চাষীরা এসে বসে। তারা কিছু সস্তায় আনাজপাতি দেয়। শঙ্কর তাই অকারণে ভেতরের বাজারে ঢোকে ন। ভেতরে সব পয়সাওলা লোকের তাণ্ডব। কেউ অসময়ের কপি কিনছে, কেউ কিনছে টোম্যাটো। কারোর আবার বিট-গাজর না হলে চলে না। বইয়ে পড়েছে, বিট-গাজরে হেলথ ভাল হয়, আর যায় কোথায়। পুলিশের আস্তাবলে ঘোড়া গাজর খাচ্ছে, এদিকে গুপীবাবুও খাবার টেবিলে বসে গাজরের স্যুপ খাচ্ছেন। মুখ-চোখ দেখলে করুণা হয়, মনে হয় সতীদাহর বদলে পতি-দাহ হচ্ছে।

শঙ্কর দূর থেকে দেখলে, ফুলের দোকানের সামনে বেশ যেন একটা গণ্ডগোল মতো হচ্ছে। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। শঙ্কর দোকানটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল, গোলমালটা হচ্ছে আরতির সঙ্গে। ফুলওলার গলাই বেশি কানে আসছে। শঙ্কর প্রথমে ভেবেছিল নাক গলাবে না। মেয়েদের ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতে চায় না। কখন কি হয়ে যায়! মন নয় তো মতিভ্রম।'কোনওভাবে একবার খপ্পরে পড়ে গেলেই সংসার। তখন কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব। মেয়েরা মানুষের সত্তা হরণ করে। নাকে দড়ি বেঁধে সংসারের ঘানিতে জুতে দেয়। এত ভেবেও শঙ্কর না এগিয়ে পারল না। পাশ থেকে সে আরতির মুখটা দেখতে পেল। ধারালো, অভিজাত একটি মুখ। টিকলো নাক। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা রেশমের মতো চুল। আরতিকে বাইরের আলোয় আরও ফর্সা দেখায়। টান টান পাতলা দেহত্বের ভেতর থেকে রক্তের আভা বেরিয়ে আসে। সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে দীর্ঘকায়। শরীরের কোথাও অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। শঙ্করের মনে হচ্ছিল, সে যেন শাড়ি পরা একটা জিপসী মেয়েকে পাশ থেকে দেখছে। মুখে ফুটে আছে অসহায় একটা বিরক্তির ভাব। আরতি কথা বলছে খুবই নিচু স্বরে, ফুলওলা চিৎকার করছে গাঁক গাঁক করে। আরতির বিব্রত আর বিরক্ত মুখ দেখে শঙ্করের খুব করুণা হল। এই শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে শঙ্কর সরে

থাকতেই চায়। অবস্থা থেকে পতন হলেও, আরতিরা ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির মানুষ। বাবা ছিলেন শিল্পপতি। বহুলোক কাজ করত তাঁর কারখানায়। তিনি ডাণ্ডা ঘোরাতেন। দুর্ব্যবহার করতেন। ন্যায্য দাবি থেকে তাদের বঞ্চিত করতেন। আজ জার্মানি, কাল প্যারিস করে বেড়াতেন। বিলিতি সুরার সঙ্গে মোলায়েম চিকেন খেতেন। শ্রমিকের রক্ত শোষণ করতেন।

এই অবধি শুনে চিত্র পরিচালক আর প্রযোজক দু'জনে চিৎকার করে উঠলেন, 'মারো ফ্ল্যাশব্যাক। লোকটাকে তুলুন বিছানা থেকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা চরিত্র বিছানায় শুয়ে থাকলে চলে। স্রেফ শুয়ে শুয়ে আর কোঁত পেড়ে পয়সা নিয়ে যাবে। তা ছাড়া স্টোরির এইজায়গায় একটা অবৈধ প্রণয়ের স্কোপ আছে।'

কথা বলছিলেন প্রযোজক। দশটা কোল্ড স্টোরেজের মালিক। চারটে পশ্চিমবাংলায়। সেখানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত হরিপাল আর তারকেশ্বরের আলু। আলুর একেবারে এক্সপার্ট। কোন আলু কখন পচবে, একবার উঁকি মেরেই বলতে পারেন। এম পি-তে দুটো কোল্ড স্টোর। সেখানে শুধু ডিম। ইউ পি-তে আপেল। একসময় উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা ছিল, শিরা কেটে খানিক রক্ত বের করে দেওয়া। প্রযোজক ভদ্রলোকের তহবিলে কিছু কালো রক্ত জমেছে। সেই রক্ত কিঞ্চিৎ ঝরাবেন। নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে একটু গা ঘষাঘষি করবেন। প্রতিষ্ঠিতরা তেমন পাত্তা দেবেন না। নতুন মুখ আনবেন।

ঠিক তাই। প্রযোজক পরিচালককে বললেন, 'আরতির ক্যারেকটারটা বেশ ফুটছে। আপনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন—আমাদের নতুন বাংলা ছবির জন্যে নতুন নায়িকা চাই। যাঁদের চেহারা জিপসীদের মতো। কোমর সরু, পেছন ভারি, বুক উঁচু, ছবি-সহ আবেদন করুন। ফুল সাইজ। সামনে থেকে, পেছন থেকে, পাশ থেকে।

পরিচালক বললেন, 'তারপর আমি প্যাঁদানি খেয়ে মরি। দমদম সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে লপসি আর ধোলাই দুটাই একসঙ্গে খাই। নতুন মুখ আজকাল আর পেপার পাবলিসিটি দিয়ে হয় না। দিনকাল বিগড়ে গেছে। ট্যালেন্ট সার্চ করতে হয়। বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁয় রোজ দুপুর থেকে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গিয়ে বসে থাকতে হয়। বিশ-তিরিশ হাজার খরচ হয়

হোক, কিন্তু উঠে আসবে একটা নতুন মুখ।'

'আপনার মশাই সবেতেই টাকা ওড়াবার ধান্দা।'

'এই লাইনটাই যে ওড়বার আর ওড়াবার।'

পরিচালক আমাকে বললেন, 'আমার একটা সাজেশান আছে। আপনি ফুলের দোকানের বদলে ওটাকে তরমুজের দোকান করে দিন। আমার একটু সুবিধে হয়।'

'কি আশ্চর্য! আপনার সুবিধে! আরতির আজ একটা ফুলের মালার প্রয়োজন যে। তার বাবার আজ জন্মদিন। তাছাড়া, এটা কি তরমুজের সময়। আম চলে গেছে। আপেল ঢুকছে! আঙুর আসছে। কমলালেবু পাকছে।'

'আপনাকে সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আই সে তরমুজ, অ্যান্ড দেয়ার শুড বি তরমুজ। লাল, লাল অজস্র গোল গোল তরমুজ ডাঁই হয়ে আছে। তরমুজ হল সেক্স-সিম্বল। আমি আমার ক্যামেরার অ্যাঙ্গল থেকে ভাবছি। একটা সাইড থেকে ধরছি। কিছু তরমুজ ফোকাসে, কিছু অফ ফোকাসে। কাঁধকাটা গেঞ্জি-পরা তরমুজওলার চকচকে পুরুষ্ট কাঁধ, বাহু, ঘাড়, গলায় একটা লকেট। চোখ দুটো কমলাভোগের মতো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে প্যান করছে। তরমুজওলার ছাপকা ছাপকা নীল লুঙ্গি। তার আড়ালে স্তম্ভের মতো উরু। কামেরা ঘুরছে, সামনে দাঁড়িপাল্লা, তরমুজ, তরমুজ, আরতির বুক। ক্যামেরা আরতির গা চেটে চেটে উঠছে ওপর দিকে। ঘাড়, গলা, চিবুক, মুখ, চুল, ব্যাকলাইটে সিল্কের কেশরের মতো, চুল বেয়ে আবার নিচে, পিঠ, নিতম্ব, ক্যামেরা ব্যাক করছে, আরতির পুরো শরীর, সামনে তরমুজ, তার ওপাশে তরমুজওলার অশ্লীল মুখ। ক্যামেরা টপে। আরতির ব্রেস্টলাইন, বুকের কাছ মোমপালিশ করা লাল একটা তরমুজ, ফর্সা টুকটুকে হাতে ধরে আছে। শর্ট ডিজলভ। এক গেলাস লাল তরমুজের সরবত নিয়ে আরতি এগিয়ে আসছে, শঙ্কর বসে আছে সোফায়। আরতি স্লো-মোশানে আসছে। তার ম্যাকসি আর চুল বাতাসে উড়ছে। সে স্লো-মোশানে এসে তুলোর মেয়ের মতো শঙ্করের সোফার হাতলে শরীরে শরীর ঠেকিয়ে বসে পড়ল। বাঁ-হাত শঙ্করের কাঁধে, ডান হাতে পাতলা গেলাস। গেলাসে লাল তরমুজের সরবত। এইখানে একটা গানের স্কোপ। গজল টাইপের গান, ফুরোবার আগে পান করে নাও থ্যাতলানো যৌবন। আর

ক'দিনই বা পৃথিবীতে আছি, বলো না আলাদিন। আলাদিন। আলাদিন। এইখানে ইকো লাগাবো। একেবারে ফেটে যাবে। এদিকে গান আর নাচ চলেছে। ওদিক থেকে মরা মাছের মতো তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ দুটো চোখ। ইনভ্যালিড বুড়ো বাপ দেখছে মেয়ের রঙ্গ। শরীর পড়ে গেছে। কথা সরে না মুখে; কিন্তু স্মৃতি আর চেতনা দুটোই কাজ করছে। ফের এগেন ফ্ল্যাশ-ব্যাক। আরতির মা বাতাসে উড়তে উড়তে আসছে, ব্যালে ড্যান্সারের পোশাক পরে। বাংলা ছবিতে ব্যালে আমিই প্রথম চালু করব। আরতির ডবল রোল। একবার মা, একবার মেয়ে। মেয়েকে দেখে বাপের মেয়ের মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এক ঢিলে দু'পাখি। কায়দা করে বুড়োর ললিতা কমপ্লেক্স দেখানো হয়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আর শঙ্করকে দিয়ে অত ভাবিয়েছেন কেন? সিনেমায় ভাবনার কোনও স্কোপ নেই, কেবল অ্যাকসন, অ্যাকসান।'

'সে তো আপনার দিক। আমাকে তো গল্পটা আগে ছাপাতে হবে। সাহিত্যে একটু জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনা, এসব চায়। প্রুস্ত-এর নাম শুনেছেন। সেই ভদ্রলোকের লেখায় শুধুই ভাবনা। ভাবতে ভাবতেই শেষ। আগে আমাকে সাহিত্যের কথা ভাবতে হবে। আপনারা তো প্রথমে আমাকে পাঁচশোটি টাকা ছুঁইয়ে সরে পড়বেন, তারপর তো আপনাদের আর টিকির দেখা পাওয়া যাবে না।'

'ওটা আমাদের লাইনের একটা রীতি। লেখককে বলি দিয়ে আমাদের শুভমহরত হয়। প্রাচীনকালে কি প্রথা ছিল জানেন, ব্রিজ তৈরির সময় নরবলি দেওয়া হত। একটাকে মেরে আরও হাজারটা মৃত্যু ঠেকানো। ব্রিজও বড় কাজ, ফিল্মও বড় কাজ। বিশ, তিরিশ লাখ টাকা গলে যাবে।'

'আপনার বাজেট চল্লিশ, পঞ্চাশ লাখ, আর লেখক বেচারার পাওনা পাঁচশো! কি বিচার মাইরি আপনাদের।'

'না, পাঁচশো নয়। আপনাদেরও তো পয়সার খাঁকতি কম নয়। কচলাকচলি, ধস্তাধস্তি করে সেই হাজার পাঁচেকেই গিয়ে ঠেকে। সেকালের সাহিত্যিক তো আর নেই। তাঁরা সাহিত্যটাই বুঝতেন। আপনারা সাহিত্য বোঝেন না, কেবল বোঝেন টাকা আর পুরস্কার। শেম! শেম! সাহিত্য-সেবা করুন। সরস্বতীর সেবা। লক্ষ্মীর সেবা নয়। তিনপাতা কি লিখলেন তার ঠিক নেই, আধবোতল হুইস্কি উড়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আমি আর একটা জায়গায় সাংঘাতিক রকমের সেক্স, রেপ আর ভায়োলেন্স দেখতে পাচ্ছি। কড়া মশালা। অপুর মা। মধ্যবয়সী এক মহিলা। আট কি ন'বছর বয়সের একটা ছেলের মা। সাবেককালের একতলা একটা বাড়ি। গাঁথনির ইট সব ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে। সেই ইটের ফাঁকে আটকে ঝুলছে সাপের খোলস। তার মানে ভিটেতে বাস্তু সাপ বসে আছে ঘাপটি মেরে। সাপের খোলস দেখলেই গা সিরসির করে। সেই সিরসিরে ভাবটা এস্ট্যাবলিশ করতে হবে। খোলস দুলছে বাতাসে, বাতাসে দুলছে শাড়ি। প্রতীকী ব্যাপার। সাপ এখনও আছে। ছোবল এখনও মারতে পারে। সিনেমার প্রতীকী শট হল, আপনাদের সাহিত্যের ভাবনা। মহিলার ভরাট শরীর, যাকে বলে রাইপ যৌবন। সুন্দরী তো বটেই। ডিসপেপটিক নয়। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক বছর হয়ে গেছে। স্মৃতি ফেডআউট করেছে। শরীর শরীরের ধর্ম পালন করতে চায়। মন আনচান করে। সব শাসন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যত রাত বাড়ে শ্বাস ততই দীর্ঘ হয়। জ্বর নয়, জ্বর-জ্বর লাগে।'

'এ তো আপনার সাহিত্য।'

'সাহিত্য তো বটেই। এক সময় আমিও লিখতুম মশাই। আলুতে আমাকে শেষ করে দিয়েছে।'

'সাহিত্য পর্দায় আসবে কি করে। পেছন থেকে কমেন্ট্রি হবে। ভারি গলায় কোনও শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার পাঠ করে যাবেন, এঁর বলে থার্মোমিটার দিলে জ্বর উঠবে না, কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁর জ্বর-জ্বর লাগে। আড়মোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করে।'

প্রযোজক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে হুইস্কির গন্ধ হালকা হয়ে এসেছে। বুকের কাছে বিলিতি গন্ধ ছুঁড়েছিলেন, সেই গন্ধে শরীরের গন্ধ মিলে, মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার বিচিত্র এক সুবাস তৈরি হয়েছে।

'কি হল মশাই?'

'আপনাকে এখুনি আমি পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স করে যাব; এ স্টোরি আমার চাই।'

'আপনার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ?'

'উঃ, অসাধারণ একটা কথা আপনি বললেন, আমার গায়ে কাঁটা

দিচ্ছে।'

'কি কথা মশাই?'

'ওই যে বগল আর থার্মোমিটার। সুন্দরী এক মহিলা নিজের বগলে নিজে থার্মোমিটার গুঁজছেন। ভাবতে পারেন দৃশ্যটা? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। দৃশ্যটা সামনে করিয়ে এখুনি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

প্রযোজক উত্তেজনায় চেয়ার মিস করে ধুপ করে মেজেতে বসে পড়লেন। সেই অবস্থায় থেকেই বললেন, 'ডিরেক্টার, এই রোলটা কে নেবে? কাকে দেওয়া যায়। সেই যে সেই মহিলা, কি যেন একটা ছবিতে করলেন, বিবাহিতা হয়েও ফটোগ্রাফারের সঙ্গে লড়ালড়ি।'

'বুঝেছি। ভালই হবে।'

'তুমি তা হলে বুক করে ফেল। যত টাকা লাগে। যদ্দিন আমার আলু আছে, তদ্দিন আমার টাকার অভাব নেই। কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'বোম্বাই।'

'তুমি আজই ফ্লাই কর।'

পরিচালক বললেন, 'ফুলটাকে তাহলে তরমুজ করে দিন। আমি একটা বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট ধরনের মারাত্মক শট নিয়ে বাংলার কেন, সারা বিশ্বের চিত্রজগৎকে স্তম্ভিত করে দেব।'

প্রযোজক বললেন, 'তরমুজের বদলে আলু করলে হয় না। আমার খরচ তাহলে কমে।'

'ধুর মশাই, আলুর কোনও গ্ল্যামার নেই। কালার ফিল্মে আলু যায় না। তরমুজ হল ইতালির জিনিস। ইতালি মানে সোফিয়া লোরেন, ব্রিজিৎবার্দো। ডিরেক্টার আমি না আপনি?'

'আমি প্রযোজনা না করলে তোমার পরিচালনা হয় কি করে?'

'আর আমি ভাল ছবি না করে দিলে, আপনার বিদেশ যাওয়া হয় কি করে? আলু করে তো আর ফরেন যাওয়া যায় না।' প্রযোজক একটু দমে গেলেন। ব্রিফকেস খুলে ময়লা ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট বের করে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আলুর আড়তের নোট এর চেয়ে পরিষ্কার হয় না। আপনি বগল আর থার্মোমিটারটা ঠিক করুন। আর একটা জায়গা আপনি কামাল করে দিয়েছেন, সেটা হল সেলাই মেশিন। উঃ, আপনার মাথা মশাই। মাথা না বলে হেড বলাই ভাল।'

'সেলাই মেশিন পেলেন কোথায়?'

'কি আশ্চর্য, এই আপনার হেডের প্রশংসা করলুম। অপুর মা টেলারিং করবে। শঙ্কর জয়েন করবে, এইরকমই তো ঠিক হল।'

'গল্প সেদিকে যায় কি না দেখি। এখনও তো ফুলের দোকানেই আটকে আছে।'

'যায় মানে। যাওয়াতেই হবে। অপুর মা জোরে জোরে সেলাইকল চালাচ্ছে, শঙ্কর ঠিক উল্টোদিকে মেঝেতে বসে আছে। এইখান থেকেই স্টোরিতে শঙ্করের পতনের শুরু। দুটো গোল গোল পা আর ভারি উরু মেশিনের তালে তালে নাচছে। শঙ্করের মনও নাচছে। নামছে, নিচের দিকে নামছে। ক্যাবারে ড্যান্সারের পোশাকের মতো আদর্শ খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে।'

পরিচালক বললেন, 'বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। এই শটেও আমি ফ্র্যাকচার করে দেব। মেশিনের চাকা ঘুরছে, চাকা ঘুরছে। ক্যামেরা ক্লোজ ফোকাসে ঘুরন্ত চাকা ধরছে। চাকা ধীরে ধীরে নেমে আসছে, আর সেই চাকার ভেতর দিয়ে টাইট-ফোকাসে দু-জোড়া পা, মেঝেতে জড়াজড়ি, ঘষাঘষি, মহিলার কলাগাছের কাণ্ডের মতো পায়ের অনেকটা ওপরে শাড়ির কালো ফিতে পাড়। একটা হাত, মাথার পাশে মাথা, আর একটা হাত, একটা বড় কাঁচি, ক্লোজআপে।'

প্রযোজক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দাও। কাঁচিটাকে আরও ক্লোজ-আপে নিয়ে এস। উল্টোদিকের দরজাটা অল্প ফাঁক হল। একটি কিশোরের মুখ। বড় বড় চোখ। চোখ ভরা বিস্ময়। ছেলেটি আততায়ীর মতো ঢুকছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে কাঁচিটার দিকে। নিচু হয়ে তুলে নিল কাঁচিটা। তারপর ক্যামেরার ভিসানে একটা তালগোল পাকানো দৃশ্য। একটা হাত উঠল। একটা কাঁচি। ভীষণ একটা চিৎকার। সেলাই মেশিনটা উল্টে পড়ে গেল। শঙ্কর উপুড় হয়ে আছে। তলায় অপুর মা। শঙ্করের পিঠে বড় কাঁচিটার আধখানা ঢুকে আছে। আর রক্তভেজা সেই পিঠে মুখ গুঁজে অপু হাপুস কাঁদছে আর বলছে, শঙ্করদা, শঙ্করদা তুমি আমার শঙ্করদা। আর শঙ্কর ওই অবস্থায় ফ্যাঁসফেসে গলায় বলছে, অপু, তুই ঠিক করেছিস, তুই ঠিক করেছিস, তোকে কেউ বুঝবে না, তুই পালা। তুই সোজা পালিয়ে যা। তা না হলে তোকে পুলিশে ধরবে। অপু উঠে

দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে তাকাল এদিকে, ওদিকে। তারপর হঠাৎ দু'হাতে দরজাটা ঠেলে খুলে, পাগলের মতো ছুটতে লাগল, আর চিৎকার, 'আমি খুন করেছি, আমি খুন করেছি।'

পরিচালক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দিন। লম্বা, সোজা রাস্তা ধরে অপু ছুটছে, ছুটতে ছুটতে অপু হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। বিশাল একটা লরি আসছিল স্পিডে। চাকার সামনে অপুর মাথা। ব্রেক। স্ক্রী-ই-ই-চ শব্দ। অপুর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা। পাশে হাত রাখল। মা নেই। অপু বোঝার চেষ্টা করছে।'

প্রযোজক বললেন, 'আগের শটটাকে স্বপ্ন করে দিলে?'

'তা কি করব! মাঝ রাস্তায় হিরোকে মেরে দেব। তাহলে বই তো মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। চুপ করে শুনুন। এইবার রিয়েল খেল। অপুর কানে একটা শব্দ আসছে। যেন কোথাও দুটো সাপ ফোঁস ফোঁস করছে। অপু বিছানায় উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। একটা মাত্র জানালা খোলা। সেই খোলা জানালায় রাতের আকাশ। দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁদছে। অপু বসে আছে চুপ করে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা এখনও কানে আসছে। ক্যামেরা একবার বাড়িটার বাইরে ঘুরে গেল। জনপদ নিদ্রিত। অনেক উঁচু একটা বাড়ির সর্বোচ্চ তলের একটি ঘরে, জোরালো আলো। একটা মানুষের সিল্যুয়েট। অপুদের বাড়ির ইটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা হিলহিলে সেই সাপের খোলসটা বাতাসে দুলছে। পাশের বাড়ির টিভির অ্যান্টেনায় প্রায় টাটকা একটা ঘুড়ি বাতাসে বনবন ঘুরছে। তার পাশেই একটা বাড়ির কবজা ভাঙা জানালার পাল্লা যেন ভূতে দোলাচ্ছে। ক্যামেরা আবার ফিরে এল ঘরে। অপু বসে আছে মশারির ভেতরে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ। অপু মশারি তুলে নেমে এল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। খোলার চেষ্টা করল। বাইরে থেকে বন্ধ। তিন-চারবার টানাটানি করল। অপু কাঁদো কাঁদো গলায় ডাকল—মা, ওমা, তুমি কোথায়। অপু বন্ধ দরজার সামনে বসে পড়ল। ফোঁস ফোঁস শব্দটা থেমে গেল। ক্যামেরা চলে এল ঘরের বাইরে। অন্ধকার প্যাসেজে দানবের মতো একটা লোক অপুর মাকে ভাল্লুকের মতো জড়িয়ে ধরে আছে। অপুর মা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়াবার, ছাড়ুন, ছাড়ুন, ছেলেটা উঠে পড়েছে। লোকটা জড়ানো গলায় বলছে, শালাকে একদিন গলা টিপে শেষ

করে দোবো, শয়তানের বাচ্চা। তোমাকে আমি এখন ছাড়তে পারব না। অপুর মা লোকটাকে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে। লোকটা বলছে, তোমাকে আমি দোকান করার জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দোবো অমনি অমনি। তুমিও মাল ছাড় আমিও মাল ছাড়ি। অপুর মা লোকটাকে কামড়ে দিল। লোকটা নেশার ঘোরে অপুর মায়ের গলাটা দু-হাতে চেপে ধরল। অপুর মা একটা শব্দ করল। অপু দরজা ঝাঁকাচ্ছে। চিৎকার করছে। লোকটা অন্ধকারে রাস্তায় নামল। টলতে টলতে এঁকে-বেঁকে চলেছে। তিনটে বাড়ি পরে, রকে একটা লোক শুয়েছিল। সে মাথার চাদর সরিয়ে লোকটাকে দেখে নিল। কানে আসছে কিশোরের গলার মা, মা ডাক। দরজা ঝাঁকাবার শব্দ। শব্দের পর শব্দ। দরজা, জানালা খোলার শব্দ। সারা পাড়া জেগে উঠেছে। অপুদের বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেছে। তিনটি সাহসী ছেলে ভেতরে ঢুকছে। ক্যামেরা ফলো করছে। তিনধাপ সিঁড়ি। দালান। একজনের পায়ে লেগে একটা বোতল ছিটকে চলে গেল। সে বলে উঠল শালা। সে আরও দু-ধাপ এগিয়ে কিসে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে পড়েই সে চিৎকার করতে লাগল, মার্ডার, মার্ডার। যে দু'জন পেছনে ছিল, তারা ওরে বাব্বারে বলে ছুটে বাইরে চলে গেল। অপু সমানে মা, মা করে যাচ্ছে। কাট। পুলিশের জিপ আসছে। শেষ রাত। তিন-চারজন লাফিয়ে নেমে পড়ল। টর্চের আলো। সকলে ঢুকে গেল ভেতরে। ক্যামেরা অনুসরণ করছে। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল অপুর মায়ের মুখে। মহিলাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। কিছু দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল। পড়ে আছে একটা গ্যাস-লাইটার। দালানের আলোটা জ্বালা হয়েছে। সঙ্গে আছে টর্চের আলো। পুলিশ আতিপাতি করে জায়গাটা খুঁজছে। পড়ে আছে সিগারেটের টুকরো। একটা মিনিবাসের টিকিট। দলাপাকানো একটা রুমাল। নতুন, বড় একটা মোমবাতি। অপুর মায়ের হাতের মুঠোয় কয়েক গাছা চুল। পুলিশের অফিসার লাশ তুললেন না। খড়ির গুঁড়ো ছড়িয়ে গোটা জায়গাটা বেষ্টন করে দিলেন। একজন পাহারায় রইল। অফিসার জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ বাড়িতে আর কে আছে?'

'এর একটা ছোট ছেলে আছে স্যার, ওই ঘরে পুরে বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে।' 'চাবি না স্যার, ছিটকিনি।' ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে

দরজায়। সাবেককালের দরজা। বাঘের মুখ কোঁদা। রঙ চটে গেলেও বোঝাই যায়, ভীষণ পোক্ত। একটা জায়গায় খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লেখা, অপু। দরজা খোলা হল। ক্যামেরা পুলিশের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে নজর করল। জানালা দিয়ে ভোরের আলো আসছে। ফুলের মতো একটি কিশোর মেঝেতে বসে আছে হামাগুড়ি দিয়ে। কাট। পুলিশ পেরিয়ে আসছে। তাদের মাঝখানে অপু। বাইরে অনেক লোক। তার মাঝে একটা দাড়ি-গোঁফ-অলা শক্ত-সমর্থ পাগল। সে হা হা করে হাসছে, তালি বাজাচ্ছে, আর বলছে, 'কে করেছে খুনখারাবি, সবই আমি বলতে পারি, কে করেছে খুনখারাবি।' সবাই তাকে দূর দূর করছে—'বেরো ব্যাটা পঞ্চা পাগলা!' পাগল ছাড়া বাংলা ছবি জমে না। মনে আছে, সেই পাগল ধীরাজ ভট্টাচার্য, আই ক্যান ফোরটেল ইওর ফিউচার। কি অসাধারণ অভিনয়! এক পাগলেই পয়সা উসুল।'

আমি সেই ময়লা ময়লা একশো টাকার নোট পাঁচটা বের করে প্রযোজক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললুম, 'এই নিন আপনারা দু'জনে হাফাহাফি ভাগ করে নিন, স্টোরি তো আপনারাই করে ফেলেছেন।'

'আহা! রাগ করছেন কেন, একেই বলে তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। আপনাদের ওরিজিন্যাল স্টোরির তো শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাই হয়, মলাট আর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে পর্দার গায়ে একটা নাম, এই তো শেষ পরিণতি। ফিল্ম সাহিত্য নয়, ফিল্ম হল ইন্ডাস্ট্রি। পয়সা ঢালেগা, পয়সা তোলেগা। আপনাদের সাহিত্য হল অক্ষর সাজাবেন আর নাম কিনবেন। মবলগ যা পাচ্ছেন পকেটে ভরে ফেলুন, কাজে লেগে যান। বাকিটা আমরা ফ্ল্যাশব্যাক করে ড্রিমে সেক্স ভরে নামিয়ে দেব। লিখতে বসার সময় স্লাইট একটু ঢুকু করে নেবেন, দেখবেন অটোমেটিক মাল বেরিয়ে আসবে। পেটে ডিজেল না ঢুকলে লেখার অটোমোবিল চলবে কিসে!'

দুই মাল বেরিয়ে গেলেন। আমি পয়মাল বসে রইলুম হাঁ করে। ফলের দোকানের সামনে আমার শঙ্কর আর আরতি দাঁড়িয়ে। আমার স্বর্গীয় কিশোর অপু এইবার স্কুলে যাবে। তার মা পরিষ্কার সাদা হাফ প্যান্টের ভেতর গুঁজে দিচ্ছে সাদা জামা। অমন দেবীর মতো মায়ের দিকে আমি আর ভালভাবে তাকাতে পারছি না। বিশ্রী একটা পাপবোধ আসছে।

সত্যিই কি শঙ্করকে তিনি দেহের ফাঁদে ফেলবেন? রতন হালদারের পক্ষে অবশ্য সবই সম্ভব। পৃথিবীতে বেশ কিছু গাছ আর প্রাণী আছে, যারা অকারণে গরল ছড়ায়। অনেক বিকল্প খাদ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিরীহ মুরগির পালক ছাড়ায় চড় চড় করে। নিজের সুন্দরী স্ত্রী ফেলে বেশ্যালয়ে গিয়ে ধুমসো মেয়েছেলের গোদা পায়ের লাথি খায় পয়সা খরচ করে। এই যেমন করণাসক্ত, ব্যবসাদার দু'জন, আমার চোখ দুটো ঘোলা করে দিয়ে গেল। যেন আমার জন্ডিস হয়ে গেল। শঙ্কর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাশ্রিত। পরোপকারী। প্রকৃতিপ্রেমী। বিশ্বপ্রেমী। যার জীবনের আদর্শই হল নিঃস্বার্থ সেবা, তাকে কেমন করে আমি অপুর মায়ের পায়ের সামনে বসাই। লোক দুটো কি সাংঘাতিক বদ! কি বিশ্রী রুচি-বিকৃতি নিয়ে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেশিনের সামনে আমার শঙ্করের মতো ছেলেকে বসতে হবে। সে বসে বসে দেখবে, দুটো পৃথুল পা নাচছে। আমিও এক মহাপাপী। যে বই আমার পড়া উচিত নয়, সাইকোলজি, সেই বই পড়ে জেনেছি, সেলাই মেশিনে পা দিয়ে চালাতে চালাতে, মেয়েদের এক ধরনের দৈহিক উত্তেজনা হয়, তখন তাদের পা আরও দ্রুত চলতে থাকে। যে কারণে মেয়েদের পা-মেশিন চালানো বারণ। শঙ্করকে বসে বসে এই দৃশ্য দেখতে হবে। দেখতে দেখতে উত্তেজিত হতে হবে। তার উচ্চ মানস-ভূমি থেকে ধপাস করে পড়ে যেতে হবে। এক ভদ্রমহিলা খোলা গায়ে বগলে থার্মোমিটার লাগাচ্ছেন। সেখানেও সেক্স। এরপর কোনও মহিলা দাঁতে টুথব্রাশ ঘষছেন, সেখানেও সেক্স। দেখার কি দৃষ্টি। আমার নিজেরই ভয় লাগছে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে।

শঙ্কর এগিয়ে গেল ভিড় সরিয়ে। ঝগড়া শুনতে অথবা মিটমাট করতে নয়, ভিড় জমেছে আরতিকে দেখতে। এমন রূপসী মেয়ে এ-তল্লাটে নেই। এই লোকগুলোকেই বা আমি কি বলব। সব বয়সেরই মানুষ আছে! আরতিকে চোখ দিয়ে গিলছে। কেউ চোখ দিয়ে কোমর ধরেছে, কেউ ধরেছে নিতম্ব, কেউ চেষ্টা করছে বুকটাকে ভাল করে দেখার, যেন কার্ডিয়োলজিস্ট। কেউ তার ফুরফুরে ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, বাদামি চুলের দিক থেকে নজর সরাতে পারছে না।

ফুলওলা শঙ্করের পরিচিত। খুবই পরিচিত। একসময় দু'জনে জুভিনাইল ক্লাবে ফুটবল খেলত। শঙ্করকে সামনে দেখে ছেলেটা একটু

থতমত খেয়ে গেল। শঙ্কর বললে, 'এ-সব কি হচ্ছে, মানিক? জানিস, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'মাইরি বলছি শঙ্করদা, আমি দু'টাকা ফেরত দিয়েছি। মাইরি বলছি।'

আরতি তেজালো গলায় বললে, 'দু-টাকা ফেরত দিলে, টাকা দুটো আমার হাতেই থাকত। টাকা দুটো নিশ্চয় আমি গিলে ফেলিনি! সব কেনার পর আমার হাতে শেষ একটা পাঁচটাকার নোট ছিল। মালার দাম তিন টাকা। দুটো টাকা গেল কোথায়।'

শঙ্কর বললে, 'মানিক তোর ভুল হচ্ছে। এইরকম ভুল হতেই পারে। তোমাকে ঠকিয়ে দুটো টাকা নেবার মতো মহিলা ইনি নন।'

'ভুল তো ওনারও হতে পারে।'

'হলে টাকাটা ওঁর হাতেই থাকত; কারণ ওঁর বুক পকেট নেই।'

কথা বলতে বলতে শঙ্করের নজর চলে গেল ছোট একটা বালতির দিকে। ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বালতি। সেই বালতিতে রয়েছে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল। সেই ফুলগুলোর পাশে, জলে একটা কি ভাসছে। শঙ্কর বললে, 'ওটা কি?' তারপর আরতির পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিজেই তুললে। আধভেজা একটা দু'টাকার নোট।

'মানিক এটা কি? দেখেছিস, কিভাবে ভুল বোঝাবুঝি হয়। টাকাটা এখানে পড়ে গেছে। তোর দেখা উচিত ছিল। তা না করে তুই সমানে গলাবাজি করে যাচ্ছিস।'

মানিক হাত জোড় করে বলল, 'দিদি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

'আপনি আমাকে অনেক যা-তা কথা বলেছেন। শঙ্করদা এসে না পড়লে আপনি এই এতগুলো মানুষের সামনে জোচ্চর প্রমাণ করে ছাড়তেন। আমার টাকা আর মানসম্মান দুটোই যেত।'

'এই দেখুন দিদি, আমি কান মলছি। ব্যবসাদার জাতটাই বহত...।'

শঙ্কর বললে, 'মানিক, আর না।'

আর একটু হলেই মানিকের মুখ ফসকে একটা গালাগাল বেরিয়ে আসত।

শঙ্কর বললে, 'যান, এবার আপনি সোজা বাড়ি চলে যান।'

আরতির ভেতর সুন্দর একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে। যখন হাসে,

গালে একটা টোল পড়ে। ভুরুর কাছটা, ঠিক নাকের ওপরের জায়গায় অদ্ভুত একটা ভাঁজ পড়ে। যার কোনও তুলনা হয় না। আরতির এই হাসি দেখলে শঙ্কর অবশ হয়ে পড়ে। তার মনে একসঙ্গে অনেক দরজা খুলে যায়। অনেক আলো জ্বলে ওঠে। নানা রঙের কাঁচ বসানো জানালায় রোদ পড়লে যে বর্ণসুষমা হয়, তার মনেও সেইরকম একটা রঙ খেলা করে। সুন্দরী কোনও নর্তকী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে থাকে। ভীষণ একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে ভেতরে। এক মন বলে, ছিঃ ছিঃ,আর এক মন বলতে থাকে, এটাই তো স্বাভাবিক! শঙ্কর যখন নোট তোলার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল তখন আরতির অনাবৃত কোমরে হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। মসৃণ, ভিজেভিজে। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। সেই অনুভূতিটা শঙ্কর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

আরতি সেই অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, 'আপনি যাবেন না?'

'আমার তো সবে শুরু হল।'

'আমি যদি আপনার সঙ্গে থাকি, তাহ্লে রাগ করবেন?'

'আমাকে কোনও দিন রাগতে দেখেছেন! আপনার কষ্ট হবে।'

'আমাকে তুমি বলতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে?

শঙ্কর হেসে ফেলেল। তার মনে হচ্ছে, নেশা হয়ে গেছে। কিছু আর ভাবতে পারছে না। শীতের সকালে স্নান করে রোদে দাঁড়ালে যে-রকম একটা সুখ সুখ ভাব হয়, সেইরকম একটা সুখ-বোধ হচ্ছে। শঙ্কর আর আপত্তি করতে পারল না। আরতিকে পাশে নিয়ে চাষীরা যেদিকে বসে সেদিকে যেতে যেতে বললে, 'চলো তোমাকে সস্তার বাজারটা চিনিয়ে দি। দাম কম, টাটকা জিনিস।'

'আমার না অনেক অনেক বাজার করতে ইচ্ছে করে একসঙ্গে। ব্যাগ ভর্তি, ঝুড়ি ভর্তি বাজার।'

'আমারও করে, তবে আমার বাজেট সাত টাকা। বেশ ভালই বাবা, বেশি বাজার মানে বেশি বোঝা।'

'আমার বাজেট মাত্র পাঁচ টাকা, তবে আমি একসঙ্গে তিনদিনের বাজার করি।'

'তোমার বেঁচে থাকতে কেমন লাগে, আরতি?'

'যখন আমাদের অনেক কিছু ছিল, তখন খুব একঘেয়ে লাগত; এখন

কিন্তু বেশ উত্তেজনা পাই। এই মনে হচ্ছে, বাবার কি হবে! বাবার কিছু হলে আমার কি হবে। আজ গেলে কাল কি হবে, এই ফুরিয়ে গেল কেরোসিন তেল, কে লাইন দেবে। কে যাবে ব্যাঙ্কে ইন্টারেস্ট তুলতে। আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের আবার অনেকদিনের পুরনো একটা মামলা আছে। তার জন্যে প্রায়ই উকিলের বাড়ি ছুটতে হয়। মামলাটা বেশ মজার। আমাদের ছোট্ট একটা বাগানবাড়ি আছে বারাসতে। সেই বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন বাবার এক বন্ধু। তিনি বাবার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাড়িটার দখল ছাড়ছেন না। আমি কেস ঠুকে দিয়েছি। কেসটা যদি জিততে পারি তাহলে আমাদের কষ্ট অনেকটা কমবে। যেভাবে আছি সে ভাবে থাকা যায় না। তারপর ওই রতন হালদার। লোকটা এগজিবিশানিস্ট।'

'সে আবার কি?'

'সে আপনাকে আমি মুখে বলতে পারব না। যেদিন ধরে জুতোপেটা করব সেদিন বুঝতে পারবে। আচ্ছা, আপনি আমাকে দেখলে অমন মুখ ফিরিয়ে নিতেন কেন? কথা বললে হুঁ-হাঁ করে পালিয়ে যেতেন?'

'সত্যি কথা বলব, আমার মধ্যে একটু ভণ্ডামি আছে, পাকামিও বলতে পার। বেকার মানুষ তো, তাই কাজের কাজ না পেয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখি। সন্ন্যাসী হব, বিরাট সমাজসেবক হব, বন্যাত্রাণে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়বো, দণ্ড-কমণ্ডলু নিয়ে চলে যাব কৈলাস। এই সব মাথায় ঢোকার ফলে মেয়েদের ভীষণ ভয় পাই। যদি কোনওভাবে আটকে যাই। নিজের খাবার যোগাড় নেই, তার ওপর সংসার!'

'মেয়েরা কি পুরুষ-জীবনের বাধা?'

'সংসার জীবনের নয়, সন্ন্যাসজীবনের বাধা তো বটেই!'

'সন্ন্যাসী কেন হবেন? সংসারে কোনও কাজ নেই। এই যে আপনি এক গাদা বাচ্চাকে মানুষ করছেন, সারা পাড়াটাকে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছেন, এটা কাজ নয়?'

'কি বলব বল? আমার ভাল লাগে। এখন ধর, আমি যদি সেজেগুজে পক্ষীরাজ মার্কা হয়ে হয়ে প্রেম করি, আমার এই মনটা হারিয়ে যাবে। আর একটা সত্যকথা বলব, রাগ করবে না, বল?'

'নির্ভয়ে বলুন।'

'তোমাকে আমি ভয় পাই। তুমি এত সুন্দরী, আর তোমার এমন সুন্দর ভাব, তোমাকে দেখলেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ভালবাসতে।'

আরতি শঙ্করের হাতটা মুঠোয় ধরেই ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আমিও আপনাকে ভীষণ ভালবাসি আপনার গুণের জন্যে।'

কথায় কথায় বাজার হয়ে গেল। শঙ্কর আজ আর তার সাত টাকার সীমার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ছিটকে বেরিয়ে গেল। অনেক দিন পরে বাজারে শোলাকচু এসেছে। শঙ্করের ভীষণ প্রিয়। ছাঁকা তেলে শোলাকচু ঝুরো করে কেটে ভাজলে ফুলে উঠে যা অসাধারণ স্বাদ হয়!

শঙ্কর বললে, 'তুমি তো একা! তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক কিছু রাঁধতে পার না। আমার মা আছে, আমার বোন আছে। ভীষণ ভাল রাঁধেন আমার মা! তোমাকে আজ আমি দুটো রান্না খাওয়াব। খাবে তো!'

'নিশ্চয় খাব। তাহলে আজ আমি বাবার স্যুপটা করব, আর কিছু করব না। আমার তৈরি স্যুপ খুব একটা খারাপ হয় না। আপনি একটু টেস্ট করবেন?'

'না গো! আমি তো একা কিছু খেতে পারি না। সকলকে দিতে গেলে তুমি কুলোতে পারবে না। আর একদিন হবে।'

দু'জনে বাড়ি ফিরে এসে অবাক। আরতিদের ঘরের সামনে ছোটখাট একটা জমায়েত। শঙ্করের মা ঘরের ভেতরে। শ্যামলী বাইরে যাবার জামাকাপড় পরেও বেরোতে পারেনি। আরতিদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে। শঙ্কর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মা?'

'ঘরে একটা শব্দ হল। এই তোরা আসার এক মুহূর্ত আগে। ছুটে এসে দেখি এই ব্যাপার।'

করুণাকেতন পড়ে আছেন মেঝেতে। চিৎ হয়ে। চোখ দুটো উর্ধ্বে স্থির। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ। আরতি রোজ সকালে সাতটার মধ্যে বাবাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেয়। এক মাথা পাকা চুল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে, পাউডার ছড়িয়ে, সামনে সিঁথি করে আঁচড়ে দেয়। একদিন অন্তর আরতি নিজেই সুন্দর করে দাড়ি কামিয়ে দেয়। আজ ছিল দাড়ি

কামাবার দিন। ফর্সা দুটো গাল চকচক করছে। করুণাকেতনের ঠোঁটের পাশ দিয়ে জলের মতো একটু কিছু গড়িয়েছে।

শঙ্কর করুণাকেতনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বুকে কান পাতল। তারপর ডানহাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে ধরল। একসময় হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল। মুখ তুলে তাকাল। প্রথমেই চোখে পড়ল আরতির মুখ। অসাধারণ দুটো চোখ। একেই বলে কাজললতা চোখ। দুটো অপরাজিতা ফুলের পাপড়ি। শঙ্কর এমন চোখ কখনও দেখেনি। এমন নাক সে দেখেনি। যেন অ্যালফ্যানসো আমের আঁটি স্টেনসিলর্কটার দিয়ে কেটে তৈরি করেছেন ভগবান স্বয়ং।

শঙ্কর হাঁটু ভাঙা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল। বুঝিয়ে দিল, করুণাকেতন চলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরতি শঙ্করের চওড়া বুকে মাথা গুঁজে দিল। শঙ্করের মা এগিয়ে এসে আরতির মাথার পেছন হাত রেখে অঝোরে কাঁদত লাগলেন। শঙ্করের একটা হাত আরতির কাঁধে। আর একটা হাত মায়ের পিঠে। তার দু'হাতে দু'রকমের অনুভূতি।

করুণাকেতনকে ধরে বিছানায় তোলা হল। ভদ্রলোক পড়ে যাবার সময় বিছানার চাদরটা খামচে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। খাটের ধারে একটা বেড়া ছিল, দু'পাশে দুটে ছিটকিনি দিয়ে আটকান যায়। সেই বেড়াটা কি করে খুলে গেল কে জানে। আরতি জন্মদিনের মালাটা মৃত্যুদিনের মালা করে বাবার বুকে পেতে দিল। আরতি খুব শক্ত মেয়ে। ভেতরে ভাঙলেও বাইরে ভাঙেনি। তার চেহারা যেন ধারালো, মন আর চরিত্রও সেইরকম ধারালো। শঙ্করের মা আর বোন যতটা ভেঙেছে আরতি ততটা বিচলিত হয়নি। সে জানে আজ থেকে সে সম্পূর্ণ একা।

শঙ্কর পথে নেমে এল। তার শিশুবাহিনী স্কুলে। পাশে কেউ না থাকলে শঙ্কর তেমন জোর পায় না। বড় কেউ হলে চলবে না। ছোটরাই তার শক্তি। তাদের সঙ্গে বকবক করতে করতেই সে পথ খুঁজে পায়। শঙ্কর তার পরিচিত ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। করুণাকেতনকে যে ডাক্তারবাবু দেখতেন, তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্যে ফরেনে গেছেন।

করুণাকেতন যখন ঘরে ফেরার জন্যে পথে নামলেন, তখন দিন শেষ হয়ে এসেছে। শঙ্করের শিশুবাহিনী এসে গেছে। মানী লোকের

যেভাবে যাওয়া উচিত শঙ্কর ঠিক সেইভাবেই ব্যবস্থা করেছে। ফুলে ফুলে সাজানো পালঙ্ক। শিশুবাহিনীকে সে এখন থেকেই মানুষের যাওয়াটা দেখাতে চায়। যাওয়ার পথ চেনা থাকলে হাঁটতে অসুবিধে হয় না। অপু ফিসফিস করে বললে, 'তুমি যে বলেছিলে বড়লোকের কোনও সাহায্যে লাগবে না, তাহলে?'

'এরা বড়লোক নয়, মানীলোক, জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী। জিনিসটা বুঝতে শেখ। আর একমাস পরে তোর গোঁফ বেরোবে গবেট।'

অপুর হাতে খইয়ের ঠোঙা। অপু এই প্রথম শ্মশানে চলেছে। শ্যামল একবার ঘুরে এসেছে। তিন মাস আগে শ্যামলের বাবা আন্ত্রিকে মারা গেছেন। করুণাকেতন চোখে চশমা পরে, আরামে শুয়ে আছেন। মানুষের শেষ যাত্রাটা বেশ আরামেই হয়। রোগযন্ত্রণা চলে গেছে। এই মহানিদ্রায় যদি মহাস্বপ্ন থাকে, সে স্বপ্ন আর ভেঙে যাবার ভয় নেই। শঙ্করের ডাকে, শঙ্করের সমবয়সী আরও চার-পাঁচজন নেমে এসেছে করুণাকেতনকে কাঁধ দেবার জন্যে। মানুষটির জীবন যখন ধনেজনে ভরপুর ছিল তখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের অভাব ছিল না। ফ্লাশব্যাকে করুণাকেতনের জীবন আমি দেখতে পাচ্ছি। তাঁর ইন্ড্রাস্ট্রি, গাড়িবাড়ি, ঝাড়লণ্ঠন লাগান বিশাল খাওয়ার ঘর, খানা-টেবিল। দিন-রাত, অতিথি-অভ্যাগতের আনাগোনা। সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রী। শিফনের শাড়ি। বিলিতি সুগন্ধ। অনেক রঙিন বেলুনের গুচ্ছ। তারপর সব একে একে ফাটতে শুরু করল। ঝুলে রইল নিজের জীবনের সরু একটি সুতো।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা শঙ্কর। কোমরে কোঁচার গাঁট বেঁধে দিশি একটা ধুতি পরেছে একটু উঁচু করে। তার ওপর সাদা ধবধবে একটা গেঞ্জি। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। এক মাথা রেশমের মতো চুল। ডান কাঁধে লাল একটা গামছা পাট করা। তার ওপরে খাটের একটা দিক। শঙ্করের পাশে আরতি। সামনে, পেছনে শঙ্করের শিশুবাহিনী। কারোর হাতে এক গোছা জ্বলন্ত ধূপ। কেউ ছড়াচ্ছে ফুল। কেউ ছড়াচ্ছে খই আর পয়সা। শবযাত্রা সুগম্ভীর কবিতার মতো এগিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে। যে শাড়ি পরে আরতি সকালে বাজারে গিয়েছিল। সেই শাড়িটাই পরে আছে। আজ আর দুটি পরিবারেই হাঁড়ি চড়েনি। শঙ্কর আজ আরতিকে মায়ের হাতের ঝিঙে-পোস্ত আর শোলাকচু ভাজা খাওয়াতে চেয়েছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস!

প্রতিটি মানুষ এক একটি ঘড়ি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘড়ি চলতে থাকে টিকটিক করে। দমে ক'বছরের পাক মারা আছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আরতি পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগোলেও, মনে মনে সে চলেছে পেছনদিকে। মাকে তার স্পষ্ট মনে আছে। বিচিত্র এক মহিলা। রূপটাই ছিল। গুণ বলে কিছুই ছিল না। ভীষণ অর্থলোভী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দান্ত এক মহিলা। রূপের গর্বে, বাপের বাড়ির ঐশ্বর্যের গর্বে একেবারে মটমট করত। কতদিন সে দেখেছে, বাবা গভীর রাতে, একা একটা আর্মচেয়ারে বাগানের দিকের বারান্দায় অফিসের জামাকাপড় পরেই বসে আছেন চুপচাপ। পাইপের ধোঁয়া আর নিভছে না। সারা বাড়ি তামাকের গন্ধে থমথম করছে। বসার ঘরে সাদা কাঁচের ডোমে একটি মাত্র দুঃখী দুঃখী আলো জ্বলছে। মা কোথায় কেউ জানে না। করুণাকেতনের সেই ছবিটাই লেগে আছে আরতির মনে। নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত একটা মানুষ। বাবার টাকাতেই মা স্ফূর্তি করত। বাবার টাকাতেই হীরের আংটি, নাকছাবি, দুল। করুণাকেতন ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। সত্যেন বোসের সেরা ছাত্র।

শ্মশান-চিতায় শোয়ানো হল করুণাকেতনকে। চেহারার এতকালের রুগ্‌ণভাব কেটে যেন ফুলের মতো ফুটে উঠেছেন। আমি শুধু শঙ্কর আর আরতিকে দেখছি। কে বলবে, এরা একই পরিবারের ভাইবোন নয়। দু'জনেই মাথায় প্রায় সমান সমান। শঙ্করের কিশোরবাহিনীর কিশোররা একটা বেদীতে পাশাপাশি বসে, বড় বড়, নিষ্পাপ চোখে সব দেখছে। দুটো চিতা জ্বলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। একটাতে এক যুবক অন্যটায় একজন মহিলা। মহিলার দশ-বারো বছরের ছেলেটি হাতে একটা বাঁশের টুকরো ধরে উবু হয়ে বসে আছে জ্বলন্ত চিতার অদূরে। এক বৃদ্ধ বারে বারে ছেলেটিকে বলছেন, 'নিমু সরে বোস। চিতা থেকে কাঠ গড়িয়ে পড়লে পুড়ে যাবি।' ছেলেটি সেই কথায় বৃদ্ধের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু সরছে না। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। যেন বরফের দু-ফালি চোখ।

শঙ্করই করুণাকেতনের অনাবৃত দেহ ঘৃত-মার্জনা করল। নিম্নাঙ্গের খণ্ডবস্ত্রটি টেনে নেওয়া হল। এইবার মুখাগ্নি। কাঠের পরে কাঠ। তার ওপর করুণাকেতন। তার ওপর কাঠ। করুণাকেতনের মুখটি কেবল বেরিয়ে আছে। সেই মুখের ঠোঁট দুটিতে আগুন স্পর্শ করাতে হবে। আরতির হাতে ধরা জ্বলন্ত পাটকাঠি কাঁপছে। শঙ্করই মুখাগ্নি করল। আরতি

শঙ্করের কনুইয়ের কাছটা স্পর্শ করে রইল। এইবার চিতার ডান পাশে আগুন ছোঁয়াতেই চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। করুণাকেতনের দেহ কালো হয়ে উঠছে। আগুনের হাহা হাসি কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে। করুণাকেতনের মাথার তলায় জ্বলন্ত কাঠের বালিশ। মুখটা তখনও অবিকৃত। ওই নিটোল, গোল মাথাটিতে কত পরিকল্পনা ছিল, কত আশা ছিল, ছিল সুখের সন্ধান। একটু পরেই ফেটে যাবে ফটাস করে। তিন-চার ঘণ্টা পরে এক মুঠো ছাই। সেই ছাইয়ের নাম করুণাকেতন। কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে রইল, আকাশের তলায় একটা চিমনি। যার মাথাটা আশ্বিনের ঝড়ে মচকে গিয়ে বাতাসে দোল খায়। ভাঙা এক জোড়া গেট। অস্পষ্ট এক্টা নেমপ্লেট। একখণ্ড জংলা জমি। একটা মরচে ধরা বয়লার।

শঙ্কর, আরতি আর তার কিশোরদের নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসল। আরতি এইবার ভাঙতে শুরু করছে। শঙ্করের বুকে মাথা রেখে ভেতরে ভেতরে ফুলছে। সকালে আরতির কোমরে হাত ঘষে যাওয়ায় শঙ্করের ভেতরে একটা বেসুর বেজেছিল। এখনকার এই ঘনিষ্ঠতায় তার কিছুই মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে একই প্রাণ এই দেহে, আর ওই দেহে। এই দেহের নাম শঙ্কর বলে তার ভেতরের আগুন ততটা জ্বলছে না। মৃতুকে মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে। ওই দেহের নাম আরতি, তাই চিতাটা ভেতরেও জ্বলছে। মৃত্যুকে মনে হচ্ছে বিয়োগ, শঙ্করের চিবুকটা ডুবে আছে আরতির চুলে।

অন্ধকার জলধারা সামনে তরতর করছে। ওপারে মিটমিট করছে ঘুমজড়ানো আলোর চোখ। স্লিক স্লিক করে ভেসে যাচ্ছে জেলে ডিঙি। কে একজন চিৎকার করে বললে, জোয়ার আসছে। তিনটে নৌকো সঙ্গে সঙ্গে তীর থেকে সরে গেল মাঝগঙ্গায়। বিশাল একটা জেটি এগিয়ে গেছে জলের দিকে। যেন নদীর বুকে স্টেথিস্কোপ বসাবে।

অপু হঠাৎ বললে, 'শঙ্করদা, ওই ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে না?'

'না রে! ওটা তো দেহ, পুড়ছে। ওতে প্রাণ নেই। তোর জামা-প্যান্ট খুলে পুড়িয়ে দিলে কষ্ট হবে?'

'তাহলে সব কষ্ট প্রাণে?'

'ধরে নে তাই।'

'প্রাণটা কোথায় গেল? প্রাণ কেমন করে আসে, কেমন করে যায়?'

'তোদের ছাদের ঘুলঘুলিতে পাখি কেমন করে আসে, কেমন করে যায়।'

শঙ্কর হঠাৎ তার সুরেলা ভরাট গলায় গেয়ে উঠল, 'এসব পাখি এমনি করে উড়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে। একদিন উড়বে সাধের ময়না।' আরতির মাথা ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। ক্লান্তিতে, মানসিক বিপর্যয়ে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল। আরতির মাথা নেমে এল শঙ্করের কোলে। শঙ্করের নাকে এসে লাগল আগুনের গন্ধ। শঙ্কর আবার গান ধরল। প্রায় শেষ রাতে এক পাত্র ছাই হাতে ফিরে এল শ্মশানযাত্রীরা। শেষ রাতে শ্মশানঘাটে গঙ্গাস্নান। আরতি জীবনে গঙ্গার জলে পা দেয়নি। জলে নামতে ভয় পাচ্ছিল। শঙ্কর বলেছিল, 'আমার কাঁধে হাত রাখ, তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে ধরছি।' আরতির কোমরের কাছটা সাবধানে ধরে পিছল পাড় বেয়ে দু'জনে নেমে গেল জলে। গেরুয়া রঙের গঙ্গার জল। কন্‌কনে শীতল। আরতি প্রথমটা ভয়ে শঙ্করকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন সে ডুবে যাচ্ছে। এইমাত্র এতগুলো মৃত্যু পাশাপাশি দেখেও আরতির প্রাণভয় গেল না। প্রাণভয় কারোরই যেতে চায় না। জলে ভিজে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। স্রোতের টানে খুলে যাচ্ছিল আঁচল। আরতির বুকের কাছে দুলছিল লাল পাথর বসানো একটা হার। শঙ্কর বলেছিল, 'হার সামলে। দেখো, খুলে চলে না যায়।' বলেই তার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা হল বিষয় আর বিষয়ীর। ছোটখাট লাভ-ক্ষতির চিন্তাটাই আগে আসে। শঙ্কর মনে মনে গেয়ে উঠেছিল, শ্যানপাগল বুঁচকি আগল কাজ হবে না অমন হলে। শঙ্কর বাচ্চাগুলোকে আর জলে নামতে দেয়নি। তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। আশ্চর্য, একটা বাচ্চারও ঘুম পায়নি। সব ক'টা সমান উৎসাহে বড়দের সঙ্গে লেগে আছে। ঘটি ঘটি জল এনে চিতায় ঢেলেছে। কেবল সবক'টাকেই একটু বিষণ্ণ আর মনমরা দেখাচ্ছে। শঙ্কর এইটাই চেয়েছিল। শঙ্কর আরতি দু'জনে যখন পাশাপাশি ভিজে কাপড়ে হেঁটে চলেছে তখনই আমার মন বলছিল, এমনিভাবে বাকিটা জীবন তারা পাশাপাশিই হাঁটবে।

পরিচালক ভদ্রলোক এইবার একাই এলেন, 'শুনুন, আলুওলা টাকা দিচ্ছে বলে, তার কথাই বেদবাক্য হবে, এমন ভাববেন না। অর্থ দিয়ে সাহিত্য কেনা যায় না। আর আমি ডিরেক্টার, আমারও একটা ফিউচার

আছে। আপনি শুধু একটা কাজ করুন, করুণাকেতনের চিতাটা আরও একটু পরে নেবান। সূর্যোদয় হয়েছে, চিতায় পড়ল প্রথম জল। হু হু ধোঁয়া। সূর্যের প্রথম আলো। বাচ্চাগুলো হাঁ করে, বিস্ময়-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বগামী ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে। তারপর শঙ্কর আর আরতির রোমান্টিক স্নানের দৃশ্য। সকালের রোদ। গঙ্গার জলে চুরচুর ঢেউ। দিনের প্রথম আলোর সুন্দরী আলেয়া...।'

'আজ্ঞে আলেয়া নয় আরতি।'

'আরে মশাই ওই হল। হোয়াট ইজ ইন এ নেম। আপনাদের বড় উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর নাম পাকা ক্রিমিন্যালদের মতো ছত্রিশবার পাল্টে যায়, মনে রাখতে পারেন না। শেষে নোট দিতে হয়, শঙ্কর ওরফে শোভন, ওরফে বরেন। ওরফে মিলন। আমার কথা হল, সব কাহিনীরই একজন নায়ক, একজন নায়িকা আর এক পিস ভিলেন থাকে। নায়ক শঙ্কর, নায়িকা নিশ্চয় আরতি আর ভিলেন হল গিয়ে ওই রতন হালদার। এখন ভিলেনের কাজ কী? সেটা অবশ্যই মনে আছে? ভিলেনের কাজ হল নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধা দেওয়া। এখন আগেরটা বলি। শিফন পরা নায়িকাকে ভিজিয়েছেন। উত্তম করেছেন। তার আগে নায়কের কোলে শুইয়েছেন, অতি উত্তম। গানের সিকোয়েন্স এনেছেন। বেশ করেছেন। আমার মনের মতো হয়েছে। তবে ওসব ময়না মার্কা গান, একালে অচল। ওখানে একটা মডার্ন লোকসংগীত বসাতে হবে। সে অবশ্য আপনার কাজ নয়। গীতিকার করবেন। কথা হল, রাজকাপুরমশাই জলে-ভেজা নায়িকা পেলে কি করতেন? আপনি অমন একটা সিকোয়েন্স অমাবস্যার অন্ধকারে ফেলে দিলেন। ভিজে কাপড়ে আরতি উঠে আসছে। শঙ্কর তার কোমর ধরে আছে। আরতি উঠছে। সামনে। আরতি হাঁটছে, ক্যামেরা পেছনে। সূর্যের আলো সামনে থেকে চার্জ করছে, সানগান। এদিকে ব্যাকলাইট। শঙ্কর আর আরতি সামনে এগিয়ে চলেছে। আহীর ভাঁয়রোতে একটা গান জাগো, জীবন জাগো, যৌবন জাগো। নার্গিস, রাজকাপুর যেন নতুন করে ফিরে এল। চিত্রজগতের শুরু হল নতুন পুরনো যুগ।'

'শ্মশানে সেক্স? জিনিসটা বড় দৃষ্টিকটু।'

'ধুর্ মশাই। পাবলিক তো এইটাই চায়। তাছাড়া, সমালোচকরা এর ভেতর থেকে কত বড় একটা মিনিং পাবে জানেন! চিতা, মানে জীবনের

শেষ পরিণতি। সেই চিতার সামনে মিলন। সামনে উদিত সূর্য। জীবনের পথ। পেছনে একদল কিশোর। নবজীবন। নবযুগের প্রতীক। তার মানে মৃত্যুর কাছে জীবন জয়ী। উল্টে গেল, কথাটা হবে জীবনের কাছে মৃত্যু পরাজিত। কত বড় ফিলজফি একবার ভাবুন। নেতারা যেমন বলেন, আমিও আপনাকে সেইরকম বলি, আপনাদের হাত শক্ত করার জন্যে আমাদের হাত শক্ত করুন। এরপর আপনি ভিলেনটাকে একটু ফিল্ডে নামান। ভিলেন ছাড়া স্টোরি জমে। কে মশাই পয়সা খরচ করে শুধু চিতা জ্বলা দেখাতে যাবে? একটা জিনিস নতুন এনেছেন, ভালই করেছেন, এগজিবিশানিজম। জিনিসটাকে কায়দা করে কাজে লাগান। আরে মশাই মহাভারতের সেই দৃশ্যটার কথা একবার চিন্তা করুন, ফ্যান্টাস্টিক। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হবে। দুর্যোধন বসে আছে, আরও সব বসে আছে কৌরবপক্ষীয়রা। দুর্যোধন সিল্কের লুঙ্গি তুলে উরু বের করে চাপড় মেরে বলছে, এসো সুন্দরী, এসো, বোসো এইখানে। মাই ডারলিং উঃ, এগজিবিশানিজমের কি অসাধারণ প্রয়োগ। শুনুন মশাই, এ-দেশে অরিজিন্যাল বলে কিছুই নেই, সবই কপি। স্টোরি কপি, মিউজিক কপি, বিজ্ঞাপন কপি। অরিজিন্যাল হয় বিলেতে। আপনি মহাভারত থেকে ঝট্ করে ঝেড়ে দিন। মেয়েটার বাপটাকে মেরেছেন। মেয়েটা এখন ওপেন টু অল। রতন ব্যাটাকে দু' পাত্তর গিলিয়ে ঠেলে দিন মেয়েটার ঘরে। পরনে লুঙ্গি, উদোম গা। মুখে সিগারেট। চেয়ারে গিয়ে বসল। মেয়েটা কিছু বলতে পারছে না। ভদ্র, শিক্ষিতা মেয়ে। রতন হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে এলিয়ে বসে আছে। চোখ নাচাচ্ছে। মিটমিটি হাসছে। মুখে চুকচুক শব্দ করছে। যেন বেড়ালকে ডাকছে দুধ খেতে।'

'কোনও কারণ ছাড়া ঘরে ঢুকে পড়বে? মামার বাড়ি নাকি?'

'ফিল্মের গোটাটাই তো মামাবাড়ি। আমার ওই সিচ্যুয়েসানটা চাই, আপনি এবার মাথা খাটান। সেদিনেই তো বলেছি, তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। মনের কোণে আছে যত দুষ্টুমির বাসা।'

ভদ্রলোক পুকুরে চার ফেলে বিদায় নিলেন। করুণাকেতন যে খাটে এতকাল শুয়েছিলেন সেই খাটটি শূন্য। যেন বিশাল একটি হাহাকারের মতো ঘর জুড়ে পড়ে আছে। ঘরের কোণে ওপাশে একটা প্রদীপ জ্বলছে। আরতি বসে আছে চেয়ারে। সামনে টেবিল। টেবিলে জ্বলছে ল্যাম্প। রাত

প্রায় আটটা-সাড়ে আটটা হবে। প্রদীপটা জ্বেলে রেখে গেছেন শঙ্করের মা। করুণাকেতন যতদিন ছিলেন, শঙ্করের মা বড় একটা আসতেন না। পঙ্গু হয়ে মানুষটি পড়ে থাকলেও তাঁকে ঘিরে ছিল অহঙ্কারের একটা বলয়। সেই কথায় বলে, 'মরা হাতি লাখ টাকা।' এখন শঙ্করের মা অসহায় মেয়েটাকে অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছেন। এমন জীবন তিনি দেখেননি, মৃত্যুর পর একজনও এল না পাশে দাঁড়াতে। আত্মীয়স্বজন অবশ্যই আছে। বড় বংশের ছেলে ছিলেন করুণাকেতন। বড়রা বোধহয় এইরকম নিঃসঙ্গই হয়। শঙ্করের মা সারাদিনে বহুবার এই ঘরে চলে আসেন। এসে খাটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চুপ করে। এই বয়সে মৃত্যুর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা কৌতূহল জন্মায়। কি অদ্ভুত, এই ছিল, এই নেই। শঙ্করের মা আরতিকে মেয়ের মতো গ্রহণ করেছেন।

আরতি আলো জ্বেলে তাকে লেখা বাবার পুরনো চিঠি পড়ছে। আরতি যখন রাজস্থানের স্কুলে পড়ত, সেই সময়কার চিঠি। তখন বাড়ির অবস্থা রমরমা। রাজস্থানের সেই স্কুলে রাইডিং, শ্যুটিং সবই শেখাত। আরতি অতীতে চলে গেছে। এদিকে রতন হালদার গুটিগুটি ঢুকছে। সর্বনাশ করেছে। লুঙ্গি, গেঞ্জি পরেনি অবশ্য। বেশ ভদ্র সাজগোজ। আজ বৃহস্পতিবার। মদ মনে হয় খায়নি। আজ তো ড্রাই-ডে। পা অবশ্য টলছে না। রতন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার কাশল। আরতি চিঠিতে এত বিভোর, শুনতেই পেল না। তখন রতন বললে,

'আসতে পারি দিদি?'

'কে? চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল আরতি। দরজার সামনে এসে রতনকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তবু ভদ্রতা। বললে, 'আসুন, আসুন।'

'দিদি, আমি খারাপ লোক। আমার খুব বদনাম। অশিক্ষিত। ছোট ব্যবসা করি। মাল খাই। বউ পেটাই। আমার ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না। আপনার পিতা মারা গেছেন। আমি মাদ্রাজ গিয়েছিলুম। আজ ফিরেছি। খবরটা শুনে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মতো বয়সে আমিও আমার পিতাকে হারিয়েছিলুম। পিতার মৃত্যু কত দুঃখের, আমি জানি। বাবা তারকেশ্বর আপনাকে ভাল রাখুন। আমি আপনার জন্যে খুব ভাল দোকানের মিষ্টি আর কিছু ফল এনেছি। আর একটা মালা এনেছি, আপনার পিতার ছবিতে পরাবার জন্যে। আমি খুব

শুদ্ধভাবে এনেছি। আজ আমি কোনও নেশাভাঙও করিনি।'

আরতি লক্ষ্য করল, রতন হালদারের চোখে জল এসে গেছে। আরতি অবাক হয়ে গেল।

'যাবো? যদি কেউ কিছু ভাবে?'

'ভাবে, ভাববে। আপনি আসুন।'

জমিদারের ঘরে যে-ভাবে প্রজা ঢোকে, রতন সেই ভাবে ভয়ে ভয়ে, চোরের মতো ঢুকে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল। আরতি বললে, 'ও কি করছেন? চেয়ারে বসুন। চেয়ারে।'

রতন জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসল। মালার প্যাকেটটা আরতির হাতে দিয়ে বললে, 'ছবিতে পরিয়ে দেবেন?'

'আপনি পরিয়ে দিন না।'

'আমি ছবি ছোঁব?'

কেন ছোঁবেন না? ছুঁলে কি হবে?'

'আমাকে সবাই চরিত্রহীন বলে তো। তবে বিশ্বাস করুন, আমার চরিত্রে কোনও দোষ নেই। আমি একটু মদ খাই। সে আমার নিজের রোজগারে খাই। না খেলে আমার জীবনের অনেক দুঃখ ভুলতে পারব না বলে খাই। বঁউকে আমি যেমন পেটাই আমার বউও তেমনি আমাকে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি মারে। কি মুখ! যেন নালা-নর্দমা। আবার কি বলে জানেন, বিয়ের আগে প্রফেসারের সঙ্গে প্রেম করত। কত দুঃখ দেখুন আজও আমাদের কোনও ছেলেপুলে হল না। কি বলে জানেন! আমি মদ খাই বলে হচ্ছে না। তাহলে তো বিলেতে কারোর ছেলেপুলে হত না।'

হঠাৎ রতন হালদার নিজের দু'কান ধরে জিভ কেটে বললে, 'ছিঃ ছিঃ আপনার সামনে এসব আমি কি কথা বলছি! অশিক্ষিত হলে যা হয়।'

রতন হালদার খাটের ওপর বালিশে হেলানো করুণাকেতনের ছবিতে মালা পরিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তারপর চেয়ারে না বসে বললে, 'আমি তেজস্বী মানুষকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। আমি যা শুনেছি, তাতে আপনার পিতাকে ভীষণ তেজস্বী মনে হয়েছে। আপনিও তেজস্বী। আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার হাত ধরেছিলুম। আপনি আমাকে ভুল বুঝে বলেছিলেন, জুতো মারব। আমি তখন ব্যাপারটা বোঝাবার মতো অবস্থায় ছিলুম না। নেশার ঘোরে পড়ে যেতে যেতে

আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার স্ত্রী। বিশ্বাস করুন, আমার ভুল হয়েছিল। আমি নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করি। এ আমার গুরুর নির্দেশ।'

ঠিক এই সময় শঙ্কর ঘরে এসে রতনকে দেখে বললে, 'এ কি, আপনি এখানে?'

আরতি বললে, 'না, না। কোনও ভয় নেই শঙ্করদা। ইনি খুব সুন্দর মানুষ। আমরা সবাই দূর থেকে এতদিনে এঁকে ভুল বুঝে এসেছি। ইনি প্রকৃত ভদ্রলোক। কাছে না এলে মানুষকে ঠিক বোঝা যায় না।'

রতন শঙ্করের দিকে ঘুরে বললে, 'নমস্কার, শঙ্করবাবু। জানি, একটা কারণে আপনি আমার ওপর খুব রেগে আছেন। আপনি আদর্শবাদী, সমাজসেবক, চরিত্রবান, কালীভক্ত, শিক্ষিত, সুন্দর, আপনি সব সব। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এও জানি, আপনি তিন-চারবার পুলিশের কাছে আমার নামে কমপ্লেন করেছেন। আমি তার জন্য আপনার ওপর এতটুকু রাগ করিনি। কেন আমি মদ খাই জানেন? আমার মা, আর আমার ওই লাল পিঁপড়ে-বউটার জন্যে। কি সাংঘাতিক কামড়, আপনি জানেন না! আর একটা জিনিস আপনি জানবেন, মদ খেলেই বউকে পেটাতে ইচ্ছে করবে। তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াল, বউয়ের জন্যে মদ, মদের জন্যে বউকে পেটান। একটা গোলাকার ব্যাপার। আমার কি দোষ বলুন। আমি কি পেটাই? পেটায় আমার পেটের বোতল। জানেন কি আমার কোনও দাম্পত্য জীবন নেই।'

'আপনার ওই রুগ্‌ণ স্ত্রীকে দিয়ে রোজ সকালে ভারি লোহার উনুনটা তোলান কেন; নিজে পারেন না?'

'কেন পারব না, ওই তো আমাকে তুলতে দেয় না। আমার কোমরে একটা ফিক ব্যথা মতো আছে। মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয়। তা আমার বউ বলে, ওই ভারি উনুন তুলতে গিয়ে চিরকালের মতো বিছানায় পড়ে গেলে কোন মিঞা দেখবে?'

'তার মানে আপনার স্ত্রী আপনাকে ভীষণ ভালবাসেন।'

'বাসেই তো। আমিও ভীষণ ভালবাসি; ওই তো আমার একটি মাত্র স্ত্রী। জানেন তো, জীবনে স্ত্রী একবারই আসে। রাখতে পারলে রইল, না রাখতে পারলে গেল।'

'তাহলে অমন চিৎকার-চেঁচামেচি, গালিগালাজ করেন কেন?'

'ছেলেবেলা থেকে ওইটাই আমার আদত। জানেন তো, মানুষ আসলে বাঁদরের জাত। আপনারা যাঁরা পড়ালেখা করেন তাঁরা জানেন। ঠিক মতো ট্রেনিং না পেলে আমার মতো দামড়া হয়ে যায়। ছেলেবেলায় বাবা আমাকে শুধু রতন বলতেন না। বলতেন, দামড়া রতন। আর আমার বউ, আমার এই স্বভাবটাই পছন্দ করে। চিৎকার, চেঁচামেচি যেদিন কম হয়, সেদিন জিজ্ঞেস করে, কি গো, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'তা এই যে বললেন, আপনার দাম্পত্য জীবন নেই।'

সেটা হল, ছেলেপুলে না থাকলে দাম্পত্য জীবনের কি হল বলুন? তারপর তো ওই শরীর। ছত্রিশটা ব্যামো। সম্প্রতি যোগ হয়েছে ছুঁচিবাই। এইবার আমাকে বলুন, আমি কাকে পাশে নিয়ে শুই? বউ না ডিসপেনসারি। আমার এতখানি শরীর। তাই আমি মদ খাই। মদে একটা জিনিস হয়, চরিএটা মদেই আটকে থাকে। আর বেশি নড়াচড়া করতে পারে না।'

'এই যে বললেন, স্ত্রী আর মায়ের জন্যে মদ ধরেছেন।'

'সে কথাটাও ঠিক। রোজ মশাই দম খাটা খেটে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কীর্তন। মা আসে বউ-এর নামে বলতে, বউ আসে মায়ের নামে বলতে। লে হালুয়া।'

রতন হালদার জিভ কেটে কান মললেন, 'এই আমার চরিত্র। কোথায় কি বলে ফেলি। মুখ নয় তো...।'

রতন তাড়াতাড়ি নিজের মুখ চেপে ধরে ঢোঁক গিলল। গিলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে বললে, 'বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। কি বেরোতে চাইছিল। অ্যায় এই হল রতন হালদার। লক্ষ্মী ক্লথ স্টোরের মালিক। লক্ষ্মী হল আমার স্ত্রীর নাম। তা নামটা মিলেছে জানেন। আসার পর থেকে রোজগারপাতি বেড়েছে। তা হয়েছে। ছোটলোক হতে পারি, মিথ্যেবাদী তো নই। না, আমি এবার যাই। আমার বউ একেবারে সিঁটিয়ে আছে। আসার সময় বলেই দিয়েছে, যাচ্ছ যাও, খুব সাবধান। যা-তা বলে মরো না। খুব একটা যা-তা কিছু বলিনি, কি বলুন? খালি একটা শব্দ লিক করেছিল।'

রতন আবার খাটের দিকে হাত তুলে নমস্কার করল, তারপর যেমন

এসেছিল, সংযত হয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। আমি অবাক। শঙ্কর আর আরতিও অবাক। শঙ্কর তৈরিই ছিল, এলোমেলো কিছু করলে, জীবনের প্রথম ঘুষিটা রতনের চোয়ালে গিয়েই পড়বে।

শঙ্কর বললে, 'এত সহজ সরল মানুষ আমি কমই দেখেছি।'

টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে রতন হালদারের আনা শহরের সেরা আপেল, মুসাম্বি, আতা, সবেদা, কলা। বিশাল এক বাক্স সন্দেশ। করুণাকেতনের ছবিতে দুলিয়ে দিয়ে গেছে, টাটকা গোড়ের মালা। তলায় ঝুলছে টাটকা একটা গোলাপ। রোলেক্স চিকচিক করছে, আনন্দাশ্রুর মতো।

রতন হালদার তক্ষুনি আবার ফিরে এল। হাতে একটা বেশ বড় রঙিন প্যাকেট।

ঘরে সেই একইভাবে সমীহ হয়ে ঢুকল, 'একটা জিনিস ভুলে ফেলে এসেছিলুম। ধূপ। থেকে থেকে, ঘরের চারপাশে জ্বালিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়াচ্ছি না। এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে, আমার বউকে মনে হয় কাঁকড়া বিছে কামড়েছে। সেই কথায় বলে না, গোদের ওপর বিষ ফোড়া। আমি যাই দিদি।'

শঙ্কর আর আরতির সেই রাতটা রতন হালদারের বউকে নিয়েই কেটে গেল। ডাক্তার, ইঞ্জেকশান, বরফ, পাখার বাতাস। সেবা। সব মিলিয়ে একটা রাত। মৃত মানুষের আত্মা এই খেলাটাই খেলেন। দুঃখ ভোলবার জন্যে একের পর এক বিপদ তৈরি করতে থাকেন। যাতে সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে থাকে। মাথা না তুলতে পারে। সেই রাতেই রতন হালদারকে চেনা গেল। লোকটা কত খাঁটি! সারাটা রাত তার দৌড়ঝাঁপ। ছোটাছুটি। মনে হচ্ছিল, তার স্ত্রীকে নয়, বিছে তাকেই কামড়েছে। রতন যেন সেই প্রবাদ—শাসন করে যে-ই, সোহাগ করে সে-ই ভোরের দিকে মনে হল, বিপদটা কেটে গেছে। একে রোগা শরীর তার ওপর বিছের কামড়। বিছে মানে বিছের রাজা, কাঁকড়া বিছে, প্রায় সাপের সমান। রতন হালদার ঠিকই বলেছে, তার বউয়ের শরীরে হাড় ক'খানাই সার। স্রেফ ভেতরের তেজে মহিলা লড়ে যাচ্ছেন। রতন হালদার সত্যিই সংযমী। অন্য কেউ হলে নারীসঙ্গের জন্য ছটফট করত। মদে আরও বাড়িয়ে দিত তার নারী-লিপ্সা। আর একটা ব্যাপার জানা ছিল না, সেটা

হল রতনের ঈশ্বর-বিশ্বাস। দেয়ালের হুক থেকে ঝুলছিল রুদ্রাক্ষের মালা। রতন মাঝে মাঝেই সেই মালাটা নামিয়ে ঘরের কোণে বসে যাচ্ছিল জপে। সেটা এত আন্তরিক, যে কেউ বলতেই পারবে না, এটা ভণ্ডামি। কেউ হাসতেও পারবে না, নিউক্লিয়ার এজে, জপের শক্তি, ব্যটা অশিক্ষিত গেঁয়ো কোথাকার।

মিনিবাস ছুটছে হই হই করে। জানালার ধারে বসে আছে আরতি। পাশে শঙ্কর। আরতির রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। করুণাকেতনের মৃত্যু আরতি সহজভাবেই নিয়েছে। কষ্ট পাচ্ছিলেন ভীষণ। চলে গেলেন। আরতি এখন নিজের জীবনের পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত। বাগানবাড়ির দখলটা পেয়ে গেলেই সে একটা নার্সারি, কেজি স্কুল করবে। সে যোগ্যতা তার আছে। সে ঘোড়ায় চড়তে জানে, সে বন্দুক চালাতে জানে। ইংরেজি জানে সাংঘাতিক ভাল। ওই স্কুল কালে বড় হবে। বিশাল এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাবার নামে নাম রাখবে সেই প্রতিষ্ঠানের—করুণাকেতন।

কণ্ডাক্টর কাছে আসতেই শঙ্কর পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল, আরতি সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের হাত চেপে ধরল। খুব আস্তে বলল, 'এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, আমাদের কাল রাতের চুক্তি।'

শঙ্কর আরতির আঙুলগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ঈশ্বর যাকে দেবেন মনে করেন, তার সবই ভাল করে দেন। লম্বা লম্বা মোচার কলির মতো আঙুল। একেবারে দুধে-আলতা রঙ। ডগাগুলো সব টোপর টোপর গোলাপি। অনামিকায় একটা টুকটুকে লাল পাথর বসানো সোনার আঁঙটি। যা মানিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না। শঙ্করকে ওইভাবে মুগ্ধ হয়ে যেতে দেখে আরতি বললে, 'কি হল আপনার?'

'তোমার আঙুল। ঠিক যেন নন্দলাল বসুর ছবি।'

'এই রকম আঙুল আপনি কত মেয়ের পাবেন। আপনি মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, যে জানবেন?'

'তুমি এই আঙুলে বন্দুক ছুঁড়তে?'

'হ্যাঁ, আমার টার্গেট খুব ভাল ছিল। সত্যি রাজস্থানে সেই দিনগুলো ভোলা যায় না। আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল দিন। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়, রইল না, রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।'

শঙ্কর হঠাৎ মুখ তুলে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কনডাক্টর

ছেলেটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সে-ও অবাক হয়ে আরতিকে দেখছে। টিকিটের পয়সা নিতে নিতে বললে, 'দিদি, আমি এত বছর কন্ডাক্টারি করছি, আপনার মতো সুন্দরী দেখিনি। মনে হচ্ছে জ্যান্ত মা দুর্গা। আপনি কেন সিনেমায় নামছেন না দিদি। সুচিত্রা সেনের পর আর তো একই সঙ্গে অত সুন্দরী আর শক্তিশালী কেউ এলেন না।'

আরতি বললে, 'সিনেমায় নামা কি অত সোজা ভাই?'

'আপনি একটু চেষ্টা করলেই চান্স পেয়ে যাবেন।'

আরতি আর শঙ্কর ভবানীপুরে নেমে পড়ল। আরতিদের অ্যাডভোকেট ভবতোষবাবুর চেম্বারে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ভবতোষবাবু কোর্ট থেকে ফিরে সবে বসেছেন। এক মারোয়াড়ি মক্কেল বাজস্থানী বাংলায় খুব ক্যাচোর-ম্যাচোর করছেন। আরতিকে আসতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'একটু চুপ করুন।'

আরতির এমনই প্রভাব ভবতোষবাবু চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠেই পড়েছেন, 'এসো মা এসো।'

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে আরতি বললে, 'বাবা, মারা গেছেন কাকাবাবু।'

মুখে মশলা দিতে যাচ্ছিলেন ভবতোষবাবু, তাঁর হাত নেমে এল। বললেন, 'যাঃ, একটা যুগ শেষ হয়ে গেল।'

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পাশ থেকে আরতিকে দেখছেন হাঁ করে। শঙ্করের মনে হল মনে মনে তিনি হিসেব করছেন, 'ভাও কিতনা।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'তোমরা জান না, করুণাদা কত বড় ফাইটার ছিলেন! হি ওয়াজ এ গ্রেট সোল।'

কাজের মানুষ। সেন্টিমেন্ট নিয়ে পড়ে থাকার সময় নেই। ওই এক মিনিট নীরবতা পালনের মতো দু'কথাতেই সেরে দিয়ে আসল কথায় এসে গেলেন, 'খুব নিষ্ঠুরের মতোই বলছি মা, করুণাদা মারা গিয়ে তোমার কিছুটা সুবিধে করে দিলেন। কেসটাকে এবার আমি অন্যভাবে প্লেস করতে পারব। তুমি এখন হেল্পলেস, অসহায়। তোমার কেউ নেই। অ্যালোন ইন দিস ওয়ার্লর্ড। বাই দি বাই, এই ছেলেটি কে? এত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান উজ্জ্বল যুবক, একালে সহসা দেখা যায় না।'

'আমরা একই বাড়িতে থাকি। আমার বন্ধু, আমার দাদা, আমার

শিক্ষক, আমার আদর্শ, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, ইনি কে, একটি রেয়ার স্পেসিমেন, আই ক্যান সে।'

'ছেলেটিকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেল। আজকালকার খুব কম ছেলেই আমাকে মুগ্ধ করতে পারে। তুমি কি ব্রহ্মচর্য পালন কর?'

শঙ্কর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। তুমি আমার বইটা পড়েছ? ইন প্রেইজ অফ ব্রহ্মচর্য।'

'বইটা আপনার লেখা? আপনি সেই ভবতোষ আচার্য। আপনার ওই বই-ই তো আমার ইন্সপিরেসান।'

শঙ্কর ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভবতোষবাবুকে প্রণাম করল। ভবতোষবাবু সোজা দাঁড়িয়ে উঠে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। সেই অবস্থায় এক হাতে শঙ্করের পিঠ চাবড়াতে লাগলেন। দু'হাতে, শঙ্করের দু'কাঁধ ধরে, সামনে সোজা দাঁড় করিয়ে, শঙ্করকে দেখতে দেখতে বললেন, 'চেস্ট কত?'

'ছেচল্লিশ।'

'ভেরি গুড।'

শঙ্কর ফিরে এসে চেয়ারে বসল। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক অবাক হয়ে বাঙালিদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন, অবশেষে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেসটা কি ছিল? প্রোপার্টি কি ডামেজ স্যুট।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'প্রপার্টি। হিউম্যান প্রপার্টি।'

'বিষোয় বিষ আছে। আমি তো মোশাই পাগোল হয়ে গেছি। চার ছেলেকে চারটে প্রপার্টি বিলিয়ে দিলুম, লেকিন শান্তি হোলো না দাদা। বোড়োটা ওখোন বলছে কি, আমাকে আরো দাও। মেজোর মকানের সামনে দিয়ে পাতাল রেল গেছে। আরে উল্লুকা পাঠ্‌ঠে, মেজোর তো ফ্ল্যাট। তোর তো বাগানবাড়ি। একটা গাড়ি নতুন মোডেল, আর একটা গাড়ি প্রানা মোডেল। আমি কি দিল্লি যাবো। দরবার লাগাবো। বেলেঘাটামে পাতাল রেল চালিয়ে দাও। মোশাই আমি ভাবছি কি ভিখিরি হোয়ে যাই। জোয় রাম। দেখি একটা হুমন লাগাই, কি দোশ মণ ঘিউ ঢালি।'

'আপনার তো মশাই টাকায় ছাতা পড়ছে। এক বস্তা দিয়ে দিন না?'

'টাকা তো আমাদের কাছে টয়লেট পেপার। নো ভ্যালু। আমরা চাই রিয়েল এস্টেট। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে নো বাড়ি। এদিকে কুছু আছে

পুরনো বাঙালি বাড়ি। চেষ্টা তো চালিয়েছি। লেকিন সোব লিটিগেশানে আটকে আছে। ফ্রি প্রোপার্টি কোথায়? এই আপনারটা ফ্রি আছে। হামি এক কোটির অফার দিয়ে রাখছি।'

'দশ বছর অপেক্ষা করুন। আমি আগে মরি।'

'লেকিন আপনি মোরলেই তো লিটিগেশানে চলে যাবে। যা করবেন মরার কম সে কম সাতদিন আগে করুন।'

'আমি কনট্যাক্ট করে ফাইন্যাল ডেটটা জেনে নি।'

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক হা-হা করে হাসলেন।

ভবতোষ আরতিকে বললেন, 'ডেথ সার্টিফিকেটটা আমাকে আগে পাঠাও। ফাইনাল লড়াইটা শুরু করা যাক। তোমাদের দু'জনের বিয়ে হলে আমি খুব খুশি হব। তবে কেসটা ফয়সালা হবার আগে নয়। ফাইন ইয়াং ম্যান, তোমার নামটা কি?'

'আজ্ঞে আমার নাম শঙ্কর মুখার্জি।'

'আরতিকে তোমার পছন্দ?'

'আমি বেকার। আমার বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ের বাজারে আমি অচল কাকাবাবু।'

'তুমি অচল থাকবে না শঙ্কর। তুমি সচল হয়ে যাবে। যদি তুমি বিবাহ কর, আরতিকে কর। আমি নিজে আরতিকে সম্প্রদান করব তোমার হাতে। যাও। তোমাদের মঙ্গল হোক। এইবার আমাকে কাজ করতে দাও।'

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এল। আরতি বললে, 'শঙ্করদা, আপনি ছাড়া সত্যিই কিন্তু আমার আর কেউ নেই। এই পৃথিবীতে আমি কিন্তু একেবারে একা। এই কথাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আমি কি খুব বেশি দাবি করে ফেলছি?'

'আরতি, তোমার স্বামী হবার যোগ্যতা আমার নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি, যতদিন প্রয়োজন হবে, আমি তোমার ম্যানেজারি করব। তোমার সেবা করব। আমি কামজয়ী নই। কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কামজয়ী হওয়া। চেষ্টা করবে, হারবে, আবার চেষ্টা করবে। বাইরে একটা ভাব দেখাবে নির্বিকার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে যাবে। তবে নিজেকে নানাভাবে ব্যস্ত রাখলে আক্রমণটা কম হবে। সত্যি কথা বলব, তোমাকে কখনও মনে হয় প্রেমিকা, কখনও মনে হয় আমার আদরের

ছোট বোন। দু'রকমের ভাব হয় আমার। তবে তৃতীয় আর একটা ভাব ভীষণ প্রবল তোমাকে আগলে রাখা, তোমাকে সামলে রাখা, তুমি আমার এত আদরের যে তোমার গায়ে যেন কোনও কিছুর স্পর্শ না লাগে। কর্কশ জীবন, কর্কশ সময় যেন তোমাকে ছুঁলে না দেয়। আমার চোখে, তুমি হলে পৃথিবীর সুন্দরতম ফুল। তুমি বলবে, হঠাৎ আমার এমন ভাব হল কেন? আমি বলব, এইভাবেই হয়। তোমার ওই ভুরু কোঁচকানো হাসি। তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার কথা বলার ধরন, এইগুলো হল তোমার ব্যক্তিত্বের দিক, আমাকে এক কথায় কাবু করে ফেলেছে। তুমি প্রথম আমাকে চুম্বকের মতো টেনেছিলে সেই ফুলের দোকানের সামনে। পাশ থেকে রোদ-ঝলসানো তোমার ধারালো মুখ দেখে, তোমার চাবুকের মতো শরীর দেখে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম। তোমার কাছে আমি নিজকে লুকোতে চাই না। গোপনীয়তাটাই পাপ। সেদিন তোমার ঘামে-ভেজা কোমর ছুঁয়ে আমার ডান হাত এগিয়ে গিয়েছিল বালতি থেকে নাট তুলতে। সেই স্পর্শে আমি পেয়েছিলুম বিদ্যুৎতরঙ্গ। সেদিন আমি তোমার প্রেমিক। আবার যেদিন শ্মশানে গঙ্গার ধারে আমার বুকে মাথা রাখলে, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের দু'জনেরই পিতৃবিয়োগ হয়েছে। আমরা দুটি ভাই-বোন। আবার শেষরাতে স্নানের পর তোমাকে যখন ভিজে কাপড়ে জল থেকে তুলছিলাম তখন মনে হচ্ছিল তুমি আমার নায়িকা। এইবার বল, আমাকে তোমার কেমন লাগে? আমার সম্পর্কে তোমার কি ভাব?'

দু'জনে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় চলে এসেছে। দোকানপাট নেই। কিছুটা দূরে আবার আলোর এলাকা। ডানপাশে একটা পার্ক। আরতি দাঁড়িয়ে পড়ল। শঙ্করকে বললে, আমার মুখটা এই আলোছায়ায় তুমি দেখ। যে কথা বলা যায় না, সে-কথা ফুটে ওঠে মুখে।'

শঙ্কর আকাশের আলোয় আরতির মুখের দিকে তাকাল। এ মুখ নায়িকার। চোখ দুটো যেন ইরানী ছুরি। পাশ দিয়ে এক প্রবীণ যেতে যেতে বললেন, উচ্চিং পোকা পড়েছে চোখে। অন্ধকারে হবে না, আলোতে নিয়ে যাও। নরম রুমালের কোণ দিয়ে টুক করে তুলে নাও। বাড়ি গিয়ে দু'ফোঁটা গোলাপজল।'

পরিচালক আর প্রযোজক দু'জনেই এসেছেন আজ, সাদা, রঙ-চটা একটা অ্যামবাসাডার চেপে। যাক, আর কিছু না হোক, একটা বাহন

হয়েছে। প্রযোজক বললেন, ‘স্টোরির কি খবর?’

‘এই খবর।’

‘সে কি, ভিলেনটাকে মেরে ফেললেন।’

‘মারিনি তো, মানে মরেনি তো। এখন আমি আর লিখছি না। আমি আজ্ঞাবহ দাসমাত্র।’

‘ওই হল। ও সব আপনাদের অনেক ভড়ং আছে। ধর্মের পথ মানেই মৃত্যুর পথ। স্টোরিটার আর কি রইল। তারপর আবার সেই রাত। আপনি নায়ক-নায়িকাকে একটা ঘনিষ্ঠ অবস্থায় নিয়ে এলেন, এনে কি করলেন, ডুবিয়ে দিলেন অন্ধকারে। আপনাকে অন্ধকারে পেয়েছে।’

পরিচালক বললেন, ‘না, না, আধো-অন্ধকার, ডানপাশে একটা পার্ক, ইরানী ছুরির মতো চোখ, আমার ক্যামেরার পক্ষে খুব ভাল। এ-সব সফট সিন। এর মর্ম আপনি বুঝবেন না। আপনি শুধু দয়া করে ওদের পার্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন,’ তারপর খেল কাকে বলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।’

প্রযোজক বললেন, ‘তারপর কি হবে, পুলিশ দু-ব্যাটাকেই মারতে মারতে নিয়ে যাবে ভবানীপুর থানায়?’

পরিচালক বললেন, ‘আজ্ঞে না, এইখানেই আসবে নতুন এক ভিলেন, প্রেমের ঘুঘুটির পালক ছেঁড়ার জন্যে। আর প্রেমিক মোরগটির সঙ্গে লেগে যাবে ঝটাপটি। ফাইট সিকোয়েন্স।’

প্রযোজক বললেন, ‘আমি সাফ কথা জানতে চাই, শঙ্কর আর আরতির বিয়ে হবে কি হবে না।’

পরিচালক বললেন, ‘বলুন কি হবে?’

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আরতিদের বাড়ির সামনে, নেমে এলেন ভবতোষ আচার্য ও আর এক ভদ্রলোক। শঙ্কর বেরোচ্ছিল পড়াতে যাবে বলে।

ভবতোষ বললেন, ‘এই যে আমার ইয়াংম্যান, আরতি আছে?’

‘আছে কাকাবাবু। আসুন, ভেতরে আসুন।’

আরতি সবে চান সেরে চুলে জট ছাড়াচ্ছিল। ভবতোষ বললে, ‘মা, দেখ কে এসেছেন?’

আরতি বললে, ‘কে, রাধুকাকা!’

দু’জনে ঘরে ঢুকলেন। ভবতোষ শঙ্করের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ

করতে করতে বললেন, 'ইয়াংম্যান, আমরা একটু একান্ত বৈষয়িক কথা বলব, বাবা। যাবার সময় দেখা করে যাব তোমার সঙ্গে।'

শঙ্করের মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে রে শঙ্কু?'

'আরতিদের উকিলমশাই। তুমি একটু চা বসাও মা। আমি খাবার কিনে আনি। মস্ত মানুষ। আমার গুরুও বলতে পার।'

রাধুবাবু বললেন, 'করুণা মারা গেছেন আমি শুনেছি। তুমি আমার বন্ধুকন্যা। তোমার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। বলতে পার, স্রেফ জেদাজেদির বশে এই কোর্ট-কাছারি-মামলা। আমি এখন আমার সেনসে ফিরে এসেছি। আর মামলা নয়। এইবার সহজ সমাধান। এই পরিবেশে তোমার আর এক মিনিট থাকা চলবে না।'

'চোদ্দ বছর রয়েছি কাকু।'

'সে তোমার বাবার জেদে। আর না, প্যাক-আপ, প্যাক-আপ।'

ভবতোষ বললেন, 'প্যাক-আপ, প্যাক-আপ।'

'কোথায় যাব আমরা?'

'বারাসতে, তোমার বাগানবাড়িতে। যা আমি আজ চোদ্দ বছর আগলে বসে আছি। দেখবে চল, সেখানে তোমার মানসদা কি করেছে? বিশাল এক নার্সিং হোম। সেই নার্সিং হোমের নাম হবে, করুণাকেতন। সেখানে তোমার কত কাজ। এক যুগ ধরে তুমি সেবা করেছ বাবার। এইবার করবে সমাজের। তুমি হবে নিবেদিতা। দিস ইজ নট ইওর প্লেস, মা। তুমি এখন বন্ধনমুক্ত, তোমার সামনে নবদিগন্ত।'

'আমি একবার শঙ্করদার সঙ্গে পরামর্শ করে নি।'

ভবতোষ বললেন, 'কোনও দরকার নেই মা, আমরা ছাড়া তোমার কে আছে? রোমান্স রোমান্স, জীবন জীবন। তোমার ব্যাগে সামান্য কিছু ভরে নাও, ভ্যালুয়েবলস। পরে সব লরিতে যাবে। তোমার ফিউচারের একটা সমাধান করতে পেরে আজ আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।'

'আমি শঙ্করদার সঙ্গে একবার কথা বলব।'

'না, করুণাকেতনের মেয়ে হয়ে তুমি কোনও ফিল্মি নাটক করতে পারবে না। তুমি আর দেরি কোরো না। ওদিকে মানস বেচারা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'আমি যদি না যাই।'

রাধুকাকা বললেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। আমার স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তোমার পিতা দুঃখ পাবেন। আমরা ঠিক করেছিলুম, আমাদের দু'জনের যদি ছেলে আর মেয়ে হয়, তাহলে তাদের বিয়ে হবে। আমার ছেলে মানস এফ.আর.সি.এস।'

ভবতোষ কাকা বললেন, 'এতে হবে কি তুমি তোমার সম্পত্তি ফিরে পেলে। প্লাস পেলে আধুনিক এক নার্সিং হোম। যে হোমের নাম হবে করুণাকেতন। মামলা লড়ে যা তুমি কোনও দিন পাবে না।'

'কাকাবাবু ক'লাখ?'

'ক'লাখ মানে?'

'রাধুকাকু ক'লাখ খাইয়েছেন আপনাকে?'

দুই প্রবীণের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। হড়াস করে দরজা খুলে গেল। দু'জনে ছিটকে বরিয়ে এলেন। শঙ্কর আর তার মা চা-খাবার নিয়ে আসছিলেন। ছিটকে পড়ে গেল। ভবতোষ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ব্রহ্মচারীর বিয়ে করা উচিত নয়।'

আরতি একটু গলা চড়িয়ে বললে, 'চোদ্দ বছর যখন একা চলতে পেরেছি, বাকি জীবনটাও পারব।'

প্রযোজক বললেন, 'সেই পাঁচশো টাকা আছে, না খরচ হয়ে গেছে?'

'চলেনি, সব ক'টা অচল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওইটাই আমাদের হাতের পাঁচ, হাতের প্যাঁচও বলতে পারেন। দিন। আবার আর এক জায়গায় গিয়ে টোপ ফেলি।'

বিকট শব্দ করে গাড়িটা চলে গেল। আমার নিয়তির অট্টহাসি।

বারুদ

শব্দ শুনে সুধা এঁটো হাতেই ছুটে এলেন রান্নাঘর থেকে। মানস মেঝেতে দু'হাতে মাথা আড়াল করে বসে আছে, তার সামনে বেলো খোলা হারমোনিয়াম। আর শঙ্কর একটা কাঠের হ্যাঙার দিয়ে মানসকে

আগাপাশতলা পিটিয়ে যাচ্ছে। একেবারে আন্তরিক পেটানো। কোনও দয়ামায়া নেই। সুধা অবাক, নিজের ছেলেকে কেউ ওভাবে মারতে পারে! সুধা ছুটে এসে স্বামীর হাত থেকে হ্যাঙারটা কেড়ে নিলেন, 'কি করেছে কি? তুমি ওকে অমন করে মারছ কেন? মরে যাবে যে।'

উত্তেজিত শঙ্কর বেরিয়ে এলেন দক্ষিণের খোলা বারান্দায়। ঘেমে গেছেন। টুকটুকে ফর্সা সুন্দর চেহারা। যখন বয়েস আরও কম ছিল, সবাই বলত কন্দর্প, গন্ধর্ব। শঙ্করের টকটকে ফর্সা মুখ রাগে লাল। সারা শরীর কাঁপছে। গায়ে চাঁপা ফুল রঙের ফিনফিনে পাঞ্জাবি। কালো কাঁচিপাড় ধুতি। শঙ্কর বেগে ঘরে ঢুকে মানসকে আচমকা একটা লাথি মেরে বললেন, 'গেট আউট ফ্রম মাই হাউস।'

সুধা জামা তুলে ছেলের ক্ষতবিক্ষত পিঠ দেখছিলেন। পুলিশেও বোধহয় এমন করে মারে না। সুধা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার শরীরে কি কোনও মায়া দয়া নেই। কিভাবে মেরেছো একবার দেখ। কোনও বাপ তার ছেলেকে এইভাবে মারে?'

শঙ্কর বললেন, 'এই বংশে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ গানের লাইনে যাবে না, যাবে না, যাবে না। আমি এসে দেখি আমারই হারমোনিয়াম নিয়ে রাসকেলটা আমারই গান গাইছে। এর আগে আমি বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। তুই হারমোনিয়াম ছুঁবি না, তুই গলা দিয়ে সুর বের করবি না। লেখা-পড়া শিখে ডাক্তার হও, ব্যারিস্টার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, কিন্তু গাইয়ে তুমি হবে না।'

সুধা বললেন, 'এ আবার কি? আশ্চর্য কথা! যার অত সুন্দর গলা, এমন ভগবানদত্তপ্রতিভা, যে শুধু শুনে শুনে তোমার প্রায় সব গান অবিকল তোমার মতো গাইতে পারে, সে গান গাইবে না? এ কি? তোমার তো উচিত ওকে তালিম দেওয়া। পশ্চিমের ওস্তাদরা তো তাই করেন। তোমার এই অদ্ভুত আদেশের কারণ তো আমার মাথায় আসে না!'

শঙ্কর উঁচু গলায় বললেন, 'তুমিও গেট আউট। আমার ত্রিসীমানায় তোমরা কেউ আসবে না।'

সুধা ছেলেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন দমাস করে। ছিটকিনি তোলার শব্দ হল ভেতর থেকে। সুধা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় বললেন,

'সবাই গেট আউট হয়ে গেলে কাকে নিয়ে থাকবে?'

ভেতর থেকে উত্তর এল, 'ভিকিরিরা যেমন গান নিয়ে থাকে, অন্ধ ভিকিরি।'

কালোর ওপর ভারি সুন্দর চেহারা। মায়াবী মুখ চোখ। একমাথা ফুরফুরে চুল। দীর্ঘ, সুঠাম। শঙ্কর যেমন উঁচুদরের গাইয়ে তেমনি উচ্চশিক্ষিত। স্কটিশের নামকরা ছাত্র। ভারতবর্ষের তিনজন প্রথম সারির ওস্তাদের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন। খেয়াল, ঠুংরি, ভজন। সাত বছর বয়সে জামাইবাবুর কোলে বসে আসরে গান গেয়েছেন, তবলার সঙ্গে, তালে, লয়ে, 'কোলে তুলে নে মা কালী'। সেই আসরে ছিলেন ভীষ্মদেব। তিনি শঙ্করকে বলেছিলেন, তোমার হবে। তবে এখনই আসর মারার চেষ্টা কোরো না। নষ্ট হয়ে যাবে।' শঙ্করের হয়েছে। সত্যই হয়েছে। গানের ব্যাকরণে তাঁর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবেন না। তালে, লয়ে যে কোনও তবলিয়াকে তিনি ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন। এক শার্পে তিন সপ্তকে তাঁর গলা খেলা করে অক্লেশে। সবই হয়েছে। হয়নি অর্থ। সংগীতজগতের কুৎসিত দলাদলি অনবরতই তাঁর পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। প্রাপ্য সম্মান তিনি আজও পেলেন না। ভীষণ একরোখা, আর সৎ মানুষ, তেমনি রাগী, ফলে অক্ষম, অযোগ্য লোকের পায়ে তেল মাখাতে পারেন না। আর ওইটা না পারলে, এ-বাজারে মানুষের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা হয় না। শঙ্করের বৃদ্ধ পিতা সংসারের হালটি ধরে আছেন,বলেই চলছে, তা না হলে সংসার টাল খেয়ে পড়ে যেত। বাঁধ দিয়ে যেমন জল আটকায়, শঙ্কর সেইরকম প্রতিরোধ দিয়ে গান আটকাতে চাইছেন। এই বংশে আর যেন কেউ গাইয়ে না হয়। গান বেচার জিনিস নয়। গান আরাধনার জিনিস। প্রকৃত শিল্পীর ভবিষ্যৎ হল, অনাহারে মৃত্যু। শঙ্কর জানেন, ছেলে তারই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়ে এসেছে। শ্রুতিধর। সংগীত তাকে টানবেই মায়াবিনীর বাঁশির মতোই। তারপর ভবিষ্যৎটা ছারখার করে দেবে। তিনি এড়াতে পেরেছেন, ছেলে কি পারবে? সুরের পেছনে আসবে সুরা, তার পেছনে সাকী। নিজের গুরুভাইদের অবস্থা তো পড়েই রয়েছে চোখের সামনে। আবীরলাল চক্রবর্তী। হীরেন মজুমদার। গলায় সুর না থাকুক, তালকানা, লয়কানা হও ক্ষতি নেই, পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকলেই হল। যেটা এ-বংশের কারোর ছিল না কখনো, এখনো নেই। শরীরে বড় বেশি নীল রক্ত। বড় বেশি অহঙ্কার।

ঈশ্বর আর সংগীত ছাড়া কারোর চরণে মাথা নত করবো না। তা বললে চলে! সেই কারণেই সব অচল হয়ে আসছে। মাথায় মাথায় দুই মেয়ে, এক ছেলে। এদিকে আমির ওমরাহদের মতো মেজাজ। কেউ বিয়ের নিমন্ত্রণ করলে বেনারসী নিয়ে লৌকিকতা করতে ছোটেন। বেদীজীর কাছে যখন খেয়াল শিখছেন, তখন থেকেই মোগলাই খানায় অভ্যস্ত। রোগানজুস আর পারোটা না হলে রাতের খানা জমে না। দু'একজন সমঝদার বন্ধু না হলে খেতে বসে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এমনিতে ভীষণ রসিক মানুষ। মেজাজ ভালো থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রসিকতা করে আসর জমিয়ে রাখতে পারেন। সবাই হেসে কুটোপাটি খাবে। আবার গানে বসলে অন্য মূর্তি। একেবারে আত্মগত, তন্ময় শিল্পী। তবলিয়া 'সম' ধরতে না পারলে 'ফাঁক' চিনতে না পারলে, তবলা টেনে নিয়ে নিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন বোলের ছন্দ। তারপরেও না পারলে আসর থেকে দূর করে দেবেন। তবলিয়া ডাঁট দেখালে গানের মধ্যে 'সম'টাকে এমন কায়দায় লুকিয়ে ফেলবেন যে বেচারা বিপাকে পড়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, 'ধরার চেষ্টা করুন।' এক একবার এক এক জায়গা থেকে তিনি ধরবেন, শঙ্কর অমনি মাথা দুলিয়ে বলবেন, 'হল না, হল না।' প্রকাশ্য আসরে এই রকম কতবার হয়েছে। আসরে কেউ কোনও রাগ গাইবার ফরমাশ করলে শঙ্কর অসম্ভব রেগে যান। একবার এক আসরে জনৈক নামজাদা ধনী খুব মেজাজে বললেন, 'একটা মালকৌষ ছাড়ুন তো।' শঙ্করের পাতলা ধনুক-ভুরু আরও ধনুকের মতো হয়ে গেল। শঙ্কর শঙ্করায় গানের মুখটা গেয়ে ভদ্রলোককে খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ্ঞে, নিবেদন ঠিক হচ্ছে তো?' ভদ্রলোক ব্যঙ্গটা ঠিক ধরতে পারলেন না, খুব মুরুব্বিয়ানার চালে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোফা হচ্ছে। মধ্যমটা আর একটু কড়া করে লাগান।'

'কড়া করে লাগাবো?'

শঙ্কর যোগ রাগে একটা গানের মুখ গেয়ে বললেন, 'এইবার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'অ্যায়, এতক্ষণে ঠিক এল।'

'তাই না কি? মালকোষে কি কি পর্দা লাগে বলুন তো?'

'ওই যে, যা যা লাগাচ্ছেন।'

শঙ্কর অমনি কড়া গলায় বললেন, 'এটাকে বাইরে বের করে দিন

তো।'

সঙ্গে সঙ্গে হই হই পড়ে গেল আসরে। যাঁর টাকায় আসর, তাঁকেই বাইরে বের করে দেবার আদেশ! শেষে পরিস্থিতি এই দাঁড়াল শিল্পী থাকেন, কি উদ্যোক্তা!

রেকর্ড কোম্পানিতে শঙ্করের সুরে ও কথায় গানের রেকর্ড করবেন নামী এক শিল্পী। রিহার্সাল হচ্ছে। সাত-আটবার দেখাবার পরও শিল্পীর গলায় গান আসছে না। শঙ্কর মালিকদের একজনকে ডেকে বললেন, 'কাকে ধরে এনেছেন মশাই। নি লিক করছে। কড়ি মধ্যম লাগছে কড়ি বরগার মতো।'

'কি বলছেন? এঁর রেকর্ড বাজারে পড়তে পায় না।'

'এঁকে দিয়ে হবে না মশাই। গলাকাটার গান হয় না। এঁকে দিয়ে ছড়া গাওয়ান।'

রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেল চিরকালের মতো। শঙ্করের 'টেনর' গলা। শঙ্করের সুরে যে কোনও গানের অন্তরা তার সপ্তকের মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ছুঁয়ে খেলা করে নেমে আসে। কে গাইবে সে গান! শঙ্কর ছাড়া।

রেডিওর স্টেশান ডিরেক্টারকে বললেন, 'আমাকে আর কতকাল বি-হাই গ্রেডে ফেলে রাখবেন?'

ডিরেক্টার বললেন, 'যতদিন না আপনি গ্রেড বাড়াবার অডিশানে বসছেন।'

'আমার পরীক্ষা কারা নেবেন?'

'কেন? আমাদের প্যানেল অফ জাজেস।'

'তাঁরা গান জানেন? আমার পরীক্ষায় তাঁরা পাশ করতে পারবেন?'

বাস্, রেডিওর সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। এইভাবে শত্রু বাড়াতে বাড়াতে শঙ্কর আজ একেবারেই একঘরে। সবাই বলেন, 'ওই দুর্বাসাকে কে আসরে ডাকবে বাবা।'

আঘাতের বিনিয়ে আঘাত আর সেই আঘাতে আহত শঙ্করের এখন তিনটি সম্পদ, সুর, ঈশ্বর আর অভিমান। শঙ্করের ইদানীং একটা বিখ্যাত গান, নিজের কথায়, নিজের সুরে, 'গান শোনাবি তাকে যিনি দীন-দুনিয়ার কাণ্ডারী।/তিনিই যে তোর সকল গানের, সকল সুরের ভাণ্ডারী।।' তিলক-

কামোদে এই গান যখন করেন, তখন শ্রোতাদের চোখে জল এসে যাবে। গানে বসলেই শঙ্করের একটা রূপান্তর হয়। চোখ-মুখ-চেহারা। তখন সকলেরই মনে হতে থাকে, এই সেই গন্ধর্ব। দেবলোক থেকে নেমে এসেছেন মর্ত্যলোকে। শঙ্কর গান দিয়ে আর মানুষকে ছুঁতে চান না। রেডিও অফিসের বড়কর্তা, রেকর্ড কোম্পানির বড়বাবু, কি পেটমোটা গোলাপী ধনকুবের, কি টিকিট কাটা হুজুগে শ্রোতা। গানের ওপারে এখন দাঁড়িয়ে দেখেন তিনি, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—/আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।।' গানের ভেতরে যত ডুবতে থাকেন গলা ততই চড়তে থাকে। একেবারে তারসপ্তকের ধৈবতে ধরেন—'ব্যথায় কারো গলে না প্রাণ/ব্যথার বলো কি আছে দাম।।' শঙ্করের সমস্ত গানই এত কঠিন যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তোলা অসম্ভব। ফলে একমাসের বেশি কেউ টেকে না। সুধা বলেছিলেন, 'একটু সহজ হও না।' শঙ্কর রেগে বলেছিলেন, 'তার মানে? সারেগামা শেখাবো আর মাসে পাঁচ টাকা মাইনে নোবো!'

সুধা মানসকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। দুই বোন ছুটে এল। তারা এতক্ষণ মারের শব্দ শুনে কাঁদছিল। কিছু তো করার নেই। বাবার ভয়ে সবাই তটস্থ। কোনও দিন হেসে কাছে ডাকলে তবেই এগোবার সাহস হয়। ভোলেভালে, গানপাগলা এই ভাইটাকে দু'জনেই ভীষণ ভালবাসে। লেখাপড়ায় তেমন মন নেই। মন পড়ে আছে গানের দিকে। মাথার ভেতর সবসময় সুর চলছে। দরবারীর আলাপ। কাফি সিন্ধুর মোচড়। পিলুর কান্না। ভৈরোঁর প্রার্থনা। এঘরে পড়া নিয়ে বসেছে, ওঘরে বাবা গানে সুর বসাচ্ছেন। মানস একেবারে বিভোর। কাজকর্ম দিয়ে গানটাকে বাবা যত কঠিনই করুন, মানসের মনে গেঁথে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সামনে পড়ার বই, মানস গুনগুন করছে গান। নিজের মনেই বাবার তারিফ করছে। বাবাকে সে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করে। গানের মতোই ভালবাসে। বাবা যদি তাকে কুপিয়ে খুনও করেন মানস প্রতিবাদ করবে না, চিৎকার করবে না। পড়ে পড়ে মার খাবে। কেউ যদি বাবার নিন্দে করে, সে যত বড় শক্তিশালীই হোক মানস তেড়ে যাবে।

সুধা পিঠের দিকে জামাটা তুলতে গেলেন। মানস হাসতে হাসতে বললে, 'আমার কিচ্ছু লাগেনি মা। বাবার গায়ে কি তেমন জোর আছে!

আসলে কি জানো তো, হারমোনিয়ামটা খুব দামী তো, উল্টোপাল্টা বাজিয়ে আমি যদি খারাপ করে ফেলি।'

সবাই জানে মানস ভীষণ ভালো হারমোনিয়াম বাজায়। সে যখন বাজায় মনে হয় কোনও পাকা লোক অরগ্যান বাজাচ্ছে।

মেজো বোন বললে, 'ভাইদা, তুই তো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে বাজাবি! তাহলে এই মারটা খেতে হত না! বাবার ভারি অন্যায়।'

মানসের মুখটা কঠিন হল। বললে, 'বাবার নামে কিছু বলবি না। বেশ করেছে বাবা আমাকে মেরেছে।'

সুধা মেয়েদের বললেন, 'কি লাগাই বল তো।'

দুই মেয়ে ভাইয়ের পিঠের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠল, 'ইস, কি অবস্থা!'

মানস বললে, 'চোপ!! এমন কিছুই হয়নি। বাবা শুনতে পেলে দুঃখ পাবেন।'

সিঁড়িতে খড়মের আওয়াজ। শঙ্করের বাবা বাজার থেকে ফিরছেন। বৃদ্ধ, কিন্তু ভীষণ শক্তসমর্থ। ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বলশালী। দীর্ঘ, ঋজু শরীর। যৌবনে কুস্তি করতেন। আড়াই মণ ওজনের মুগুর ভাঁজতেন। একটা গোটা কাঁঠালের রস পাঁচ পোয়া দুধ দিয়ে ফুটিয়ে খেতেন। একবাটি অড়হর ডালে আধপোয়া খাঁটি খুরজা ঘি ঢেলে খেয়ে হজম করার শক্তি ছিল। এই বয়সেও ছানি পড়েনি। চোখে দূরদৃষ্টি অথবা নিকট-দৃষ্টির চশমা লাগাতে হয়নি। প্রাচীন অভ্যাস, খড়ম পায়েই হাঁটাচলা করেন পাড়ার রাস্তায়। তাঁর হাঁটার দৃপ্ত ভঙ্গিমার দিকে লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রবীণরা ডেকে ডেকে যুবকদের দেখান—'দ্যাখ, সংযমী মানুষের চেহারা দেখ। এই বয়সেও কেমন হাঁটছেন, খাপখোলা তরোয়ালের মতো।' চামড়া এখনও তেলা, টানটান, মসৃণ। চুল পেকেছে, কিন্তু টাক পড়েনি। সাংঘাতিক রজোগুণী মানু। সিংহের মতো স্বভাব। কারোকে পাত্তা দেন না। পরোয়া করেন না। জীবনে কারোর কাছে হাত পাতেননি। প্রায় মাথায় মাথায় একটি শিশু-পুত্র ও কন্যা রেখে স্ত্রীর চলে যাবার পর আবার বিয়ের জন্যে আত্মীয়-স্বজনেরা যখন ভীষণ উৎপাত শুরু করলে, তখন দুম করে অনেক টাকার মাইনের রেল কোম্পানির ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আর তো কোনও সমস্যা নেই। নিজের ছানাদের নিজেই মানুষ

করবো। সংসারে কোনও সার আছে? ছ'বছরের বিবাহিত জীবনে হিসেব করলে দেখা যাবে, ক্ষেপে ক্ষেপে তিনটে বছর গেছে ঝগড়ায়। দেড় বছর গেছে রোগের সেবা। আর দেড়টা বছর একটু প্রেমালাপ। মার ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর।'

বৃদ্ধ ছেলে আর মেয়েটিকে কিন্তু ভীষণ ভালবাসতেন। মায়ের মধ্যে দেখলেন জগদম্বাকে, ছেলের মধ্যে পেলেন শিবশঙ্করকে। ঢুকে পড়লেন সাধনার জগতে। শুরু হল তন্ত্রসাধনা। আরম্ভ হল ষোড়শোপচার-এ তারা মায়ের পূজা। কোথা থেকে এসে গেলেন এক তন্ত্রসিদ্ধ পূজারী। বৃদ্ধ একসময় ধ্রুপদ শিখতেন। নিজেই আবার শুরু করে দিলেন সংগীতসাধনা। বিশাল তাঁর কণ্ঠ। জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার, বলে যখন তানপুরা বেঁধে গান ধরতেন, পাড়া-প্রতিবেশীকে তখন নিজেদের কথাবার্তা জোরে জোরে বলতে হত, কিছুই সোনা যেত না, মুখুজ্যেমশাইয়ের গানের ঠেলায়। বাড়িতে ঘনঘন সাধুসন্তর আগমন হতে লাগল। গৃহ হয়ে উঠল আশ্রম। অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন ভাল ঘরে। আদর্শবান, ভয়ঙ্কর এক রাগী মানুষের সঙ্গে। ছেলেটিকে মেয়ে-জামাইয়ের হেপাজতে রেখে চলে যেতে লাগলেন হিমালয়ে। পরিব্রাজকের বেশ হল গেরুয়া। হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু, কাঁধে কম্বল। পাহাড়, ঝরনা, বরফ, হিমবাহ হল জীবনের সঙ্গী। হরিদ্বারে মিলে গেল গুরু। রাজসিক ভোগী হয়ে গেলেন যোগী। চাঁদের আলোয় পাহাড়ি ঝরনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান শোনাতেন পরমেশ্বরকে।

সেই বৃদ্ধ খড়ম খটখটিয়ে আসছেন। হাতে একটা চটের থলে। নাতনীরা দাদার পিঠে সোঁটা সোঁটা ক্ষতের উপর ওষুধ লাগাচ্ছে। সুধা তটস্থ হয়ে এগিয়ে আসছেন বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত থেকে থলেটি নেবার জন্যে। এমন সময় বন্ধ ঘরে শঙ্কর চড়া পর্দায় গান ধরলেন 'মা গো তুমি শুধু বেদনাই দিতে জানো।'

বৃদ্ধের গানের কান। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হল, দোর বন্ধ করেই ভরদুপুরে দরবারী ধরলেন, খুনোখুনি হয়েছে বুঝি?'

ছোট নাতনী মুখ হলসা, সে আগেই বলে বসল, 'এই দেখ না বুড়োদা, ভাইদাকে কি রকম মেরেছে।'

'কে মারলে ওরকম করে। রাস্তায় বুঝি মারামারি করতে

বেরিয়েছিলে?'

সুধা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন, এখুনি পিতাপুত্রে বেঁধে যাবে হয়তো; আর সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে সংসার চালানোর প্রসঙ্গ। মানুষটার অনশন শুরু হয়ে যাবে। ওই ঘরেই একাসনে বসে শীর্ণ তাপসের মতো একের পর এক গান লিখে সুর করে গেয়ে যাবে, আর গেলাস গেলাস জল খাবে। দু'জনেরই কষ্ট। বৃদ্ধ তাঁর নিচের কুঠুরিতে ঢুকে যাবেন। বসে পড়বেন পুজোর আসনে। ওপরে আর ভুলেও উঠবেন না। দোকান বাজার বন্ধ। দিনকতক অরন্ধন। অনশনভঙ্গের অস্ত্র হল অনশন। ছেলেমেয়েদের চিঁড়ে খাইয়ে সুধা এক গেলাস জল খেয়ে বই কি বোনা নিয়ে বসবেন। মেয়েরা সাধ্য-সাধনা করবে। বাবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আজ তিনদিন হয়ে গেল, মা কিন্তু তোমার জন্যে শুধু জল খেয়ে আছে বাবা।'

সুধা কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'এক দণ্ড বাড়ি থাকে না, কোথায় কি করে এল বলছেও না।'

মানস নিচে নামার সিঁড়ির দিকে পালাচ্ছিল, বৃদ্ধ বললেন, 'কবে তুই একটু মানুষের মতো হবি রে?' মানস আবার রাস্তায়। বাড়িতে থাকলেই সে আবার গান গেয়ে ফেলবে। গান তার কাছে কাশির মতো। কিছুতেই চাপতে পারে না। অন্যমনস্ক হলে বেরিয়ে আসবেই, আর বেরোবে বাবার সুর ও কথা।

বাড়িতেই মানসের কোনও খাতির নেই; কিন্তু বাইরে তার সাংঘাতিক খাতির। সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণের মতো এই ছেলেটির দিকে। যে যখন সুযোগ পায় সেই মানসকে ধরে নিয়ে যায় তাদের বাড়িতে। যেখানেই মানস সেইখানেই জমজমাট পরিবেশ। গানে গল্পে, মজার মজার কথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সকলকে মজিয়ে রাখে। অফুরন্ত মানসের গানের ভাণ্ডার। প্রায় সমস্ত রাগরাগিণী তার আয়ত্তে। সবরকম তাল সে জানে। নিজে নিজেই তবলা শিখেছে। খেয়াল পুরো গাইতে পারে না, কিন্তু ঠুংরি, গীত, গজল, ভজন গেয়ে সে একটা সারা রাতের আসর অনায়াসে চালিয়ে দিতে পারে। ভক্তিমূলক গান, প্রাচীন শ্যামাসংগীত, টপ্পা অঙ্গের গান অসাধারণ ভাল গায়। সবাই ভাবে, বাবার তালিমে এইসব হয়েছে।

রাস্তায় বেরোলেই মানস যেন নিজেকে খুঁজে পায়। আড্ডাবাজ,

মিশুক ছেলে। কেউ তার কাকা। কেউ দাদা। কেউ জ্যাঠা। কেউ দিদি। কেউ বউদি। সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। সোজা যে কোনও বাড়ির হেঁসেলে সে চলে যেতে পারে। মানস হল তার অহঙ্কারী বংশগর্বী বাবার নিরহঙ্কারী অপর পিঠ। মানস হল তার বাবার ব্যালেন্স্। পাড়া-বেপাড়ার অজস্র শত্রু মানসের জন্যেই ঠাণ্ডা থাকে। এই বয়সের ছেলেরা মেয়ে-পাগল হয়। মেয়েদের সম্পর্কে মানসের আলাদা কোনও কৌতূহল নেই। সে বোঝে না, মেয়ে ব্যাপারটা কি? এটা মনে হয় তার পিতামহের উত্তরাধিকার। মানসের এই সরল শিশু-মনের জন্যে যে-কোনও বয়সের মেয়ে মানস বলতে অজ্ঞান। মানস যে কোনও বাড়ির হেঁসেলে সোজা চলে যেতে পারে। একটু হাসির গান। আখর দিয়ে কীর্তনের ক্যারিকেচার। ছায়াছবির নায়কের অনুকরণ। নিজের জীবনের মজার মজার গল্প। বন্যার জলে ভেসে যাবার গল্প। পাগল অধ্যাপকের গল্প। মানস কথা বলে একটু থেমে থেমে। কথা মাঝে মাঝে আটকে যায়। সেটাও একটা বড় আকর্ষণ। আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার অসাধারণ হাসি। তিন মিনিটে মানস পরকে আপন করে নিতে পার। মানস চলে যাবার পর সকলেই একটা শূন্যতা বোধ করে। যেন মহানন্দের হাট ভেঙে গেল। যেন শ্রীচৈতন্য চলে গেলেন নবদ্বীপ ছেড়ে। কৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়।

শংকরের সাংঘাতিক মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একজনই কিছু আদায় করতে পেরেছিল, তার নাম সুখময়। লম্বা কঞ্চির মতো চেহারা। ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। আড়ালে অনেকেই তাকে ঝুলঝাড়ু বলে। সামনে কেঁচো হয়ে থাকে। সুখময় যখন গান গায় তখন সুখময়; যখন ছুরি চালায় তখন তার নাম বল্টু। মাসখানেক আগে এক আসরে সুখময় বাগেশ্রী রাগে খেয়াল গেয়েছিল, আনন সায়েব গান শেষ হবার পর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, 'বাগেশ্রী রাগটা ভেবেছিলুম আমিই ভাল গাই, এখন দেখছি তুমিও কম যাও না।'

মানস কোথায় যাই, কোথায় যাই করতে করতে চলে এল বল্টুদার বাড়িতে। ছন্নছাড়া একটা মানুষ। একটা পোড়ো বাড়ির বাইরের ঘরে তার আস্তানা। এককোণে মা-কালীর বেশ বড় একটা মূর্তি। বিরাট, লকলকে জিভ ঝুলিয়ে আধো অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। বল্টু যখনই হোক রোজ ঘণ্টা তিনেক আসনে বসে। আজ বোধহয় সকালেই বসেছিল।

কপালে দগদগ করছে এক ধাবড়া তেল-সিঁদুর। বাড়িটা এত প্রাচীন আর এত ড্যাম্প যে মায়ের গায়েও নোনা ধরে গেছে।

বল্টু মেঝেতে এটা চটের ওপর বসে তানপুরা ছাড়ছে। গায়ে গা লাগিয়ে আয়েস করে শুয়ে আছে রাস্তার একটা কুকুর। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে ঝাঁঝালো ঝগড়ার শব্দ। বল্টুর বাবা চির রুগ্ণ। এখন একেবারে ইনভ্যালিড। মাথায় মাথায় দুটি মেয়ে বেশ বড় হয়েছে। সুন্দরী, কিন্তু কেউই বিয়ের চেষ্টা করেনি বলে বিয়ে হয়নি। গোটাকতক বখাটে ছেলে জামাই হবার ইচ্ছে রাখে, বল্টুর ভয়ে এগোতে পারে না। দূর থেকে দেখে। মিটসেফের বাইরের বেড়ালের মতো। বল্টুর মা জীবনে একটা জিনিসই জানেন, ঝগড়া। ঝগড়ার সময় তিনি যেন চতুর্মুখ লেডি ব্রহ্মা। এখন সেই ঝগড়াই চলছে।

মানসকে দেখে বল্টু লাফিয়ে উঠল, 'এসো গুরু। এতদিনে মনে পড়ল ওস্তাদকে। নিশ্চয় বেদনার রাগিণী বেজেছে মনে!' ভেতরে ঝনঝন করে কি একটা পড়ল। মানস চমকে উঠেছিল। বল্টু হাত তুলে বললে, 'ঘাবড়ে যেও না গুরু, 'সম' পড়ল। ঝাঁপতালে ঝগড়া চলেছে। মা মেয়েতে। ভাবছি, এ বছর কালী পুজোয় সবকটা পাঁঠাকে বলি দিয়ে দেবো। কাল রাত্তির থেকে শুরু হয়েছে।'

মানস চটের এক পাশে বসল। কুকুরটা অমনি পা দুটো টান টান করে মানসের কোলে তুলে দিল। বল্টু বলল, 'ব্যাটা যেন গভারনারের বাচ্চা। নাও গুরু, মিঞা মল্লারে একটু গলা মেলাও।' গান জমে গেল নিমেষে। এ ধরে ও ছাড়ে, ও ছাড়ে, তো এ ধরে। বিস্তারের রকম রকম খেল। দুজনেই তখন অন্য জগতে। একটু আগে মানসের ক্ষতবিক্ষত পিঠটা বড় জ্বালাচ্ছিল, সে সব এখন উধাও। সুর বোনা চলেছে নানা নকশায়।

হঠাৎ বল্টুর মা জ্বলন্ত একটা তোলা উনুন এনে ঘরের মাঝখানে নামিয়ে দিয়ে খ্যানখেনে গলায় বললেন, 'নাও, রাগ-রাগিণীর কালিয়া কোফতা বানাও। সকাল সাতটা থেকে জনে জনে বলছি, ঘরে কিছু নেই, ঘরে কিছু নেই, ঘরে কিছু নেই। সব কানে তুলো দিয়ে বসে আছে। নে সব চুলো খা চুলো।'

বল্টু মিঞা মল্লারেই গানের লাইন বলে উত্তর দিল 'কুতুর কুতুর ময়না, কাল দেব তোর গয়না। ওরে ও কুতুর কুতুর ময়না।।' বল্টুর মা

রেগে বেরিয়ে যেতে যেতে মানসকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'তুমি এসেছো বাবা, ভেতরে এসো। ওর সঙ্গে বেশি মিশো না। পরকালটা ঝরঝরে করে দেবে।'

বল্টু সঙ্গে সঙ্গে গান ঘুরিয়ে নিল, 'দনুজ দলনে, অসুর নাশিতে মাতঙ্গী মেতেছে সমর সঙ্গে।'

বল্টুর মা বেরিয়ে গেলেন। চেহারা দেখলেই মনে হয় ভদ্রমহিলার চালচলনে কোথাও একটু গোলমাল আছে। তা বয়েস কম হল না; কিন্তু এখনও পাতাপেড়ে চুল বাঁধা। পানের রসে ঠোঁট লাল। কপালে কাঁচ পোকার টিপ। শাড়ি পড়ার ধরন। ঠিক মা বলে মনে হয় না। ভদ্রমহিলার কাছে যেতে মানস ভয় পায়। একদিন দুপুরে। সেদিন কেউ ছিল না বাড়িতে। শোওয়ার ঘরে খাটে বসে মানস একটা ঠুংরির মুখ গাইছিল, মহিলা বললেন, 'এক সময় ভালো নাচতে পারতুম। তুমি গাও আমি নাচি।' বলেই শাড়িটা খুলে গানের সঙ্গে নাচতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে। ওই শরীরের দিকে মানসের তাকাতে ভয় করছিল। একবার তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তার সারা শরীর সিরসির করছিল। মনে একটা বিষণ্ণ অন্ধকার নেমে আসছিল। তবু সে বসেছিল। গানও গাইছিল। হঠাৎ মহিলা একটা পাক মেরে দুম করে খাটে এসে পড়লেন, মানসের ঘাড়ে। ঘামঘাম শরীরে মানসকে কষকষে করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমার রাগকৃষ্ণ'। মুখে জর্দার গন্ধ। ভারি বুকের ওঠা-নামা। আবার গান ধরলেন, 'ও সে হোক না কালো, আমার তাকে ভালো লেগেছে।/ টেরি কাটা কালো ছোঁড়া আমায় পাগল করেছে।' সেই দেহভারে মানস উল্টে পড়ে গেল। ঘণ্টাখানেক ধরে কি ঝড় যে বয়ে গেল। সেই থেকে এই মহিলাকে দেখলেই মানস ভয় পেয়ে যায়। বল্টুদার বাবা চিররুগ্ণ। ব্রঙ্কাইটিসের রুগী। ইদানীং ভয়ংকর হাঁপানি। চোখ দুটো সব সময়ের জন্যে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আছে। লাল জবাফুলের মতো রঙ। কিন্তু মেয়ে দুটো কি সুন্দর। নিন্দুকে বলে মেয়ে দুটো এক জমিদারের। এমন এলোমেলো সংসার মানস আর দুটো দেখেনি। কোন গোছগাছ নেই। সবকিছু ছড়ানো ছত্রাকার। বল্টুদার মা বসে বসে কেবল হুকুম করে চলেছেন। এ বাড়ির অন্দরমহলে গেলে মানস বুঝতে পারে কোন্‌টা পাপের সংসার, কোন্‌টা পুণ্যের সংসার। সাধনা দিয়ে পুণ্যকে ধরে রাখতে হয়। তার বাবা মা বুড়ো দাদা, তার দু

বোন যেন হোমের আগুনে পুড়ছে সব। মানস এরপরেই জেনেছিল, এই ভদ্রমহিলা বল্টুদার সৎ মা।

উনুনটার দিকে তাকিয়ে বল্টু বললে, 'ওস্তাদ মেঘমল্লার গেয়ে তানসেন আগুন নেবাতেন। এসো আজ হয়ে যাক সেই পরীক্ষা। দেখি উনুনটাকে নেবানো যায় কি না!'

শুরু হল মেঘমল্লার। মানস হারমোনিয়ামটা টেনে নিল। শুরু হল আলাপ। বল্টুর গলা অসাধারণ, একেবারে বড়ে গোলাম আলির মতো। সুর একবার ধরে গেলে বল্টু একেবারে অন্য মানুষ। গান গেয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। উনুনে ছাই পড়ে এল। তানপুরা শুইয়ে বল্টু বললে, 'ওস্তাদ, মায়ের চরণে পেন্না টোকো। দেখ উনুন নিবিয়ে দিয়েছি। আমরা দ্বিতীয় তানসেন। মা কালীকে প্রণাম করে বল্টুদা বললেন, 'মা, এত লোক মরে, তুমি কেন মরো না মা। এখন তোমার ভোগের জন্যে আমাকে বেরোতে হবে। ওস্তাদ, টাকা কি করে রোজগার করতে হয় বলো তো! সব মুফতে গান শুনবে আর পিঠ চাপড়াবে। আর ডবকা মেয়েগুলোকে এগিয়ে দিয়ে বলবে, একটু সুর ধরিয়ে দাও। গুরুদক্ষিণা? অমনি গায়ের ওপর ঢলে পড়ল। পৃথিবীটা কি জায়গা মাইরি। ওস্তাদ, আজ একাদশী না?'

'ঠিক জানি না বল্টুদা।'

'হ্যাঁ, আজ একাদশী। সকালে ষষ্ঠী বুড়ি কোঁত পাড়ছিল।'

'ষষ্ঠী বুড়ি?'

'ওই যে সামনের বাড়িতে থাকে রে! বাতের রুগী।'

বল্টুদা মা কালীর দিকে ফিরে বললে, 'মা আজ তোমার নির্জলা একাদশী। শিব কি আর তোমার ভারে জ্যান্ত আছে মা, কবেই হার্টফেল করেছে। আর কেন? এইবার একাদশীটা ধরো। কচি পাঁঠাগুলো একটু প্রাণে বাঁচুক।' বল্টু উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উঠে পড়ল ধড়মড় করে। বল্টু তার মাথায় তিনটে তেহাই মেরে বললে, 'কাল রাতে তোকে মাংস খিলিয়েছি ব্যাটা। আজ স্বাস্থ্যের কারণে নো মিল।'

মানস বললে, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'পালিয়ে বাঁচি ওস্তাদ। একটু পরেই হোল ফ্যামিলির খিদে পাবে, তখন আর একবার কীর্তন শুরু হবে। তার আগেই পালাই। বল্টু যেন শালা সকলকে গেলাবার দাদন নিয়ে বসে আছ।'

ট্রাউজারের ওপর ঝলঝলে একটা শার্ট গলিয়ে নিল বল্টু। মানস জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবেন আজকে?'

'আগে একটু হাওয়া খাই, তারপর দেখা যাবে। আরে জল-হাওয়ার মতো জিনিস আছে!'

'আমাদের বাড়িতে চলুন।'

'শোনো ওস্তাদ, খালি পেটে কোথাও যেতে নেই। নিজেকে ভিকিরি মনে হবে। আমরা হলুম রাজার জাত।'

'ওস্তাদ আজ তোমার লাঞ্চের কি ব্যবস্থা! বাড়িতে আছো, না গলাধাক্কা খেয়েছো?'

মানস উঠে পড়ল। বল্টু বলল, 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে, বেশ দলাইমলাই হয়েছে।'

মানস বললে, 'আজ আমার রূপালিদের বাড়ি নেমন্তন্ন।'

'সেই কারখানাঅলার মেয়েটা? তা ভালো। কেস কতদূর এগলো?'

'কি কিসে?'

'আরে স্যুটকেস।'

বল্টু একলাফে রাস্তায়। কুকুরটাও লাফ মারলো।

মানস আর ভেতরে গেল না। উঠোনে রোদে বসে বল্টুদার দুই বোন কাপড়জামা কাচছে। গেলেই সব ছেঁকে ধরবে। মজার মজার গল্প শুনতে চাইবে। আজ মেজাজ ভাল নেই। পিঠটা টাটাচ্ছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। এই সময় কারোর বাড়িতেও যাওয়া উচিত নয়। সব বাড়িতেই এখন খাওয়ার সময়। গেলেই জোর করে খাইয়ে দেবে।

মানস একটা চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খেল। বাড়ির দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। জানে কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা আসে। বাবার হারমোনিয়ামের আওয়াজটা এত সুন্দর যে লোভ সামলানো যায় না। আর ও কোনও দিন হাত দেবে না। প্রতিজ্ঞা। আচ্ছা, বাবা কি তাকে হিংসে করেন? তা কখনো হয়! কোনও বাবা কোনও ছেলেকে হিংসে করতে পারেন? তাহলে? বোনেদের ডেকে ডেকে গান শেখান, আর তাকে দূর দূর করেন। কই ছাত্রছাত্রীদেরও তো বিশেষ কিছু দেন না! যক্ষের মতো নিজের সম্পদ, নিজের মধ্যেই আগলে রাখতে চান না কী?

মানস বাস স্টপে এসে একটা বাসে উঠে পড়ল। মাথায় এসে গেছে,

কোথায় সে যাবে। ভবানীপুরের গুরদোয়ারায়। সেখানে তার খুব খাতির। অল্প অল্প পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারে, আর কয়েকশো ভজন সে তো জানেই। রাত ন'টা অব্দি তার আর কোনও ভাবনা নেই। তারপর দেখা যাবে। পরের কথা পরে। নিজের বাড়িতে ঢুকলেই একটা-না-একটা অশান্তি। তার জন্যে আজ বাড়িসুদ্ধু লোকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একা মনে হয়। কেউ যদি তাকে একটু ভালবাসতো! সবাই থেকেও তার যেন কেউ নেই! বাবার ভয়ে বাড়ির কেউ তাকে ভালবাসতে সাহস পায় না। সে কি এতই খারাপ ছেলে!

বাস কিছুদূর এগোতেই মানস সব ভুলে গেল। অনেক লোক তার ভীষণ ভাল লাগে। কত রকমের মুখ! কত কথা! একা একা ভাবটা বেশ কেটে যায়! রাস্তা, ফুটপাত, দু'পাশে দোকান। পৃথিবীটা আনন্দে যেন টগবগ করে ফুটছে! বেঁচে থাকতে ভীষণ ভাল লাগে; কিন্তু কাল কি হবে, এই ভেবে আপনার লোকেরা ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। ওরে তোর কাল কি হবে! বাবা চোখ বোজালে তুই কি করবি রে? বোনের বিয়ে, মায়ের ভরণপোষণ। পাওনাদার, ট্যাক্স। তারপর যদি নিজে সংসার করো তাহলে তো হয়েই গেল। মানস বুঝতে পারে না, মানুষ এত ভাবে কেন? ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবনার কি আছে! চলতে চলতেই তো ভবিষ্যৎটা বর্তমান হয়ে জীবন ছেয়ে অতীতে চলে যায়। আজ খুব রোদ, কাল খুব ঝড়বৃষ্টি। দুটো দিনই মানুষকে পেরোতে হবে। মানুষ আর পেরোয় কই, দিনই চলে যায় মানুষকে পেরিয়ে। যারা সব সময় প্ল্যান বদলে নিয়ে বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্টারের মতো চলে তারাই সারাটা জীবন হল না,-হল না আর গেলো গেলো করে। 'গান গেয়ে মোর দিন কেটে যায় বিরহের বালুচরে।' মানস অন্যমনস্কভাবে একটু জোরেই গেয়ে উঠেছিল। বসে থাকা পাশের ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। মানস তার সেই অনিন্দ্য হাসি হেসে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, লিক করেছে।'

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, 'গলাটা তোমার খুব ভাল। সুর ভরাট। সাধনা করো। জাতের গলা। আমার নাম যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। নামটা শুনেছ নিশ্চয়!'

মানস তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে প্রণাম করল। পুরাতনী বাংলা গান আর টপ্পায় ভীষণ নাম। ফরসা ধবধবে চেহারা। ঋষির মতো মুখ। হলুদ

দেয়ালের গায়ে রোদের আভার মতো এক ঝলক হাসি লেগে আছে। নিমেষে আলাপ জমে গেল। মানসের বাবার নাম শুনে যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'খুব চিনি! মেজাজটা যদি একটু সংযত করতে পারত, তাহলে ও তো আজ ভারতের শীর্ষস্থানে চলে যেতে পারত। যেখানে মানুষ নিয়ে কারবার সেখানে মানুষকে মানুষ ভাবতে হবে। কত রকমে মানুষ! সব মানুষকে নিয়েই চলতে হবে। লোক না পোক ভাবলে সাধুর চলবে। শিল্পীর চলবে না। অত শিক্ষা নিয়ে তাই বেচারা আজ একঘরে। তুমি বাবা ওরকম হয়ো না।'

মানস বললে, 'জ্যাঠামশাই, একদিন আপনার বাড়িতে যাবো।'

'তোমার জন্যে আমার অবারিত দ্বার। শোনো বাবা, শুধু শ্রুতিতে হবে না, শাস্ত্রও চাই। সংগীত শাস্ত্র একটু পড়বে। বেস চাই, বেস। গুরুরও খুব প্রয়োজন। সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা।'

গুরদোয়ারায় আজ একটা কিছু আছে। খুব ভিড়। শিখ মেয়েরা দামি দামি শালোয়ার কামিজ পরে জায়গাটাকে যেন আলো করে রেখেছে। পাঞ্জাবিদের মধ্যে হাঁড়ি চড়ে না, এমন সংসার নেই বললেই চলে। যেমন সব সাজ, তেমনি সব চেহারা। মানসও বেশ লম্বা, তাই মানিয়ে যায়। পথে পথে ঘোরে, খাওয়াদাওয়ার ঠিক নেই; কিন্তু মুখে অদ্ভুত এক লালিত্য। মনে পাপ না ঢুকলে মানুষের মুখে একটা দেবভাব আসে।

গেলাসে গেলাসে সরবত বিলি হচ্ছে। মানসকে দেখেই কি আনন্দ সকলের, 'আইয়ে আইয়ে মানসজী, ওস্তাদজী।' ঢলঢলে সুন্দরী এক মহিলা, মানসের হাতে এক গেলাস সরবত তুলে দিলেন। ফরসা শরীরে গাঢ় নীল রঙের কামিজ। মানস না তাকিয়ে পারল না। তার মেজ বোন শোভনাটাকেও এই রকমই প্রায় দেখতে। তাকে যদি এইরকম একটা পোশাক পরানো যেত!

মানস বুঝতেই পারলো, আজ এখানে আসরে বসাতে হবে। খাওয়াটা হবে জবরদস্ত। ভেতরে ভজন চলেছে। মানসের কানে সুর লেগে গেল। ভেতরে তার একটা সুরের মৌচাক আছে। খোঁচা লাগলেই গানের মাছি ভোঁ ভোঁ করে উড়তে থাকে।

মানস সোজা আসরে গিয়ে বসে পড়ল। পুরু, বাহারি কার্পেট পাতা। একজন মানসের গলায় একটা চাদর পরিয়ে দিলেন। খুব খাতির মানসের।

এমন খাতির মানসকে নিজের লোকেরা করে না। মানসজী এইবার ভজন পরিবেশন করবেন।

প্রথমেই মানস কাফিতে ধরল, 'সাধো গোবিন্দকে গুণ গাবো।/মানব জনম অমোলক পায়ো, বিরথা কাহে গঁবাবো।' নানকের ভজন। শঙ্করও এই ভজনটা করেন। মানস তার সাধা গলায় একেবারে পশ্চিমা ওস্তাদের ঢঙে গাইছে। পঙ্গত একেবারে ভরে গেছে। যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁরা সব ভেতরে চলে এসেছেন; যেন পাঞ্চাল-সভা। গানে বসলেই মানস গানটাকে দেখতে পায়। সেই কতকাল আগের ভারত। কম আলো, কম শব্দ, কম লোক। মোগল আমলের ঘর, বাড়ি, জাফরি। গালিব, সুরদাস, গোবিন্দ সিংজী, নানক, মীরাবাঈ, কবীর। পঞ্চনদ। নানাসায়েব আপন মনে গাইছেন, 'পতিত পুনীত দীনবান্ধব হরি, শরণ তাহি তুম আবো।' মানসের চোখে জল। গাল বেয়ে গড়াচ্ছে। মানসের চোখ দুটো বংশের ধারা অনুসারে বিশাল বড় বড়। আর চোখের পাতাগুলো যেন ছায়া দিয়ে ঘিরে রাখে। কুঞ্জছায়ে দুটি সরোবার। শ্রোতারা সব আসনে আটকে গেছেন। প্রবীণাদের চোখ ছলছল করছে। প্রবীণরা মালা জপছেন। কেউ, 'আয়, আয়' বলছেন। মানস গাইছে, 'তাজ অভিমান মোহনায়া পুনী ভজন রাম চিতলবো।/নানক কহত মুক্তি পথ এহী,/গুরুমুখ হোয় তুম পাবো।।' ঢোল আর তবলা একসঙ্গে বাজছে কাহার্বা তালে।

এরপরই মানস শুরু করল কবীরের ভজন। 'মেরী মেরী দুনিয়াঁ করতে মোহ মছর তন ধরতে।' শঙ্কর ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, 'মানে বুঝে গান গাইবে, আর যে ভাষার গান, সেই ভাষার উচ্চারণ যেন শুদ্ধ হয়।' মানস সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চলে। যদিও সেই উপদেশ তার জন্যে নয়। মানস গাইছে আর গানের অর্থ তার মনে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। যেমন জামা ঝোলাবার হ্যাঙারের মার তার পিঠে কেটে কেটে বসেছিল। দুনিয়া আমার আমার করে। মোহ-মাৎসর্যে জীবন কাটায় মানুষ। পূর্বে যাঁরা মুখ্য পীর হয়েছেন তাঁরাও এই করতে করতেই চলে গেছেন। 'কিসকী মমাঁ চচা পুঁনি কিসকা, কিসসা পংগুড়া জোঈ।' কারো মামা, কারো বা কাকা, কারো পঙ্গু স্ত্রী। এই তো সংসার! এই সংসার একটা বাজার, মণ্ডী। এ রহস্য জানতে পারে এমন ব্যক্তি দুর্লভ। আমি বিদেশী। কাকেই বা ডাকব। এখানে আমার কেউ নেই।

শ্রোতারা সব হায় হায় করতে লাগলেন। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি। মানসের গলা একেবারে ঝনঝন করছে। এইসব ভজনে সে নিজেই সুর আর তাল বসিয়েছে। মানস গানের নোটেশন করাও শিখে গেছে। সবাই বলে, সে নাকি একটা প্রতিভা। এতে মানসের কোনও অহঙ্কার নেই। প্রতিভা আবার কাকে বলে!

রাত নটার সময় মানস যখন গুরদোয়ারা থেকে বেরিয়ে এল তার পকেটে তখন তিনশো টাকা। শ্রোতাদের স্নেহের দান। পাঞ্জাবীখানায় পেট ভরপুর। আজ আর বাড়ি ফিরবে না মানস। বাড়ি আর তাকে টানে না। বাইরে কত ভালবাসা! বাড়ির অবস্থা সে দেখতে পাচ্ছে। নিচের ঘরে পঁচিশ পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। চটা ওঠা উঠোন। খোলা নর্দমার গন্ধ। মশা। বুড়োদাদা তাঁর বিশাল সিন্দুকটাকে বেদী করে, তার ওপর বসে আছেন ধ্যানে। ওপরের সবচেয়ে ভাল ঘরটায় কার্পেটের ওপর বসে আছেন বাবা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। হয় লিখছেন, না হয় গানে সুর করছেন। উপোসে মুখ শুকনো। কারো সঙ্গে কোনও কথা নেই। তার পাশের ঘরে মা আর দুই বোন। বোন দুটো পড়ছে। রান্নাঘরে শিকল তোলা। বাড়ি নিস্তব্ধ। উঠোন থেকে সোজা উঠে গেছে বেঁটে জাতের এক নারকেল গাছ। রাতের বাতাসে পাতার ঝালর হিল হিল করে দুলছে। যেন কিছু একটা খুঁজছে।

আকাশের পশ্চিম কোণে বিশাল একখণ্ড মেঘ উঠেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের দেঁতো হাসি। বাতাসে ঠাণ্ডার সিরসিরানি। অল্প দূরেই মামার বাড়ি। মানস যখন মামার বাড়ি পৌঁছলো তখন সাড়ে নটা, পৌনে দশটা। মামার বাড়ি এক মজার বাড়ি। সাবেক কালের বনেদী বংশ। দাদু ছিলেন সুপণ্ডিত প্রধান শিক্ষক। পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন দোতলার ঘরে। দিদিমা কানে কিছুই শোনেন না। একমাত্র মামা, ভীষণ ভালো মানুষ, কিন্তু সাংঘাতিক ভুলো মন। আবার ঢেঁকুরের রুগী। যেই সূর্য ডুবলো, শুরু হল ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর তোলা। আর মামা অমনি, 'নাঃ পেটে গ্যাস হয়ে গেছে, গ্যাস হয়ে গেছে', বলতে বলতে সারা বাড়ি ঘুরবেন আর ঢেঁকুর তুলবেন। ঠিক যেন বাছুর ডাকছে! রাস্তার মোড় থেকে শোনা যাবে সেই শব্দ। বাড়ির বাইরে মার্বেল ফলকে লেখা আছে, 'নিকুঞ্জ নিবাস'। পাড়ার লোকে বলে উদগারালায়। একমাত্র মাসিমা। খুবই সুন্দরী, কিন্তু মাথার গোলমাল।

সবসময় নয়। শুক্লপক্ষে বাড়ে। চাঁদ যত বড় হতে থাকে মাথা তত ঢিলে হতে থাকে। পূর্ণিমায় একেবারে পূর্ণ উন্মাদ। পাগলামির একটাই লক্ষণ, দু'চার কথা বলেই বলবেন, 'আচ্ছা, আমার চোখের নিচে কি কালি পড়েছে?' যেই বলবে, 'না, কই কালি পড়েনি তো!' অমনি বলবেন, 'তা হলে আয়নায় একবার দেখে আসি।' সেই যে আয়নার সামনে বসলেন, শুরু হল ঘষাঘষি। বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িও খুব ভালো। মাসি মেসোকেও পাগল করে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। তিনি দু'চার কথার পরই প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা আমার কি ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে!' তারপর নিজেই বলবেন, 'একটু মনে হয় হচ্ছে! যাই বেল্ট বেঁধে আসি।' শ'খানেক বেল্ট কেনা হয়ে গেছে। কেউ বিদেশ গেলেই বলবেন, 'আমার জন্যে ভালো দেখে একটা বেল্ট এনো তো।'

মানস ঢুকেই মামার মুখোমুখি হল। তিনি তখন একটা ঢেঁকুর তোলার কসরত করছিলেন। মানসকে দেখেই উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই জায়গাটার নাম কি রে?'

'কোন্ জায়গাটা?'

'ওই যে রে যেখানে বরফের একটা কি হয়!'

'আইসক্রিম?'

'ধুর, আইসক্রিম তো খায়! এ হল পুজো করার জিনিস! শিবলিঙ্গ রে! বরফের বিশাল শিবলিঙ্গ। তীর্থস্থান।'

'ও, তুমি অমরনাথের কথা বলছো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমরনাথ। উঃ, ভাগ্যিস তুই এলি! নামটা এমন আটকান আটকে গিয়েছিল মেমারিতে। ভাল করে ঢেঁকুর তুলতে পারছিলুম না। সেই সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র দশটা ঢেঁকুর কোনও মতে উঠেছে।'

'কটা ওঠার কথা?'

'তা শ'খানেক তো বটেই।'

কথা শেষ করেই তিনি পরপর গোটা আষ্টেক ঢেঁকুর তুললেন। রাগমালার মতো ঢেঁকুরমালা।

মানস বললে, 'এই তো, চ্যানেল খুলে গেছে। আঠারটা হয়ে গেল।'

'ভাবতে পারিস কি হার্ড টাস্ক, রাত বারোটার মধ্যে আরো বিরাশিটা তুলতে হবে! এ কি তোর ফুল তোলা, না চুল তোলা!'

দোতলার বারান্দা থেকে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এল রে এত রাতে?'

মামা বললেন, 'মানস'।

দিদিমা শুনতে পেলেন না। বললেন, 'এখনও কিচ্ছু খালি করা হয়নি, বলে দে কাল সকালে আসতে।'

মামা মানসকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বললে বল তো?'

'ও কিছু না।'

মামা দর্শনের অধ্যাপক। তিনি সহজে ছাড়বেন কেন? তিনি বললেন, 'কিছু না বলে কিছু নেই। কিছু আছে, তবেই না কিছু নেই? কিছুই না থাকলে কিছু না থাকার কথাটা আসে কি করে? অবশ্যই কিছু আছে। তা হলে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস আছে, যা সত্যিই নেই। হ্যাঁ আছে বলেই না না। না শব্দটা আগে না হ্যাঁ শব্দটা আগে! আমি—যখন আছি, তখন সব আছে। আমি যখন নেই তখন কিছুই নেই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে—মৃত্যুতেই নেই। তার মানে মৃত্যু নেই। তাহলে প্রকৃত না-থাকাটা কি ? বলো কি?'

'মৃত্যু।'

'সে তো তোমার মৃত্যু। তোমার মৃত্যুর পরেও তো অনেক রয়ে গেল।'

'আমি নেই তো কেউ নেই।'

'আহা, মামার বাড়ি আর কি? তুই নেই তো কি হয়েছে? অন্যের স্মৃতিতে তো তুই আছিস। মানস ছিল বলেই না মানস নেই।'

'তাহলে কি হবে?'

'সেইটাই তো এক সমস্যা! পৃথিবীটা যে কি সমস্যার জায়গা! কিছুই ভাল লাগে না। এ ভাবে বাঁচা যায়!'

'তুমি অত ভাবছ কেন?'

'কি আশ্চর্য! ভাববো না? না ভেবে মানুষ বাঁচতে পারে? আমি গরু না ছাগল!'

মামা আবার পরপর ছ'সাতটা ঢেঁকুর তুললেন। আর ঠিক সেই সময় মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সেজেগুজে। মানসকে দেখে বললেন, 'মালা এনেছিস। মালা?'

'মালা? মালা কি হবে?'

'ওমা! তাও জানিস না বুঝি? আজ যে আমার বিবাহবার্ষিকী!'

মামা বলতে লাগলেন, 'স্যাড, ভেরি স্যাড, ভেরি ভেরি স্যাড।'

মাসিমা এরপরেই চলে এলেন তাঁর আসল জায়গায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার চোখের তলায় কালি আছে?'

মানস কিছু বলার আগেই, মামা বলে দিলেন, 'হ্যাঁ, একটু যেন কালেচ কালচে লাগছে।'

মাসিমা অমনি চিৎকার করে বললেন, 'চোপ। তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। তুমি রুগি। তুমি একটা আধপাগলা বুড়ো। মানস তুই বল তো।'

মানস বলে, 'একটু যেন কালো কালো লাগছে।'

'যাই বাবা, তাহলে ভাল করে আর একটু ঘষি।'

মাসিমা আবার তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মামা তখনও সমানে বলে চলেছেন, 'স্যাড। ভেরি স্যাড।'

মানস দোতলায় চলে গেল। বিশাল বড় ঘরে বিশাল এক খাটে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ দাদু। শরীরটা পড়ে গেলেও, বোধবুদ্ধি, স্মৃতি সবই প্রখর। কথা বলে, তবে একটু জড়িয়ে যায়। দিদিমা বললেন, 'ও মা তুই এসেছিস! ওপর থেকে আজকাল আর ঠিক ঠাহর করতে পারি না। চোখ দুটো একেবারে গেছে। সব কিছু যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে দেখছি। তা বল, সব কে কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

বৃদ্ধা কি বুঝলেন কে জানে। বেশ জোরে বললেন, 'সে কি রে?'

দাদু বিছানা থেকে বললেন, 'কে এল মানস?'

মানস খাটের ধারে গিয়ে বসল। বৃদ্ধের অবশ শরীর এলিয়ে আছে। ওষুধের গন্ধ। বেডসোর হয়ে যাবার ভয়ে শরীরে ওষুধ লাগানো হয। বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ রে! লেখাপড়াটা একেবারে ছেড়ে দিলি? আমাদের বংশে যে ওইটাই ছিল রে!'

'আমার যে গান ভীষণ ভালো লাগে।'

'আহা! তোর বাবা তো গান আর লেখাপড়া দুটোই একসঙ্গে রেখেছিলেন।'

'আমিও তো পড়ছি।'

'হ্যাঁ দাদু ওটা ছেড় না। শিক্ষা ছাড়া মানুষের পশুত্ব ঘোচে না।'

হঠাৎ মাসিমা এলেন ঘরে। খাটের কাছে এসে বাবাকে বললেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। যখনই দেখছি তখনই শুয়ে আছে। এত শুয়ে থাকলে যে বাতে ধরবে।'

পেছন পেছন মামা এলেন, ঢেঁকুর তুলতে তুলতে। ঢুকেই বললেন, 'আমার পক্ষে আর ওই টিমকে সাপোর্ট কর অসম্ভব হচ্ছে না। মোহনবাগান আজও দু গোলে হেরেছে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলতে গেলেই যে ওদের কি হয়! কাল আমি পাড়ায় মুখ দেখাবো কি করে?

দিদিমা বললেন, 'হ্যাঁ রে ওষুধ এনেছিস!'

মামা চমকে উঠে বললেন, 'ওষুধ? কার ওষুধ? কিসের ওষুধ?' তারপর দু'হাতে মাথা চাবড়ে বললেন, 'সর্বনাশ! প্রেসক্রিপসানটা তো ধোপার বাড়ি চলে গেল, জামাকাপড়ের সঙ্গে।' সারা ঘরে ঘুরতে শুরু করলেন, একটা করে ঢেঁকুর তোলেন, আর কপালের কাছে টুসকি মেরে বলেন, 'কি যেন নাম ছিল ওষুধটার! আহা! লার, লার, মনে আসছে মুখে আসছে না।'

দিদিমা বললেন, 'কি করছে বল তো, নামসংকীর্তন! এত ভক্তি এল কোথা থেকে?'

দাদু বললেন, 'কেমন বুঝছিস দাদু! এর নাম সংসার! বেঁধে মারছেন। বুঝতে পারি না, আমার পাপটা কি? সারাটা জীবন সাত্ত্বিকভাবে কাটিয়ে, শেষটায় আমার এ কি হল? দাদুভাই একটা গান শোনা তো। এমন গান যেন একটু কাঁদতে পারি। ভাল করে কাঁদতে পারলে তাড়াতাড়ি মুক্তি হয়।'

মানস খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামটা টেনে বের করল। এই বাড়িটাও কি হয়ে গেল, কি সুন্দর ছিল।

দাদু বললেন, 'গোপাল, তুই যদি এইভাবে ঢেঁকুর তুলিস গান হবে কি করে?'

মামা বললেন, 'গান আরম্ভ হলেই থেমে যাবে।'

মাসিমা বললেন, 'ও গান হবে বুঝি! তাহলে একটু সেন্ট মেখে আসি।'

মানসের মনে তখনো কবীর ঘুরছেন। দাদু বললেন, 'যদি হিন্দি ধরিস

তাহলে আমাকে মানেটা একটু ধরিয়ে দিস।'

মানসের কানে হারমোনিয়মের সুর ঢুকলেই, সে আর কারোর নয়। পুরোপুরি একজন শিল্পী। তখন তার মুখচোখের চেহারাই আলাদা। মানস এক পাল্টা দ্রুত হারমোনিয়াম বাজিয়ে সুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'গানটার মানে আমি আগেই বলে দি—'চার দিন অপনী নৌবতি চলে বজাই।' তার মানে চার দিন আপনার নহবত বাজিয়ে চলল। 'উতানেঁ খটিয়া গড়িলে মটিয়া সংগি ন কুছ লৈ জাই।' এমন কাটিয়া তৈরি করলে তাও ঢেকে দিলে মাটি দিয়ে, সঙ্গে কোন কিছু নিয়ে যেতে পারলে না। 'দেহরী বৈঠী মেহরী রোবৈ দ্বারৈ লগি সগী মাই।' দেহরী মানে দাওয়া পর্যন্ত স্ত্রী যাবে কাঁদতে কাঁদতে, দরজা পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে যাবে নিজের মা। 'মরহট লৌঁ সব লোগ কুটুম্ব মিলি হংস অকেলা জাই।।' সব কুটুম্ব সজ্জন মিলে শ্মশানে গেল; কিন্তু হংস চলে গেল একলা।

মানস এইবার গানের শেষ দুটি লাইন ভৈরবীতে ধরে ফেলল আর ধৈর্য রাখতে পারল না ব্যাখ্যার—'বহি সুত, বহি বিত, বহি, বহি পুর পাটন বহুরি ন দেখৈ আই। /কহ কবীর ভজন বিন বন্দে জনম অকারথ যাই।।' এক ফাঁকে থেমে মানেটা বলে দিল—সেই পুত্র, সেই বিত্ত, সেই ঘরদোর কিছুই আর ফিরে এসে দেখে না। কবীর বলছেন, ওরে বান্দা, ভজন বিনা বৃথা জন্ম গেল।

জীবনের সেরা গান মানস সেদিন গাইল। পাগলী মাসি সেও কেঁদে ফেলল। মামার ঢেঁকুর বন্ধ। দিদিমা ভাল শুনতে না পেলেও কিছুটা তাঁর কানে গেল। দাদু একেবারে নির্বাক। দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

গান শেষ হবার পর মানসকে কাছে ডেকে বৃদ্ধ বললেন, 'আমার হাত দুটো অচল না হলে তোমাকে আমি বক্ষুকে জড়িয়ে ধরতুম। গান তোমার ভেতরেই আছে। তুমি নিয়ে এসেছ। তুমি দিয়ে যাও। সাবধান! একটু ধর্ম দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখো। সুরের দেবলোক আর অসুরের ভোগলোকের চৌকাঠটা বড় সরু।'

মাসিমা হঠাৎ বললেন, 'এটা মনে হয় জন্মদিনের গান নয়, মৃত্যুদিনের গান। আমি যে কেঁদে ফেলেছি। হ্যাঁ রে, চোখের কোলের কালি কি আবার বেরিয়ে পড়েছে?'

মানস যখন গুরদোয়ারার শ্রোতাদের মাতাচ্ছিল, সেইসময় তার বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সন্ধে সাতটা নাগাদ ঝকঝকে নতুন একটা গাড়ি তাদের বাড়ির সামনে থামল। নেমে এলেন প্রায় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল। পরনে ধপধপে সাদা খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি। দেখলেই মনে হয় কংগ্রেসের কোনও চাঁই। ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ দাস। রূপালির বাবা। শিল্পপতি। পায়ে মশমশে জুতো।

ঢুকেই তিনি খুব জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলেন।

উৎকট কড়া নাড়ার শব্দ শঙ্কর ভীষণ অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, কড়া নাড়া, জিনিসপত্র রাখা, হাঁটাচলা, হাত-পা নাড়া, কুলকুচো করার ধরন দেখে মানুষ চেনা যায়। সংস্কৃতিবান মানুষের আচার-আচরণ অত্যন্ত সুললিত হয়। ভদ্রলোক যখন কড়া নাড়ছিলেন, শঙ্কর সেই সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানিপ্ল্যান্ট ঠিক করছিলেন।

মুখ ঝুলিয়ে এক দাবড়ানি দিলেন, 'ইডিয়েটটা কে?'

ভদ্রলোক একটু পেছিয়ে গিয়ে বারান্দার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'ইডিয়েটের নাম সুরজিৎ দাস।' এই তল্লাটের সবাই এই নামের সঙ্গে পরিচিত। খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই অঞ্চলে যা জায়গাজমি ছিল, প্রায় সবই কিনে ফেলেছেন। জমিদারদের যুগ শেষ, শুরু হয়েছে শিল্পপতিদের খেলা। এক পা শিল্পে আর এক পা রাজনীতিতে। শিল্পের গাড়ির স্টিয়ারিং হল রাজনীতি। একেই বলে দেশটাকে কব্জা করা। মাখন খাওয়া। স্বাধীনতার আগে সব রোগাপটকা ছিল। এখন নধরকান্তি। মসৃণ ভাগলপুরী গরু। এই সুরজিৎ এক সময় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত। সংসারে হাঁড়ি চড়ত না। এখন এই পাড়ায় তার পাঁচতলা বাড়ির ছাদের মিনার সারারাত বাতিঘরের মতো জ্বলে থাকে। একতলায় উমেদারের ভিড়। দোতলায় নেতাদের মজলিশ। তিনতলায় আমোদপ্রমোদ। চারতলায় বসবাস। পাঁচতলায় নির্জনবাস। এই সুরজিৎ দাস এখন পাড়ায় সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যান। শিক্ষিত, পণ্ডিত, অধ্যাপকদেরও স্যার। থানার ওসি স্যালুট

করেন। যে যাই করুক, শঙ্কর ভদ্রলোককে পাত্তা দেন না। শঙ্করের বাবা দেখা হলেই বলেন, লোহাকাটা দাস। সুরজিৎ বিরক্ত হলেও বলেন না কিছু; কারণ শঙ্করের বাবা একসময় তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রেল কোম্পানিতে একটা চাকরিও করে দিয়েছিলেন।

শঙ্কর বলেছিলেন, 'তুমি? হঠাৎ কি মনে করে? এস ওপরে এস।'

সুরজিৎ মশমশ করে ওপরে এল। জুতো পরেই ঢুকছিল। শঙ্কর বললেন, 'জুতো ছেড়ে এস।'

সুরজিত কার্পেটের ওপর বসল। শঙ্কর দেখছেন আর বাবছেন—কি ছিল, আর কি হয়েছে! বিরাট শরীর। ভারিক্কি মুখ। নেতাদের তো কাঁচাপাকা চুল। বিশ বছর আগের সুরজিৎ! সুরজিৎ ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবছে—অবস্থা পড়ে এসেছে। আর সে দিন নেই, সে দাপট নেই। থাকার মধ্যে মেজাজটাই আছে। বাঘের আর দাঁত নেই, ডাকটাই আছে। সরস্বতী আর কি দেবেন! দেনেঅলা তো লক্ষ্মী! আমার ফ্যাকট্রির নাম তাই, লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিজ। ইঞ্জিনিয়ারদের আমি চাকরি দি। চাকরির সুপারিশ করে মন্ত্রীর আমার কাছে তাদের আত্মীয়দের পাঠায়। আমি বোর্ডে বসে ইন্টারভিউ নি। সুরজিতের মনে হল, সে কারোর মৃত্যুশয্যার পাশে এসে বসেছে। বনেদিয়ানার মৃত্যু। পথে যারা ছিল তারা ওপরে উঠছে। ওপরে যারা ছিল তারা পথে নামছে।

শঙ্কর যেন ধ্যানাসনে বসেছেন। বেশ বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, 'বলো কি বলবে?'

সুরজিৎ বললে, 'মেয়ের বিয়ে দোব।'

'দেবে, দেবে, তার আমি কি করবো?'

'তুমি অনুমতি দেবে।'

শঙ্কর একটু অবাক হলেন। ভেতরে ভেতরে একটু নরমও হলেন। এত শ্রদ্ধা এত ভক্তি।! একমাত্র মেয়ে। এক সময় গান শিখতে আসত শঙ্করের কাছে। দেখতে শুনতেও ভাল। বেশ একটা সংস্কৃতির ছাপ আছে। লোহাকাটার মেয়ে বলে মনেই হয় না।

শঙ্কর বললেন, 'আমার অনুমতির জন্যে কাজ আটকে আছে?'

'অবশ্যই। বিয়ে তো হবে তোমার ছেলের সঙ্গে!'

শঙ্কর যেন স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠলেন, 'আমার ছেলের

সঙ্গে! মানসের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আর তো কোনও উপায় নেই। মেলামেশাটা এমন জায়গায় চলে গেছে যে এর বাইরে আর কিছু ভাবা যায় না।'

'তার মানে?'

'মানে প্রেম। দু'জনে দু'জনের প্রেমে পড়েছে।'

'সে আবার কি?'

'লাভ। আমার মেয়ে তোমার ছেলেকে ছাড়া আর কারোকে বিয়ে করবে না। আর তোমার ছেলেরও ওই একই ব্যাপার।'

'আচ্ছা! তাহলে কাল সকালেই আমার প্রথম কাজ ওই প্রেমিকটির পেছন কঁ্যাত করে একটা লাথি মেরে বিদায় করা; তারপর তুমি যা পার তাই কোরো। একটা জাতের বিচারও তো আছে।'

'এখনও জাতের বিচার? জাত বলে কিছু নেই। তুমি না প্রগতিবাদী?'

'জাত আছে। যাক সেটা বাদ দিলেও, বংশ থাকে।'

'পুরুষে পুরুষে বংশ বদলায়। আমাদের এখন উঠতি, তোমাদের পড়তি। পূর্বপুরুষের তালপুকুরে এ-পুরুষের ঘটি ডোবে না।'

শঙ্করের ফর্সা মুখ লাল জবার মতো হয়ে গেল। একবার মনে করলেন লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন, 'এই পড়তি বংশের, বেকার, অপদার্থ একটা ছেলের সঙ্গে তোমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?'

'সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীকে মেলাবো বলে। মায়ের কৃপায় আমার অর্থের অভাব নেই। একটা বাড়ি, একটা গাড়ি, কয়েক লাখ টাকা আমার কাছে কিছুই নয়। ছেলেটার ভেতর অসাধারণ প্রতিভা। আমার মনে হয়, ও তোমার চেয়ে বড় হবে। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি কিছুই করতে পারলে না; আর ও কিছু করুক সেটাও তুমি চাইলে না।'

শঙ্কর এবার লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'গেট আউট। তুমি আমার ছেলে কিনতে এসেছ?'

'কিনতে না পারি, কুড়িয়ে নোবো। তোমরা তো ফেলেই দিয়েছ। পথে পথেই তো ঘোরে। তোমাকে শুধু জানিয়ে গেলুম।'

সুরজিৎ মশমশ করে বেরিয়ে গেলেন। দামী গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ হল। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে যেই চলে গেল শঙ্করের মনে হল শব্দটা তার

ভেতরেই হল। এক ট্যাঙ্ক পেট্রলে আগুন ধরে গেছে। প্রথমেই একটান মেরে বারান্দায় এতক্ষণ ধরে সাজানো সমস্ত মানিপ্ল্যান্ট পটাপট টান মেরে ছিঁড়ে ফেললেন। পাশেই একটা গোলাপফুলের টব ছিল। একটানে গাছটাকে উপড়ে দিলেন। তা'তেও মন শান্ত হল না। ঘরে ঢুকে দেয়াল থেকে নিজের ছবিটা টেনে নামালেন। প্রয়াগসঙ্গীত সম্মেলনে গান গাইবার সময় ছবিটা তোলা হয়েছিল। সুন্দর ছবি। শঙ্কর তখন খ্যাতির তুঙ্গে। ভারত জুড়ে সমালোচকরা তখন বাহবা, বাহবা করছেন। সেই বাঁধানো ছবিটা শঙ্কর দোতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন একতলায়। কাঁচ চুরমার হয়ে যাবার শব্দ হল।

সুধা ছুটে এলেন। মেয়ে দুটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিছু দূরে। বাবা যখন এইরকম মূর্তি ধরেন, তখন তারা ভয় পায় কাছে আসতে। শঙ্করের সারা শরীর কাঁপছে। সুধা স্বামীকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে খুবই নরম গলায় বললেন, 'ছি ছি, এসব কি হচ্ছে?'

এই 'ছি ছি' শব্দে আগুনে যেন ঘি পড়ল। সুধার শরীরে শঙ্করের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা। প্রায় সমান লম্বা। শঙ্কর সেই তুলনায় ছিপছিপে। গতকয়েক বছরে শরীর অনেক ঝরে গেছে; কিন্তু রেগে গেলে শঙ্কর একেবারে বাঘের মতো হয়ে যায়। এক ঝটকায় শঙ্কর সুধাকে ঝেড়ে ফেলে দিল। মেয়েদুটো ভয়ে আরও দূরে সরে গেল। আর নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'ও বাবা, কি হবে!'

শঙ্কর সুধার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ছি ছি। আমি ছি ছি, না তোমার ছেলে ছিছি। তোমার আস্কারা, তোমার আদরে সে বাঁদরেরও বাঁদর। বংশের মুখে চুনকালি মাখাতে বসেছে। প্রতিভা, প্রতিভা, বিরাট প্রতিভা, ক্ষণজন্মা। একশো বছরের মধ্যে এমন প্রতিভা আসেনি আসবে না। গন্ধর্ব, গন্ধর্ব, গন্ধর্ব।' বারান্দায় কতকগুলো অর্কিডের টব ঝুলছিল পাশাপাশি। হাতের এক ঝটকায় সব কটা খুলে পড়ে গেল। একটা পড়ল শঙ্করের পায়ে। বেশ লেগেছে। ভাঙচুরের শব্দ শুনে ওপরে উঠে এসেছেন শঙ্করের বাবা। অনেক যত্নে একটি একটি করে ইট গেঁথে তৈরি এই বাড়ি। নিজে ছাতা মাথায় সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রিদের কাজের তদারকি করতেন। এখনও কোথাও একটু পলেস্তারা খসে গেলে, সেই জায়গায় পানে খাবার চুন টিপে টিপে দেন। জানেন থাকবে না, তবু সৌন্দর্যটা যেন

নষ্ট না হয়।

সুধা এইবার বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, 'আশ্চর্য তো! এমন ভাঙচুরের অভ্যাস তো আগে ছিল না? কি তোমার হয়েছে বলবে তো! কিছু বলবেও না, গুমরে গুমরে থাকবে শুধু।'

শঙ্করের বাবা বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'একজন শিক্ষিত, শিল্পী মানুষ যদি এইরকম করে, তাহলে খুবই লজ্জার, খুবই লজ্জার। শান্ত হও, সংযত হও। তোমার ছেলে এমন একটা কিছু অমানুষ হয়ে যায়নি। আর সব ভেঙে ফেললেই কি সে রাতারাতি দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে যাবে?'

শঙ্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের আদরে আজ সে কি হয়েছে জানেন, চরিত্রহীন, লম্পট। সে ওই সুরজিৎ দাসের মেয়েটার পাল্লায় পড়েছে। লোকটার এত বড় অডাসিটি, বলে কি না, আপনারা তা রাস্তায় ফেলেই দিয়েছেন, আমি এইবার ঘরজামাই করে তুলে নি। লোকটা আমাকে তুমি তুমি করে কথা বলে গেল। বলে গেল রুপালির সঙ্গে মানস প্রেম করছে। ভাবতে পারেন কত বড় ব্যভিচার! একটা ছাত্র সে লেখাপড়া ছেড়ে নারীসঙ্গ করছে। তার গুরু এখন বল্টু গুণ্ডা। সে আমাদের ঘরানা ছেড়ে বোম্বাই ঘরানার তালিম নিচ্ছে চিপ ফিল্ম-মিউজিক ডিরেক্টরদের কাছে। আমাকে না জানিয়ে সে রেডিওয় অডিসান দিয়ে এসেছে। সে এমন এমন কাজ করে চলেছে যাতে আমার মুখ পোড়ে। এইবার আমাকে ছেড়ে সে ওই অশিক্ষিত, আনকালচারড সুরজিৎ দাসটাকে বাবা বলবে, প্রণাম করবে! তার ওই ঝি-টাইপের বউটাকে মা বলবে! হয় আমি মরবো, না হয় ও মরবে। হয় আমি থাকবো, না হয় ও থাকবে! চেহারা দেখে মনে হয় মদ ধরে ফেলেছে। বল্টু যার স্যাঙাত, সে মদ না ধরে পারে।'

বৃদ্ধ বহুকাল বোধহয় এমন উদাত্ত হাসেননি। জীবনের শেষবেলায় সংসারটা ব্লটিং পেপারের মতো হয়ে যায়। সব রসকষ শুষে নেয়। বৃদ্ধের সেই হাসিতে পরিবারের সকলে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভয়ে। পাগল হয়ে গেলে না তো! সুধার মনে হল, কি অকারণ অশান্তি! মানুষে মানুষে কি এতটুকু সদ্ভাব থাকতে নেই। এ যেন একই তাঁবুর ভেতর বাঘে বাঘে লড়াই। ছেলেটা কি খেল, কোথায় গেল, সে নিয়ে কারোর চিন্তা নেই। বাঁচলো, কি মরলো!

বৃদ্ধ হাসি সংযত করে বললেন, 'এই বয়সে তুমি কি কি করেছিলে

স্মরণে আছে কি? না, বর্তমান তোমার অতীত ভুলিয়ে দিয়েছে! গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই কেন আমি তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম, মনে আছে কি? মনে পড়ে, তোমার নিজের আড্ডা আর কাপ্তেনির কথা। তোমার চারপাশে এখনও অনেকে ঘোরে, যারা পাঁড় মাতাল। তোমার এই ওপরের ঘরের মজলিশ, সময় এসময় কথাটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত খেয়াল করেছ কি? শিল্পীদের এইটাই না কি ধরন। শঙ্কর তুমিই আমাকে বলেছিলে। তুমিই জনান্তিকে আমাকে বলেছিলে, ওল্ড ফুল। তোমার ছেলে তোমারই পথে চলেছে। ছেলের ধরন পাল্টায়নি পাল্টেছে বাপের ধরন। আমিও বাবা, তুমি বাবা। আমি ছেলেকে ধরেছিলুম, তুমি ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছ।'

বৃদ্ধের খড়মের আওয়াজ ধীরে ধীরে নেমে গেল নিচের দিকে। সেখানে চল্লিশ শক্তির একটা বাতি জ্বলছে মিটমিটি। নোনাধরা দেয়ালে রহস্যময় সব দেবদেবীর চিত্রপট। কোণের দিকে খাড়া করা বিশাল এক ত্রিশূল। তার ছায়া দেয়ালে। গোটাগোটা রুদ্রাক্ষের বিশাল একটা মালা এক দেয়ালে ঝুলছে। কুলুঙ্গিতে প্রাচীন কালের কিছু পুঁথি। কাঠের একটা চৌকির ওপর কম্বল পাতা বিছানা। পুঁটলির মতো একটা বালিশ। এই হল বৃদ্ধের সাধনপীঠ। মাঝে মাঝে বাগান থেকে ছুঁচো এসে ঢুকে পড়ে ঘরে। ব্যাং লাফায়। বর্ষাকালে জানলা দিয়ে সাপ দোল খায়। এই হল সংসার-জাহাজের কাপ্তেনের কেবিন।

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। শঙ্কর ঢুকে গেলেন ঘরে। একটা মানুষের জীবন ঘাঁটলে কিছু না কিছু ময়লা বেরোবেই। একেবারে টলটলে ফটকিরি দেওয়া জলের মতো কাঁচ-স্বচ্ছ জীবন বোধহয় হয় না। কিছু ভুল, কিছু ঠিক এই দিয়েই মালা গাঁথা। উঠতি বয়সটা বড় সাংঘাতিক, কিন্তু এই ছেলেকে তিনি কাছে টানতে পারবেন না। একটা বাধা তৈরি হয়েছে মনে চিরকালের মতে। মানস এক প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক জায়গাতেই শুনেছেন, ছেলে বাপকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মানসের আবার শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ নেই। শঙ্করের শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে তার আবার বেশি খাতির।

সুরজিৎ বাড়ি ফিরে মেয়েকে বললেন, 'তোমার কথা আমি রেখেছি। আধুনিক বাবার যেমন হওয়া উচিত। শঙ্করবাবু বললেন, ছেলেকে ক্যাঁত করে একটা লাথি মেরে দূর করে দেবেন। এরপর তো তোমার আর

কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমি আমার পছন্দমতো তোমার বিয়ে দোবো।'

রূপালি বললে, 'আমি এখন বিয়ে করব না।'

'কি করবে? বাউন্ডুলেটার পিছন দৌড়াবে?'

'দেখতেই পাবে।'

'তোকে ভূতে ধরেছে। তুই যে-ভাবে মানুষ হয়েছিস, তাতে বস্তিতে গিয়ে বাস করতে পারবি?'

'মানুষ কি পারে আর কি পারে না, আগে থেকেই বলা যায় না বাবা।'

'প্রেম! প্রেমে কি আছে রে! ন্যাকামি। প্যাসান। রোগ। মনের অসুখ। মানসকে ভেবেছিলুম একটা ইনভেস্টমেন্ট। আমার টাকার সঙ্গে কালচারের বিয়ে। নাম ও করবেই। সেই নামটা আমি ভাঙাতুম। শিক্ষা আর সংস্কৃতি—এই দুটোতে তো আমি শূন্য। তা ছাড়া ব্রাহ্মণদের ওপর আমার অনেক কালের রাগ। মুকুজ্যেমশাই আমাকে কখনো এক সারিতে বসে খেতে দেননি। ভেবেছিলুম তোকে দিয়ে গোঁড়াদের গোঁড়ামি ভাঙবো। দাস থেকে মুকুজ্যে। তা বাড়ি থেকে দূর করে দিলে সে আর কি করে হবে!'

সুরজিতের স্ত্রী পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ওটা একটা পাত্র হল? তিন লাখ টাকায় অনেক ভাল ছেলে পাওয়া যায়।'

মামার বাড়িতে বেশ একটু বেলাতেই মানসের ঘুম ভাঙল। তাও ভাঙত না, যদি না মাসি এসে চুল ধরে টানত! মানস চোখ মেলেই মাসির মুখ দেখতে পেল। মাথার গোলমাল হলে কি হবে, চেহারাটা ভারি সুন্দর। গোল মুখ। ছোট্ট কপাল। কপালের মাঝখানে গোল সিঁদুরের টিপ। একমাথা কালো কুচকুচে চুল।

মাসির ডান হাতে একটা চিরুনি। মানস তাকাতেই মাসি নাকে কেঁদে বললে, 'কি হবে বল তো, যেই না চুলে চিরুনি দিচ্ছি, অমনি না ভুসভুস করে চুল উঠে যাচ্ছে। তুই এখনও শুয়ে আছিস! আমার কথাটা একবারও

ভাবছিস না। আমাকে যে ওরা আর নেবেন না রে!'

মানস উঠে বসল, 'কারা নেবে না?'

'ওই যে রে আমার বরের বাবা আর মা।'

'তোমার চিরুনিতে তো মাত্র তিন চারটে চুল।'

'ওই তো, ওই করেই তো সব যায়! একটু একটু করেই তা যায়। দেখবি আমি একটা গান করবো—একটু একটু করেই হয়, আবার একটু একটু করেই সব যায়। হাহা, হোহো, হিহি।'

মাসির গলাটা কিন্তু খুব সুন্দর। ভোরের ফোটা ফুলের মতো ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে মানসের মনে হল, তাদের দুটো পরিবারের ওপরেই কোন একটা অভিশাপ খেলা করছে। ব্রহ্ম শাপ। ওই, একটু একটু করে জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে মাঝদরিয়ায়। অনেক দূর থেকে যেন বাবার গলার সেই গানটা ভেসে এল, বাবারই রচনা—'অনেক কিছু দিয়েছিলি/দিয়েও আবার কেড়ে নিলি/ শুধু হার মানলি কাড়তে/আমার দু চোখ ভরা জল।।' মানসের গলা দিয়ে গানটা হঠাৎ বেরিয়ে এল ভোরের সুরে। মানসের মনে হয় কোনও ভাবে যদি ছেলেবেলার দিনগুলো ও আবার ফিরে পেত! বাবার ভালবাসা আর বন্ধুত্ব পেতে তার ভীষণ ইচ্ছে করে। বাবা তাকে ডাকছেন, মানস আয়। ভালবেসে কিছু একটা দিচ্ছেন। বেরিয়ে যা, না বলে, বলছেন, কাছে আয়। সে কী এমন করেছে!

আর একটু বেলা বাড়তেই মানসের মেজ বোন উৎপলা হন্তদন্ত হয়ে এল। বেচারা ঘেমে গেছে। চুল উড়ছে। মুখ না-খাওয়া, না-ঘুমোনোর কালি। মানসকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ভাইদা, তুই এখন ভুলেও বাড়ি যাবি না। গেলেই বাবা তোকে খুন করে ফেলবে।'

'কেন রে! আমি তো আর হারমোনিয়ামে হাত দিইনি। গানও গাইনি!'

'ধ্যুত্, কাল সন্ধেবেলা রূপালির বাবা এসে যা-তা বলে গেছে। রুপালিকে তুই ভালবাসিস?'

'আমি একমাত্র গান ভালবাসি, রূপালি আমার গান ভালবাসে। এ ভালবাসাটা সে ভালবাসা নয়।'

'তোদের ভালবাসাটা কি ভালবাসা, তোরাই জানিস, কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে। কি করে করবি? তোর তো চাকরি নেই, বাকরি নেই,

বাবাও তো তাড়িয়ে দেবে, তুই কি করবি ভাইদা?'

'এখন কে বিয়ে করতে যাচ্ছে? বিয়ে করার তো একটা নিয়ম আছে!'

'বড়লোকের মেয়ে, বিয়ে করলেই তুইও বড়লোক।'

'সিনেমা না কি? আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।'

'তুই তাহলে পরিষ্কার বলে দে। বাবা কিন্তু কাল পাগল হয়ে গিয়েছিল। সব ভেঙেচুরে তছনছ করেছে।'

'আমি কেন বলতে যাবো! আমাকে কেউ ভালবাসলে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'বুঝেছি। জানিস তো একেই বলে প্রেম। ভাইদা তুই কিন্তু আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছিস, আরও যাচ্ছিস।'

'গেছিই তো। আরও যাবো। তোরাই তো আমাকে দূরে ঠেলেছিস। তোরা বাবাকে একদিনও বলেছিস, বাবা তুমি অন্যায় করছ। বলেছিস! তোরা শুধু মজা করে দেখেছিস। কই তোরা তো আমার দিকে আসিসনি। বাবা যেবার জামাজুতো কেড়ে নিয়ে মাঝরাতে রাস্তায় বের করে দিলেন, সেদিন তোমরা কি করেছিলে?'

'বা-রে আমরা কত কেঁদেছিলুম সারা রাত।'

'আর আমি রাত কাটিয়েছিলুম মুদিখানার রকে নেড়িকুকুরের সঙ্গে। ভোরবেলা বাবা আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন, একবারও ফিরে তাকালেন না। আমার মনসম্মান নেই! যত মানসম্মান তোমাদের! তখন আমি কোথায় গেলুম! ওই রুপালি তিনদিন আমাকে রেখেছিল।'

'বাবাকে আমরা ভীষণ ভয় পাই।'

'তাই পা। আমার কথা ভেবে আর কি হবে!'

'জানিস তো খুব অশান্তি হলে বাবার খুব লেখার মুড আসে। তখনই ভাল ভাল গান লেখেন, ভাল সুর দেন।'

'তার মানে আমরা বলির পাঁঠা। বাবা তোদের ডেকে ডেকে গান শোনান, গান তোলান, তোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন। তোদের বেলায় যত আদর, আমার বেলায় যত ধোলাই! কেন রে!'

'আমরা যে মেয়ে, পরের বাড়ি চলে যাব। আর গান তো শিখতেই হবে। বিয়ে-পরীক্ষার একটা পেপারই তো গান।'

'একটু আগেই মনটা ভীষণ খারাপ হচ্ছিল। ভাবছিলুম, বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো। তোর কথায় মনটা ঘুরে গেল। আমি শিল্পী হয়ে মাকে দেখিয়ে দেব শিল্পী হওয়া যায় কি না! লোকে বাবার নাম ভুলে যাবে, আমার নাম মনে রাখবে। আমি অনেক কষ্ট করে বাবাকে ঘৃণা করতে শিখবো। আর সেই ঘৃণাই হবে আমার বারুদ। ঘৃণা করার মতো দু-দুটো ঘটনা আমার কানে এসেছে। সেইগুলোকেই আমি নাড়াচাড়া করে যাবো। মায়ের কাছে শুনে নিস, আমি মরতে মরতে বেঁচেছি, এইবার আমি বাঁচতে বাঁচতে মরবো। রাজার মতো বাঁচবো।'

'তুই কি জানিস কাল সকালে আমরা সবাই টাটানগর চলে যাচ্ছি, তুই এখন কি করবি?'

'কেন তোরা আমাকে বলতে পারছিস না, ভাইদা, তুইও চল।'

'বা, রে! আমরা বলার কে?'

'মা কি মরে গেছে!'

'মা বাবার মন বুঝে চলতে চায়।'

'আচ্ছা! আমার জন্যে তোদের আর ভাবতে হবে না। আমার ভাবনা আমি ভেবে নেবো।'

'তুই আর পড়বি না?'

'টিয়াপাখির মতো একই কথা কপচাস না। আমি কি করব, আমি তা জানি।'

'জানিস তো বল্টুদাকে কাল অনেক রাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।'

কেন?'

'সবাই বলছে খুনের মামলা।'

'ও ছাড়া পেয়ে যাবে।'

মানসের মায়ের একটা একটা করে প্রায় সব গয়নাই চলে গেছে। গানের রোজগারে সংসার আর চলে না। মাঝে মধ্যে গয়না বেচতে হয়। কিছু আগে মাসিমার গাওয়া সেই গানের মতো একটু একটু করেই যায়। সুধা মানসকে একদিন বলেছিলেন, 'হাত আর গলা একেবারেই খালি হয়ে গেল, হাতে কিছু জমেও না যে এক সেট নকল সোনার গয়না কিনবো।'

মায়ের এই ক্ষোভ মানসের মন খুব ধাক্কা মেরেছিল। মানসের পকেটে এখন করকরে তিনশো টাকা। মানস উৎপলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। মায়ের জন্যে গয়না কিনবে।

বৌবাজের দোকান ঘুরে ঘুরে মানস হার, চুরি আর একজোড়া দুল কিনল। বোনের হাতে দিয়ে বললে, 'মাকে বলিস, এখন নকল সোনাতেই কাজ চালাতে আর পাঁচটা বছর পরেই আসল সোনা হবে।'

'কি করে হবে?'

'হবে তুই দেখে নিস।'

'এই টাকা তুই কোথায় পেলি?'

'চুরি করিনি। সৎ পথের রোজগার।'

উৎপলাকে বাসে তুলে দিল মানস। ওঠার আগে উৎপলা বললে, 'আবার কবে দেখা হবে?'

'কোনও দিন হবে। কবে তা জানি না।'

'কোথায় থাকবি?'

'জানি না রে, এত বড় দেশ, কোথাও একটা জায়গা হবেই।'

'সাবধানে থাকিস কিন্তু।'

বাস চলে গেল। মানস ভাবতে লাগল, পকেটে কয়েকটা মাত্র টাকা আছে, কাল তবু গুরদোয়ারা ছিল আজ কি হবে! বল্টুদা হাজতে। যাবার অনেক জায়গা আছে; কিন্তু রোজগার। একটা টিকিটের দাম তাকে তুলতে হবে। এক পিঠের ভাড়া। তারপর দেখা যাবে।

ছানাপট্টির সামনে দাঁড়িয়ে মানস মনে-মনে একটা পরিকল্পনা ছকে নিল। টালিগঞ্জে বেশ একটা বড় মন্দির আছে। রোজই সেখানে একটা না একটা কিছু হয়! সেবায়ত পূর্ণবাবু মানসকে ভীষণ ভালবাসেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। একবার গিয়ে দেখলে হয়। মানস বারোটার মধ্যেই পৌঁছে গেল। গিয়েই বুঝল, ঠিক দিনেই এসে পড়েছে। মানস আজকাল, বুড়োদার কথা সময় সময় ব্যবহার করে, যেমন বেটি ঠিক দিনেই টেনে এনেছে। মন্দিরের আজ প্রতিষ্ঠা দিবস। ফুল, মালা, ধূপ, ধুনো, সংগীত, ভক্তসমাবেশ যেন আর এক জগৎ। মানস একটু আগে ছিল কোথায়, আর এখন কোথায়!

পূর্ণ ভট্টাচার্য, মানসকে দেখেই বললেন, 'বিশ্বাস করবে কি না জানি

না, মনে মনে আমি তোমাকেই ডাকছিলুম। আমার মানস কোথায়? আমার মানস কোথায়?'

'আর বৌবাজারের ছানাপট্টিতে দাঁড়িয়ে আমি সেই ডাক শুনতে পেলুম।'

'তাহলে জমিয়ে দাও। তোমাকে আমি একটা ধুতি আর চাদর উপহার দোব। সেইটা পরেই বোসো। আগে চান করে নাও।'

মানসের এই শুদ্ধাচার ঠিক আসে না, তবু সাধুসজ্জনের আদেশ। মনটা তার একেবারে ফাঁকা। একলা হলেই কেমন যেন লাগছে। মন্দিরের পেছন বাগান, কলাঝাড়, একটা বাঁশ ঝাড়। ম্যাটম্যাটে রোদ। পাঁচিলের ওপারে ধুধু মাঠ। টিন দিয়ে ঘেরা বাথরুমে দাঁড়িয়ে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে মানসের কত কথাই মনে পড়ছে। পিতা শঙ্করের রমরমা অবস্থাকে দেখেছে। অল্প কিছুদিন। তিনি উঠলেন, তিনি ধপাস করে পড়ে গেলেন। কেন পড়লেন, কিভাবে পড়লেন মানস ঠিক জানে না। লোকে বলে, মেজাজ ও দুর্ব্যবহার। গুণী বলে, তুমি যাই করো মানুষ তোমায় পুজো করবে, সে যুগ আর নেই। এখন ইট ছুঁড়লেই পাটকেল খেতে হবে। যত অভাব বাড়ছে ততই দুর্ব্যবহার চড়ছে। মেজাজ সবসময় সপ্তমে। সব গানেই কান্না। মানুষ একটু আনন্দ চায়। নিজের দুঃখ সকলের উপর চারিয়ে দিতে চাইলে হয়! শুধু নিরাশার কথা মানুষ শুনবে কেন। নিরাশার ওপর আশাকে দাঁড় করাতে হবে। দুঃখকেই করে তুলতে হবে আনন্দ! তবে বাবার ও বিদ্রোহের গানগুলো ভারি সুন্দর—'বহুদিন হতে মোরা উপবাসী/দেখ্ মা তবুও মুখে আছে হাসি/(তোর) অভয় বাণীতে আর ভুলিব না/তোরে ভাল করে চিনি না।।/সংসারটা তাহলে একেবারেই ভেঙে গেল। ভাঙুক। কুছ পরোয়া নেহি।

নাটমন্দিরে তখন গান চলেছে। মানস এসে বসল, রাজবেশ করে। শুরু হয়ে গেল গান। 'একটি অসুর নিধন করে মা/কত না দর্প হয়েছে তোর/মহিষাসুরের মৃত্যুর পরে বহু বহু যুগ কেটেছে/এরই মাজতে লক্ষ অসুর/তোরই সৃষ্টি ভেঙে করে চুর।।' বেলা তিনটে অবধি মানস একটানা গান গেয়ে গেল। সকলেই ধন্য ধন্য করছেন। ওইখানেই ছ' জায়গায় গান গাইবার বায়না হয়ে গেল। পূর্ণবাবু এসে মানসকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তুই সিদ্ধিলাভ করেছিস মানস। তোর পিতামহ প্রায়ই আসেন এখানে, এসে

মায়ের সামনে বসে কেবল তোদেরই মঙ্গলকামনা করেন। পেছনের ওই গোটা জমিটা মায়ের সেবার জন্যে দান করেছেন। আমাকে বলেছেন, পূর্ণ, আমার জন্যে একটা চালা তৈরি করে রেখো, আমি এই এলুম বলে। হ্যা রে, ছেলের সঙ্গে বনছে না বুঝি?'

মানস কথা ঘুরিয়ে নিল। সামনে বিশাল এক থালায় অনেক প্রণামী পড়েছে। পূর্ণবাবু বললেন, 'ওগুলো সব তোমার।'

অন্য সময় হলে, মানস সব দান করে দিত; যতই হোক, আর একটা শঙ্করই তো বসে আছে ভেতরে, নির্লোভ, বেহিসেবী, অভিমানী, কল্পনাবিলাসী এক রাজা। আজ আর সে পারল না। এক রেলভাড়া মায়ের কৃপায় যোগাড় হয়ে গেছে। এ বেশ ভাল। তাদের সংসারের ধারাটা সত্যিই বেশ সুন্দর হয়েছে। বুড়োদা বলেন, পাখির সংসার। কোথাও কোনও সঞ্চয় নেই। কোন ভবিষ্যৎ নেই। বাঁধন নেই। এ যেন, শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস, কখন কি যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। মানস ভাবলে, আমাদের আজ আছে কাল নেই। কাল কি হবে আমাদের পরিবারের কেউই জানে না।

মানস বললে, 'আজ আমি এখানেই থাকবো।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'একদিন কেন? তুমি এক মাস থাকো। তুমি থাকলে বেশ জমে যায়। গানে-গল্পে। রাতে তোমাকে আমি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি খাওয়াবো, সঙ্গে ছোলার ডাল!'

দুটোই মানসের ভীষণ প্রিয়। পিতামহের উত্তরাধিকার। বৃদ্ধেরও এই দুটি জিনিস ভীষণ প্রিয়, সঙ্গে একটু মোহনভোগ থাকলে তো আর কথাই নেই, যোগকলা পূর্ণ।

মানস একটা কাপড়কাচা সাবান কিনে নিয়ে এল। এখনও বেলা আছে। বসে গেল টিউবওয়েলের তলায়। ট্রাউজার, জামা, গেঞ্জি। এক মহিলা হাত ধুতে এসে বললেন, 'এ কি শিল্পী মানুষের একি অবস্থা। আমি কেচে দিচ্ছি। সাধারণ মানুষ এই শিল্পী শব্দটা কেমন সহজে ব্যবহার করে। মানসের হাসি পায়। কবি, শিল্পী, ওস্তাদ। বোকা বোকা শব্দ। মহিলা বললেন; কিন্তু কিছু করলেন না। হাত ধুয়ে চলে গেলেন।

কোথা থেকে ফ্রক পরা একটা মেয়ে এসে মানসকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধুপধাপ কাচতে বসে গেল।

মানস বললে, 'এ কি রে বাবা?'

মেয়েটা বললে, 'হ্যাঁ রে বাবা। তোমার জন্যে আমি মায়ের কাছে বকুনি খেলুম। সবেতেই পাকামো। এক পেট খিচুড়ি খেয়ে অমনি কাচতে বসে গেলেন। দেখানো হচ্ছে, আমি শুধু ভাল গাইতেই পারি না কাচতেও পারি।'

'তুমি কে গা?' মানসের সন্দেহ হচ্ছিল, মা একেবার রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলন। সেই মা আর একবার এলেন না তা লীলা করতে! বড় বড় চোখ। কালো কুচকুচে চুল। লালচে সাদা গায়ের রঙ। শাসন করে করে কথা; যেন কতকালের চেনা।

মানস বললে, 'দেখাতে যাবো কেন? তোমাকে আমি চিনি না কি?'

মেয়েটা বললে, 'ও মা, সে কি গো! তোমাকে যে আমি এই একটু আগে পরিবেশন করে খাওয়ালুম গো। এরই মধ্যে ভুলে গেলে! আমি তো পূর্ণবাবুর ভাগনী!'

'ও মা, তাইতো। আমি একটা মাথামোটা।'

'তা হতে পারে জানো! গাইয়েরা ভীষণ বোকা হয়।'

'কেন বলো তো?'

'তা না হলে, তারা তা সব হেডমাস্টার হয়ে যেত!'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'খুব ভালো জায়গায়। নাম শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। গোবরডাঙায় থাকি গো আমি, গোবরডাঙায়। তুমি আমাকে একটু গান শেখাও না গো। তোমার গানগুলো বেশ ভাল। খুব সুর। ওই যে ওই গানটা—'জীবন বীণার তারে বাজে শুধু বারে বারে, বিদায় বেলার শেষ রাগিণী/ বিদায়ের আগে তাই শুধু তোরে বলে যাই/তোর মতো কারেও আমি এত ভালবাসিনি/এত ভালবাসি তাই এত বেশি ব্যথা পাই।' আঃ, খুব সুন্দর গান।'

'কথাগুলো তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে? আশ্চর্য!'

'কি জানো, কোনও কিছু ভালো লাগলে আমার চিরকাল মনে থাকে। এই তো তোমাকে আমার ভালো লেগে গেছে তো, তোমাকে আমি কোনও দিন ভুলবো না। তোমার ওই গণ্ডারের মতো নাক, পাগলা পাগলা চোখ। তুমি জানতেও পারবে না, তোমাকে একজন মনে রেখেছে।'

'তার মানে আমাকে বিচ্ছিরি দেখতে।!'

'ও মা, তাই বললুম বুঝি! তোমাকে বেশ একটা নায়ক-নায়ক দেখতে। এই একটা গায়ে সিল্কের চাদর দিয়ে, চোখদুটো উল্টে উল্টে যখন গাইছিলে, মনে হচ্ছিল নিতাই আমার। দেখো তো সুরটা ঠিক হচ্ছে কি না?'

'তোমার নামটা একবার বলো না গা।'

'ওমা! আমার নাম তো মহুয়া। তুমি তো খেতে. বসে আমাকে ডাকছিলে। আমার মা মামাকে কি বলছিল জানো তো, তোমাকে নাকি জামাই করবে।'

মহুয়া খিল খিল হেসে ওপর-হাত দিয়ে কপালের চুল সরালো। বাতাসে সাবানের ফেনা উড়ছে। চুলগুলো খুব বিরক্ত করছে। মহুয়া বললে, 'একটা কাজ তুমি পারবে! পেছন দিকে এসে আমার চুলগুলো টেনে একটা খোঁপা করে দিতে পারবে?'

'ওঃ, এই কাজ! এ তো খুব সহজ। টেনে ধরবো, ধরে একটা গোলমতো করে দোব।'

মানস মহুয়ার পেছন দিকে গেল। পিঠে ছড়িয়ে আছে এক রাশ কালো চুল। ফুলছাপ ফ্রকের ওপর। পিঠের হুক তিনটে টান হয়ে আছে। ভেতরের জামার সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে। মানসের মনটা কেমন যেন হয় গেল। কত ছোট ছোট জিনিসে, কত ভাল লাগা থাকে। একটু ইতস্তত করে মানস সমস্ত ছড়ানো চুল এক জায়গায় করে যেই টেনেছে, উবু হয়ে বসে থাকা মহুয়া পেছন দিকে উল্টে পড়ল মানসের পায়ে। পা দুটো ছড়িয়ে গেল সামনে সাবানের ফেনা। গোল নিটোল দুটি পা ভরাট গোড়ালি। পায়ে আবার এক হারা দুটো নূপুর।

মহুয়া তো হেসেই খুন। 'একটা ছোট্ট কাজও যদি তোমাকে দিয়ে হয়! এমন টান মারলে উল্টেই পড়ে গেলুম। ও মা, আমার জামাটামা সব ভিজে গেল।' দমকা বাতাসে ফ্রকটা পায়ের দিক থেকে উল্টে গেল। মহুয়া বলল, 'ভীষণ অসভ্য।'

'কে অসভ্য!'

'ওই যে মুখপোড়া হাওয়া। দেখো না সব উড়িয়ে দিচ্ছে। আমার লজ্জাশরম নেই বুঝি। দাও, আমাকে আবার আগের মতো করে দাও!

জামাটা গেছে তো!'

'একটু গেছে।'

'একটা কাজও যদি ভালভাবে শান্তিতে করা যায়!'

মানস মহুয়ার বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তুলে বসাতে গেল। মহুয়া যে একটা বাড়ন্ত মেয়ে সে খেয়াল নেই। মহুয়ার সুড়সুড়ি লেগেছে। সে কুঁকড়েমুঁকড়ে এবারে পাশে উল্টে পড়ল। মানস বললে, 'আশ্চর্য তো! তুমি তো কেটলি নও যে হাতল ধরে তুলবো! তোমাকে তুলতে হলে তো আমাকে ওই ভাবেই তুলতে হবে।'

মহুয়া বেদম হাসছে। একটা হাত ভাঁজ করে মুখ চাপা দিয়েছে। সমস্ত চুল ছড়িয়ে গেছে মাটিতে। হাসি আর থামে না। 'তুমি তো আমাকে কলসির মতো করে তুললেই পারতে!'

'এখন তাহলে বেডিং-এর মতো করে তুলি!'

মহুয়া আবার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে নিজেই উঠে বসল।

সন্ধেবেলা মহুয়া আলু ভাজার আলু কাটতে কাটতে মানসকে বললে, 'শোনো তো, সুরটা ঠিক হচ্ছে কি না। 'জীবন বীণার তারে বাজে শুধু বারে বারে বিদায় বেলার শেষ রাগিণী'...।

মানসকে অবাক করে দিয়ে মহুয়া গোটা গানটা ঠিক ঠিক গেয়ে গেল। পুরো গানটাই প্রায় তারসপ্তকে খেলা করেছে। মহুয়ার গলা যেন সাধা বাঁশির মতো। কেউ সাংঘাতিক ভালো একটা কিছু করে ফেললে মানসের চোখে জল এসে যায়। মানস বলল, 'আলুফালু রাখো। হারমোনিয়ামে বসবে চলো।'

মন্দিরে মহাসমারোহে আরতি লেগেছে। ঘণ্টা, কাঁসর বাজছে। বাইরের দাওয়ায় মানসের ট্রাউজার আর জামা দোল খাচ্ছে বাতাসে। রান্নাঘরে মহুয়ার মা ভোগ রাঁধছেন। মানস হারমোনিয়াম টিপে মহুয়াকে বললে, 'গলা মেলাও।'

মেলাবে কি। মিলেই আছে। যেন কতকালের সাধা! মানসের মনে হল তার সামনে আর এক মানস বসে আছে। পবিত্র। সাদা ধপধপে একটা মোমবাতির মতো। মানস বললে এসো, দু'জনে মিল গাই—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-তারিণী তরলতরঙ্গে। মানস সাদামাটা সুরে গাইল

না। পটবর্ধন সায়েব যেভাবে গাইতেন, যে-সুরে, যে-কায়দায় ঠিক সেইভাবে। মানসের মনে হল, মেয়েটা সুরের ফোয়ারা। একটু উস্কে দিলেই হল।

গান শেষ হতেই মহুয়া বললে, 'তুমি তাহলে আমার গুরু হলে। প্রণাম করি।'

মানস বললে, 'কে কার গুরু! আমার তো মনে হচ্ছে, তুমিই আমার গুরু হবে।'

মহুয়া মানসকে কটাস করে একটা চিমটি কেটে বললে, 'বেশি বেশি।'

'গুরুকে চিমটি কাটা?'

'তুমি আবার দয়া করে মাকে বলে দিও না যেন।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে মহুয়া?'

'কবির মতো। মাইরি বলছি।'

আধ হাত জিব কাটলো মহুয়া।

'কি হলো?'

'মাইরি বলে ফেলেছি। আমার বাবা বলেন, তোর কি হবে মহুয়া, আমার মতো পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে তুই মাইরি মাইরি করিস? কি জানো তো, এটা আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। যাক গে, যা হবার তা হবে। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না, আমাদের ওখানে। আমার তাহলে খুব গর্ব হবে।'

'গর্ব হবে কেন?'

'সে হবে।'

'তোমাদের ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

অনেক রাতে মানস উঠানের চৌকিতে বসে আছে। গাছের পাতায় পাতায় তেলেভাজার শব্দ। দূরে অন্ধকার মন্দিরের চূড়া তারা খুঁজছে। মানস বসে আছে। এমনিই তার ঘুম কম। আজ আবার মনে চিন্তার ছবি উতলাচ্ছে। বহু মেয়ের সঙ্গে সে মিশেছে, কিন্তু কোনও মেয়ের কথা সে রাতে ভাবে না। কোনও সময়েই ভাবে না। ওই যতক্ষণ দেখা, ততক্ষণই। মহুয়া কিন্তু মানসকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। মেয়েটা তার মন থেকে বেরোতে চাইছে না।

অন্ধকারে কিন্‌কিন্ করে শব্দ হল। মানসের পিঠের ওপর একটা হাত পড়ল। 'কি গো কবি তুমি আজ ঘুমোবে না?'

'আমার ঘুম আসতে বেশ রাত হয়।'

'ক'টা বেজেছে জানো? বারোটা।'

'তুমি শোবে না?'

'শোবো, এই তো সবে সারা হল সব।'

মহুয়া মানসের মাথার চুল খাবলাখাবলি করে দিল। মাথা ঘষল মানসের পিঠে। কানের কাছে ভিজে ভিজে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললে, ফিসফিস করে, 'তোমাকে আমি কিন্তু ভালবেসে ফেলেছি।' বলেই মহুয়া দুদ্দাড় দৌড়লো। অন্ধকারে একটা কুকুর শুয়েছিল, বার কয়েক ধমকে উঠল। জোরে একটা বাতাস বয়ে গেল যেন কোথাও তাদের ভীষণ কাজ আছে।

মানস খুব ভোরেই বেরিয়ে গেল। প্রথম বাস ধরেই চলে গেল হাওড়া স্টেশানে। প্ল্যাটফর্ম জমজমাট। ভোরের ট্রেন সব ছাড়বে। আসানসোল, ধানবাদ, টাটানগর। একটু পরেই সব ছাড়বে। মানস মাঝেমাঝে নিজেকে হারিয়ে দিচ্ছে ভিড়ে। টাটা ছাড়বে তিন নম্বর থেকে। মানস হুইলারের বই-এর গাড়ির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। ঢোকার গেটের দিকে তার চোখ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আসছেন সব। বোন দুটোকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে, পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো। বাবাকে দেখাচ্ছে সরল একটা বেতের মতো। কি সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে। দুধের মতো ফর্সা। আর্য ঋষিদের মতো নাক। রিমলেস চশমা। নিখুঁত, পরিপাটি বেশবাস। মাকে ভীষণ ভীতু ভীতু আর বোকা বোকা দেখাচ্ছে। ভীষণ যেন দুর্বল। বাবার ধবধবে সাদা পায়ে কালো স্ট্র্যাপ দেওয়া চটি। পা দুটোর কি সুন্দর গড়ন। পাতলা আমসত্ত্বের মতো। বড় বড় চোখ দুটো যেন ঝলসাচ্ছে। মানসের মনে হল, সংসারের বাইরে এলে বাবাকে যেন হাজার গুণ সুন্দর দেখায়। কি অভিজাত চেহারা। সংসার বাবার স্থান নয়। সংসারে বাবা নিজেকে নষ্ট করছেন। অকারণ রাগ, ঝগড়া, কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। মানস জানে বাইরে যাঁকে এত কঠিন কঠোর মনে হচ্ছে, ভেতরটা তাঁর ভীষণ কোমল। ভেতরে শুধু জল—যা গান হয়ে সুর হয়ে বেরিয়ে আসে। বন্দী মানুষের আর্তনাদ। কুলিরা আগে আগে ছুটছে। একজনের মাথায় সেই বিখ্যাত হারমোনিয়ামের বাকসো। বাবা তাকে কেবলই সাবধান

করছেন।

মানসের একবার মনে হল, হঠাৎ গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। ওই পা দুটো ধরে বলে, আমগাছে আমই হয়, জাম হয় না। পারলো না। অহংকারীর বংশের ছেলে, অহংকারটাকে ফেলবে কোথায়! চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। প্ল্যাটফর্ম খালি। যে কুলি দু'জন মাল বয়ে এনেছিল, তারা এখন আয়েস করে খইনি দলছে।

মানস একটা ফোন করল। শেষ মুদ্রাটা ফেলে বোতাম টিপতেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। হিসেব মিলেছে। রুপালিই ধরেছে।

'আমি মানস।'

'ওমা! কোথা থেকে বলছ তুমি?'

'হাওড়া স্টেশান।'

'ওখানে কি করছ? এত সকালে?'

'শোনো, আমি বোম্বাই যাচ্ছি। তুমি পালাবে আমার সঙ্গে?'

'ওমা সে কি? পালাবো কেন। খারাপ ছেলেমেয়েরাই তো বোম্বাই পালায়। তারপর পুলিশ তাদের ধরে। তুমি শুধু শুধু বোকার মতো বোম্বাই যাচ্ছ কেন? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'না, পুরোপুরি সুস্থ। ওখানে আমি কিছু একটা করার ডাক পেয়েছি।'

'কি করার?'

'আমি যা পারি, গান। বিদেশেও যেতে পারি দলের সঙ্গে।'

'তুমি বড় হও মানস, খুব বড়, আরও বড়।'

'সে তো হবোই, আমার ভেতর বারুদ আছে। তুমি চলে এসো, বোম্বাইতে বিয়ে হবে।'

'যাঃ, তা হয় না কি? বাবা, মা-র অমতে। আমার অত সাহস নেই। তুমি আগে দাঁড়াও তারপর সব হবে। আমি এখন ছাড়ছি। আমার ভয় করছে।'

মানস হেসে ফেলল। আরেক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন, তিনি বললেন, 'হাসছেন?'

'এই সকাল আটটায় একজনের ভয় করছে। ভূতের ভয়।'

মানস বোম্বাইয়ের একটা টিকিট কাটল। রিজার্ভেশান নেই। একটা কুলি বললে, 'দশটা টাকা দেবেন, আমি ইয়ার্ড থেকে চেপে আসবো।'

ছ'টাকায় রফা হল। মানসের কোনও ব্যস্ততা নেই। সে জানে, বসতে পাবেই। সবাই ওঠার পর সে যখন উঠলো, এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'আইয়ে মানসজী, আইয়ে।' মানসের মনে হল সারা ভারতবর্ষ তাকে ডাকছে, আইয়ে মানসজী, আইয়ে।

একটু আগে শঙ্কর যে-পথে গেছেন, সেই পথেই মানস চলল। সে যাবে অনেকটা দূরে। আর ঠিক সেই সময় এক বৃদ্ধ, দোতলার সার সার ঘরে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে আপন মনে বলছেন, থিয়েটারে এখন ড্রপসিন পড়ে গেল। এ পালা শেষ। পরের পালার দিনক্ষণ পরে জানান হবে। খড়ম খটখটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলেন, নারকেল গাছের বেল্লোর খাঁজে ঘুঘুর বাসা হয়েছে। মাথা নাড়লেন, 'তোফা, তোফা! ভিটেয় তাহলে ঘুঘু চরল!'

পাঁচদিন পরে সুধা একটা চিঠি পেলেন,

"মা, আমি এখন অনেক দূরে, বোম্বাইতে। আমার জন্যে ভেবো না। বেশ আছি আমি। মা, বাবাকে ছেড়ে যতটা ভাল থাকা যায়। বাবাকে বোলো, আমগাছে আমই হয়, জাম হয় না। মানস এমন কিছু করবে না, যাতে তাঁর সম্মানের হানি হয়। বাবা শুধু আমার জন্মদাতা নন, গুরু। নিজে না শেখালেও, আমি শুনে শিখেছি। আমার রক্তে তাঁরই সুর। বাইরের জগৎ বাবাকে অসম্মান করেছে, প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি, আঘাত করেছে, আহত করেছে, আমরা যেন সেই আহত মানুষটিকে আরও আঘাত করে না বসি। আমরা যেন তাঁকে ভালবাসতে পারি। বড় গুণী মানুষ, বড় আদরের মানুষ, বুকে ধরে রাখার মানুষ। বাবাকে তোমরা ধরে থেকো। দেখো তাঁর গান যেন বন্ধ না হয়। খুব উৎসাহ দেবে, সঙ্গ দেবে, ভেঙে পড়তে দেবে না। বাবাকে বোলো সুরজিৎ দাসের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তার মেয়ের সঙ্গেও নয়। লোকটা ধান্দাবাজ, ধাপ্পাবাজ। কাল সকালে আমি দুবাই যাচ্ছি। কিসে কি হয়, কার কি হয়, বলা যায় না মা। ঈশ্বর আছেন। বাবাকে বোলো, আর কয়েকটা বছর, সংসারের ভাবনা, মেয়ের বিয়ে, কিছুই আর তাঁকে ভাবতে হবে না। মানস আসছে। আমার বারুদ যেন সেঁতিয়ে না যায়! তোমরা প্রণাম নিও—মানস।।'

নারকেল গাছের তলায় বসে বৃদ্ধ একটি ছোট চিঠি পড়ে হেসে উঠলেন—বুড়োদা, তুমি হলে আমাদের বুড়ি। চুপ করে বসে থাকো।

আমরা সব চোর চোর খেলতে বেরিয়েছি। দেখি, এবার কে আগে বুড়ি ছুঁতে পারে! প্রণাম নিও।—তোমার খোকা।।

গোবরডাঙায় এক কিশোরী আমবাগানে বসে যে চিঠিটি পড়ল—মৌ, আমি এখন বোম্বাইতে। তোমার সঙ্গে দেখা করে আসিনি, কাছ থেকে যা বলা যায় না, দূর থেকে বলব—আমিও তোমাকে ভালবাসি, তবে কি জান তো, বাবারা মেয়ের বিয়ে দেন কোনও ছেলের সঙ্গে নয়, জীবিকার সঙ্গে। গাড়ি, বাড়ি, চাকরি, টাকা। আমি সেই সব গয়নার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি, ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আদায় করব বলে। আমার মাথায় এখন দুটো চিন্তা—গান আর তুমি। জীবনে আর কারোকে দেখে এত দুর্বল হইনি। পারলে অপেক্ষা কোরো। বেশি না, মাত্র কয়েক বছর। আর কারোর কাছে গান শিখো না, ঘরানা উল্টে দেবে। আমিই তোমাকে শেখাব। কিছুদিনের জন্যে আমি একটা দলের সঙ্গে দুবাই যাচ্ছি। বোম্বাই আর দুবাই দুটো ঠিকানাই রইল। ইচ্ছে হলে লিখো। তুমি রবে নীরব হৃদয়ে মম—মানস।।

শঙ্কর মানসের চিঠিটা পড়লেন। অনেকদিন পরে তাঁর চোখে একটু জল এল। একটা লাইন—এত ভালবাসি তাই এত বেশি ব্যথা পাই। সব ব্যথা কথা হয়ে প্রাণে গাঁথা থাক না।

বৃদ্ধ দোতলায় উঠে এলেন। টবের গাছগুলো মরে না যায়। একটু একটু করে জল ঢালতে লাগলেন। পরিচ্ছন্ন, নধর, একটি ঘুঘু নারকেল গাছের পাতায় বসে ঘুরঘুর করছে। বৃদ্ধ সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'শ্মশানের শান্তি ভালবাসিস নে পাখি সব শ্মশান করে দিয়েছি।' শঙ্করের ঘরের তালা খুললেন, ষাটটা বছর যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমবাগানে একটি মেয়ে ছুটছে। হলুদ ছাপ ফ্রক। গোল গোল পায়ে পাঁয়জোরের চিনচিনি। হাতে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র।

ধাপে ধাপে

আর তো বেঁচে থাকা যায় না। খুব খারাপ অবস্থা। খুন, জখম, ডাকাতি, অপহরণ, সন্তান বদল, দেবতারা সব দানবে পরিণত, অমৃতের পুত্ররা কোথায়! জগৎসংসার আর বিধির বিধানে চলছে না। চালাচ্ছে চাঁদির চাকতি। সৎ-অসৎ-এর ব্যবধান ঘুচে গেছে। পাপকর্ম বলে আর কিছু নেই। ধর্ম শব্দে আছে, শাস্ত্রে আছে, আচরণে নেই। ঘটা আছে ঘট নেই। উৎসব আছে পুজো নেই। সূর্যোদয়ে যাবতীয় ধান্দার জাগরণ, সূর্যাস্তে বোতল-বারিতে নিমজ্জন। মধ্যযামে বেপথু নরনারীর খিস্তিখেউড়। এই পথেই অগামী প্রজন্মের আগমন। মাতৃপরিচয় থাকলেও পিতা কে? এই প্রশ্নের উত্তর কেউ খুঁজবে না। ফর্মে ফাদারস নেম-এর জায়গায় লেখা হবে মাদারস নেম। সহবাস থাকবে পরিবার থাকবে না। আমরা মডার্ন, আমরা বোল্ড। আমাদের ধর্ম, জৈব ধর্ম, আমাদের উপাস্য, ক্ষমতা, অর্থ। আমাদের আদর্শ, পশুটাকে জাগাও।

একজন হেসে বললে, 'এসব তোমার ইডিয়েটের মতো ভাবনা। তুমি 'দ্রাক্ষাফল টক' গ্রুপের এক মূর্খ মানুষ। চল, তোমাকে আলিপুরের একটা প্রাসাদে বসিয়ে দিয়ে আসি। পাঁচটা পাঁচ রকমের বিলিতি গাড়ি, তিন-চারটে কোম্পানির মালিক। সেখানে ন্যায় নীতি মানুষ সব পেষাই হয়। টাকা দিয়ে আইন কেনা হয়। টাকা দিয়ে মস্তান পোষা হয়। কোটি কোটি টাকা ঢেলে আহামরি মন্দির তৈরি করলেও তোমাকে ধার্মিক বলা যাবে না। তখন এই তুমিই তোমার এইসব ভাবনাকে নেহাতই মধ্যবিত্তের গতানুগতিক ভাবনা বলে মনে করবে। একটা স্তরে মানুষের এইসব ভাবনা আসে। সেই স্তরটা পেরোতে পারলে মন আর মনের ভাবনা দুটোই চলে যায়। সেই মানুষটা তখন একটা দামী গাড়ির মতো। সামনে অনন্ত পথ। তখন তার একটাই মন্ত্র, ড্রাইভ, ড্রাইভ, ড্রাইভ ফাস্ট। থেমো না। থামলেই পেছনের গাড়ি তোমাকে মেরে বেরিয়ে যাবে। তোমাকে ওগডেন ন্যাশের একটা কবিতা

শোনাই :

Remorse is a violent dyspepsia of the mind.
But it is very difficult to treat
because it cannot even be defined.

মনের ডিসপেপসিয়া হলে এইসব চিন্তা আসে। পৃথিবীর কি হচ্ছে, হয়েছে, হবে তোমার কি লাভ! তুমি, আমি, আমাদের পরিবার পরিজন এটাকে পালটাতে পারব! নেতারা পারবেন! মণীষীরা পারবেন! মেজর জেনারেলরা পারবেন! কেউ পারবেন? অপ্রতিরোধ্য। যতদিন না মৃত্যু হচ্ছে ততদিন পালাতে পারবে? পারবে না। জগৎ-খেলায় তুমি আমি কয়েক কোটি ঘুঁটি মাত্র। জন্ম আর মৃত্যু ছকের দু'পাশে মুখোমুখি। অনন্তকাল ধরে খেলা চলেছে। ওগডেনের আরও ক'টা লাইন অনুধাবন কর :

Because everything is not gold that glisters
and everything is not a tear that glistens.
And one man's remorse is another man's
reminiscence.
So the truth is that as far as improving the
world is concerned,
remorse is a duffer.

অতএব তোমার এই বিষণ্ণতা, তোমার এই ভেটকে বসে থাকাটা বোকার বোকামি। যদি কিছু করা যেত তা হলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেন না!'

বন্ধু আমার শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা বলছে।

উদ্ধত, মদ্যপায়ী ও যথেচ্ছাচারী হয়ে গেলেন যাদবরা। দ্বারকায় বসুদেবের যজ্ঞ শেষ হল। ঋষিরা এসেছিলেন সেই যজ্ঞে। তাঁরা দ্বারকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিদায় পর্ব। একদল যাদব যুবকের মনে হল ঋষিদের অপদস্থ করা যাক, তাহলে বেড়ে মজা হবে। শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্বকে গর্ভবতী রমণী সাজিয়ে ঋষিদের সামনে উপস্থিত করে প্রশ্ন করা হল, 'দয়া করে বলুন, এর ছেলে হবে না মেয়ে!'

ঋষিরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও অপমানিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'এ

তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করবে।' এই বকাটেদের দলে কে রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব! কি সেজেছেন, গর্ভবতী রমণী! এ কি ভাবা যায়, কতটা অধঃপতন!

যাই হোক, ঋষিবাক্য মিথ্যা হওয়ার নয়। পরের দিনই সাম্ব একটি মুষল প্রসব করলেন। যাদবরা বিপ্রশাপ এড়াবার জন্যে মুষলটিকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পাথর ঘষে ঘষে প্রায় নিঃশেষে ক্ষয় করে ফেললেন। সামান্য যেটুকু ছিল, ওতে আর কি হবে, ভেবে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। কিন্তু, ঋষিবাক্য তো মিথ্যা হওয়ার নয়। ঘষাঘষির ফলে সমুদ্র কিনারে গুঁড়ো গুঁড়ো লোহা পড়েছিল। সেই লোহাচুর থেকে গজিয়ে উঠল অসংখ্য 'এরকা তৃণ'। অর্থাৎ তৈরি হল বিশাল একটি নলখাগড়ার বন। ধ্বংসের অস্ত্রশস্ত্র সব তৈরি। মুষলের টুকরোটি হবে ব্যাধের তীরের ফলা। আর এরকা হবে যাদবদের হাতে হাতে শাণিত তরোয়াল। পরস্পরের নিধনের প্রাকৃতিক অস্ত্র।

এদিকে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, উদাসীন। অপূর্ব সুন্দর মুখটি হাসি হাসি। জানেন সব, কিন্তু কিছু করছেন না, করবেনও না। অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সহচর উদ্ধব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলছেন,

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সংত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোহপি প্রত্যহন ন যদীশ্বর॥

উদ্ধব যেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় রূপ। অবিকল সেই চেহারা। বন্ধুঅন্ত প্রাণ। বলছেন, হে দেবদেবেশ, হে যোগেশ্বর, হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন, সর্বশক্তিমান সর্বতোসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তুমি যে বিপ্রশাপ নিবারণের চেষ্টা করলে না, তাতে মনে হচ্ছে, তুমি নিশ্চয় এই বংশ নাশ করে ইহলোক ত্যাগ করবে!

ভগবান বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

উদ্ধব ছলছলে চোখে জিজ্ঞেস করলেন—কেন? কেন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?

ভগবান বললেন—ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্যমশেষতঃ। ব্রহ্মার অনুরোধে যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে অংশাবতার বলরামকে সঙ্গে নিয়ে এই সংসারে অবতীর্ণ হয়েছিলাম দেবগণের অভিপ্রেত ভূভারহরণরূপ সেই

কাজ আমি পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছি। এইবার তুমি আমার প্রস্থানটা দেখ। সেটাও তোমার কাছে একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। প্রত্যক্ষের মধ্যেই তোমাকে থাকতে হবে, থাকার মাশুলও দিতে হবে, কিন্তু কোন মন্ত্রে, কোন কৌশলে তুমি আমার মতো অবিচলিত থাকতে পারবে! ত্বং তু সর্বং পরিত্যাজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু, স্নেহের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল, স্বজন, বন্ধু সব পরিত্যাগ কর, ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক সম্যদৃগ বিচরস্ব গাম, আমাকে কি দেখছ? সম্পূর্ণ নির্বিকার, বসে বসে যাদবকুলের বিনাশ দেখছি। একবারও সামনে গিয়ে বলছি না, এই তোরা কেন এমন করছিস! সংযত হও, সুস্থির হও। এখন আমি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নই বিদায়ী বৃদ্ধ কৃষ্ণ। যোদ্ধা কৃষ্ণ নই তাত্ত্বিক কৃষ্ণ। যে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের পরিচালনা করেছিল সে নিজের বংশের অনিবার্য ধ্বংস ঠেকাতে পারে না? অবশ্যই পারেন। কোন শর্তে পারেন? আমার শরণাগত হতে হবে। মামেকং শরণং ব্রজ। একমাত্র এই শরণাগতি এলে আমি পারি, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষেয়িষ্যামি। উদ্ধব আমি নিজেই এবার ধ্বংস চাইছি। মানুষের সামনে দুটো পথ, এক মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর। তোমার নিয়তি যাই হোক, এই পথে তুমি আমার প্রিয় হবে। আমার প্রিয়কে আমি বুক দিয়ে আগলাব।

দ্বিতীয় পথ ধ্বংসের পথ। নিজের নিয়তি ও পরিসমাপ্তির রূপকার স্বয়ং তুমি। ভগবানকে যে মুহূর্তে জীবন থেকে বিতাড়িত করবে, সেই মুহূর্তে তোমার ভেতর ধ্বংসের কিছু লক্ষণ ফুটবে, তখন তুমি নিজেকেই নিজে মারবে। ইন্দ্রিয়সমূহ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। ইন্দ্রিয়পর মানুষ কি করে উদ্ভব! বিষয়ের দিকে ছোটে। ভোগ, আরো ভোগ! সে তখন মানুষ থেকে মুষিক,

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

পরপর ধাপে ধাপে এগোবে ধ্বংসের দিকে। বিষয়, বিষয় করতে করতে বিষয়ে আসক্তি, আসক্তি থেকে কামনা, তৃষ্ণা, আরো আরো চাই।

কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধ। ক্রোধ এলে বিবেক মরে যায়, তখন মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। শাস্ত্রের উপদেশ আচার্যের শিক্ষা বিবেকেই ধরা থাকে, বিবেক চলে গেলে সেই সংস্কারটাও চলে যায়। স্মৃতিবিলাপ। বিলোপ থেকে বিভ্রম। কোনটা সৎকর্ম, কোনটা অসৎকর্ম এই বিচারবুদ্ধি আর থাকে না। বিচারবোধের অভাবে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে যেমন মানুষ মরে, সমাজও মরে নীতিভ্রষ্টতায়, মরে নেতৃত্বের অভাবে, শিক্ষার অভাবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিতপ্রবর, প্রয়াত রাধাকৃষ্ণাণ বলছেন—Democracy does not mean merely anybody getting up and lecturing to us। বাঁধা মঞ্চে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালুম, মাইক্রোফোন আঁকড়ে ধরে ঠেসে খানিক বক্তৃতা করলুম, ফুলুরি ভাজার মতো।

বর্তমান অবস্থার কারণ অনেক। অনুসন্ধান মানে সমাধান নয়। এমনটাই চলতে থাকব। তাহলে অস্তিত্ব বজায় রাখার উপায়! পাহাড়চূড়ায় বৃক্ষতলে বসে শ্রীকৃষ্ণ নির্মোহ হয়ে দেখছেন, প্রভাস-মেলায় যদুকুলের পারস্পরিক হানাহানি। এরকা তৃণ উৎপাটিত করে পরস্পর পরস্পরকে বধ করছে। অবশেষে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে গেল দ্বারকা।

অবশ্যম্ভাবী এমন এক পরিণতির সামনে হয়ত আমরাও দাঁড়িয়ে আছি। ভগবানশূন্য এই সময়ে বাঁচব কি ভাবে! কেন, ভগবান উদ্ধবকে কৌশলটি দিয়ে গেছেন। আমি যেমন নির্বিকারচিত্তে যাদবকুলের বিনাশ দেখে যাচ্ছি, তুমিও সেইরকম বাজে প্রসঙ্গ, আত্মীয়স্বজন থেকে মন তুলে নিয়ে, সমগ্র মনটা,আমাকে দিয়ে দাও। সমদর্শী হয়ে ঘুরে বেড়াও। ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু। ময্যাবেশ্য মনঃসম্যক সম্যদৃগ বিচরস্ব গাম।।

এসো মা, এসো এসো

আমি যে বয়সে দাঁড়িয়ে আছি সেই বয়েসটা হল বীতশ্রদ্ধ হওয়ার, সন্দিগ্ধ হওয়ার। এই বয়সের মানুষের যা হওয়া উচিত, সব কথাই নেগেটিভ, পজেটিভ কথাবার্তা নেই বললেই চলে। এসবই হল শারীরিক আর মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। মুফতে বেঁচে থাকার বাসনা। সংগ্রামের মানসিকতা চলে গেলেই মানুষ 'সিনিক' হবে। 'সিনিক' শব্দটার এককথায় কোনো বাংলা নেই। মনের ভ্যাটভ্যাটে অবস্থা। মনের কোষ্ঠকাঠিন্যে। মৃত্যুর ছায়ায় বসে জীবনের উচ্ছ্বাস উৎসব দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যেতে বাধ্য। ভুরুর ভাঁজে সদাই যেন ঝুলে আছে অলিখিত বিরক্তি, 'এ সব কী-ই হচ্ছে!' আলোচক থেকে সমালোচকে উত্তীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিটা এমনই অপ্রতিরোধ্য স্বয়ংক্রিয় যে আমরা বাধা দিতে পারি না। অনেকটা 'কলেস্টোরোল' বা 'সুগার' বেড়ে যাওয়ার মতো। এতখানি জীবন খরচ করে যা পাওয়া গেল, তা হল ঈর্ষা আর উন্নাসিকতা। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে এই ব্যাপারে বিশেষ কোনও তফাত নেই। পাশ্চাত্য-জীবনে আছে সর্বগ্রাসী হতাশা। হেমিংওয়ে, কোয়েসলারের মতো লেখকেরা আত্মহত্যা করেন। সিলভিয়া প্লাথের মতো কবি গ্যাস-স্টোভের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেন।

সেকাল শব্দটা বৃদ্ধের এলাকাতেই ঘোরা-ফেরা করে। একালে সেকাল এসে ঢোকে বৃদ্ধদের ঘাড়ে চেপে। সেকালের বেড়াল আরও সুন্দরী ও বাধ্য ছিল। সেকালের পাখি আরও ভাল গান গাইত। কাকের ডাক সেকালে এত কর্কশ ছিল না। মায়েরা ছিলেন যশোদা, মেয়েরা সব সাধিকা। শ্রীমতীর মতো সব প্রেমের পুরিয়া! সেকালের সন্দেশ শালপাতায় বসে বসেই ঘি ছাড়ত। গব্যঘৃত এতই গব্য, টানা এক মাস সেবন করলে চিতায় আর ঘি ঢালার প্রয়োজন হত না। পাড়ার ঝুলবারান্দার দিকে তাকালেই দেখা যেত জোড়া জোড়া হরগৌরী ঝুলছেন। হর দেশলাইকাঠি

দিয়ে দাঁত খুঁচছেন, গৌরী চ্যাকোর চ্যাকোর করে জর্দা পান চিবোচ্ছেন। মাঠে-ময়দানে কামধেনুর শীর্ণ সংস্করণ চরছে। দুধের পরিমাণ যৎসামান্য হলে কী হয় একেবারে ফোঁটা ফোঁটা ক্ষীর। কত্তা বৈশাখে দুধ খেয়েছিলেন, আমাদের শেষেও চিরুনি গোঁফের ডগায় ডগায় ঘি ব্যাড়ব্যাড় করছে।

সেকাল আর একালের যে মস্ত তফাত, সেটা হল সেকালটা ছিল মানুষের এলাকাটা হল যন্ত্রের। যে কারণে একালের যে কোনও করিৎকর্মা মানুষকে আড়ালে বলা হয়, একটি 'যন্তর'। পঞ্চাশ, ষাট বছর আগে আমাদের এই কম আলোর এলাকায় কত জায়গা ছিল. মাঠ, পুকুর, সরোবর, দীঘি, প্রবাহিত গঙ্গা, কম মানুষ, বড় বড় জমিদারদের দুর্ভেদ্য বাগানবাড়ি, দেবালয়, বিশাল গাছ, আম্রকানন। তীব্র দিবালোক, শীতল ছায়া, উৎকণ্ঠাশূন্য, অসন্দিগ্ধ পক্ষীকুল। মানুষের শ্রম আর বিশ্রামের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত একটা সাম্য ছিল। এক জায়গায় বসে দু'দণ্ড গল্পসল্প করার সময় ছিল। সকলেই সকলকে চিনত। দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হত। গোটা গ্রামটাই ছিল বৃহৎ একটা পরিবারের মতো। কোনও পরিবারে কারও বেচাল দেখলে যাঁরা গ্রামের মুরুব্বি তাঁরা সমবেত হয়ে বোঝাবার, ফেরাবার চেষ্টা করতেন। বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বিবদমান দুই পক্ষকে মিলিয়ে দিতেন। রাগীকে শান্ত করতেন, নির্বোধে বোধ আনতেন। অলসকে কর্মমুখী করতেন। মদ্যপকে তিরস্কার করতেন। সকলেই সকলকে নজরে রখতেন বলে আমাদের শৈশবটা ছিল স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের গ্রামে, স্বপ্নের সবুজ মাঠে, স্বপ্নের জলাশয়ের ধারে, আমরা একদল শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম। আমাদের শৈশবে অরণ্যদেব, স্পাইডারম্যান, ম্যানড্রেক তখনও জন্মায়নি। আমাদের অরণ্যের একমাত্র অরণ্যচারী ছিলেন, শিশুদের চিরসখা মধুসূদন দাদা। আফ্রিকার অরণ্যে ছিলেন টারজান।

বহুকালের গুজব, বড় বড় ব্রিজ তৈরির সময় প্রতিটি শিল্পের ভিতে নরবলি দিতে হয়, তা না হলে ভেঙে পড়ে যায়। কিছুতেই গাঁথা যায় না। বড় বড় 'নর' কন্ট্রাকটাররা পাবে কোথায়, তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে নরশিশু নিয়ে গিয়ে বলি দিত। বালির ব্রিজ তৈরির সময় আমাদের গ্রামের অনেক শিশু না কি হারিয়ে গিয়েছিল। রটনা অবশ্যই। ভয়ংকর ভাবনার মধ্যে নির্বোধ আতঙ্কের একটা আনন্দ থাকে। সেকালের সঙ্গে একালের সেতু তৈরিতে একালের প্রায় সব শিশুকেই কেরিয়ারের হাড়িকাঠে বলি দেওয়া

হয়েছে। একালের মানবশিশুর শৈশব নেই।

আমাদের গ্রাম দেশবিভাগের পর জনঅরণ্যে পরিণত হল। হারিয়ে গেল মাঠময়দান। টলটলে পদ্মভাসা জলাশয় হয়ে গেল নিরেট ভূখণ্ড। চতুর্দিকে 'বড়ির' মতো বাড়ি। কাটা পড়ল আমবাগান, কুলবাগান। অলস এবং বেকার জমিদার পুত্ররা দেহজ্বালা জুড়াতে ডবল 'এ'-এ ডবল ডোজে ধার করা টাকা ঢেলে বিশাল বিপুল বাগানবাড়িতে একালের বেওসায়ী ঘুঘু চরিয়ে দিলেন। কড়িকাঠ আর হাত যশে লাকলাইন দড়ির কল্যাণে নিজেরা শহিদ হয়ে স্বর্গারোহণ করলেন।

বেওসায়ীরা ঘাস বোঝে না কাঠা আর বিঘে বোঝে। আকাশ বোঝে না ছাদ বোঝে। চাঁদ বোঝে না। বোঝে চাঁদি। অমন সুন্দর ছবির মতো জনপদ একটা 'প্রেটোয়' পরিণত হল। নতুন নতুন মানুষ এসে নতুন মূল্যবাধের চর্চা শুরু করল, যার মূল নীতি হল, 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম।' চতুর্দিকে ভুরু কোঁচকানো সন্দেহপ্রবণ মানুষ। কথা মানেই কলহ। স্পর্শ মানেই প্রহার!

শরৎ এসে কোথায় পা রাখবে! শিশির ঝরবে কোন ঘাসের ডগায়। কোন শিশু কচিকচি হাতে অজলি অঞ্জলি শিউলি তুলে নেবে! ঘাসে ডাকা সবুজ সেই মাঠ এখন স্মৃতি। ভোরবেলা যে মাঠে দাঁড়িয়ে পুজো আসার পনের দিন আগেই আমরা শুনতে পেতুম, দূরে, বহু দূরে মেঘলোকে কোথাও ঢাক বাজছে, মা আসছেন, মা আসছেন মেঘের ভেলায় চড়ে। রাজহাঁসে চড়ে আমাদের প্রিয় দেবী মা সরস্বতী। আমার নির্ভেজাল খাঁটি বাংলা স্কুলে পড়েছি। ত্যাগী এবং অতিশয় রাগী রাগী শিক্ষক মহাশয়েরা অতি সামান্য দক্ষিণায় সন্তানবৎ আমাদের মানুষ করার অক্লান্ত চেষ্টা করতেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর রাখতুম না। আমাদের স্কুল, আমাদের শিক্ষকমশাইরা ছিলেন আমাদের আপনজন। আমাদের সেকেলে নাম সব এমন ছিল, যা সহজেই বিকৃত করা যায় নেলো, ন্যাপলা, হেবো, সিবে। মাস্টারমশাইরা এই নামেই ডাকতেন। কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনেই বোঝা যেত শাসন না স্নেহ! সেই সরল, পবিত্র, সেকেলে শিক্ষকরা আমাদের মানুষ হওয়ার মন্ত্র দিতেন। শিক্ষা মানে জীবন। মানুষ দ্বিপদ, শিক্ষা চতুষ্পদ, জ্ঞান, চরিত্র, স্বাধীনতা, উদারতা। আমাদের বিদ্যালয় ঘিরে বিরাজ করত পবিত্র একটা গন্ধ। সেই পবিত্রতায় মা সরস্বতী এসে যখন আসন

বিছাতেন তখন আমাদের অবস্থা হত, ঘরেই থাকা দায়। একালে স্কুলের পুজোয় কেউ যায় না। লুচি, আলুরদম, বোঁদের স্ট্যাটাস নেই। পেটেও সহ্য হয় না। প্যাস্ট্রি, প্যাটিস, পিৎজা, রোলের যুগ।

সেই মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করতুম, মা আসছেন সপরিবারে। বড়রা বলতেন, 'দ্যাখ দ্যাখ কেমন পুজো পুজো রোদ। এই যে 'আকাশে বাতাসে তাঁর আগমনী'—এই বোধটা একালের মন থেকে হারিয়ে গেছে। একমাস আগেই মাঠে বাঁশ পড়ে গেল। মায়ের মণ্ডপ তৈরি হবে। বাঁশ তেমন ভাল জিনিস নয়, বড় হয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সেই কিশোর বয়সে বাঁশ দেখেই কি আনন্দ! মায়ের বাঁশ এসেছে। ধীরে ধীরে বাঁশের পাকাপোক্ত গঠনটি যেই খাড়া হল, আমাদের আর পায় কে! বাঁশ বেয়ে বানরের দল উঠে পড়ল টঙে। বাঁশ থেকে বাঁশে চোর-পুলিশ খেলা। নিচে বড়রা এসে হাঁকরে ওপরদিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের বাড়ির দুরন্ত শাবকটি টঙে ঝুলছে বিপজ্জনকভাবে। তিনি চিৎকার করছেন, 'নেমে আয় বাঁদর'। যে ঝুলছে সে জানে নামলেই বিপদ। পালের গোদা পটলা আরও ওপরে। সবাই বলছেন, ওটা বাঁদরেরও বাঁদর। ওইটার জন্যে সবকটা বাঁদর বখে গেল! তা না হলে এরা তো এত বাঁদর ছিল না।'

ওপরে ঝুলতে ঝুলতেই শুনতে পেতুম উদারপন্থী কেউ একজন, তিনি হলেন আমাদের সকলের সত্যেনকাকু, ব্যায়ামবীর, সাঁতরে গঙ্গা এপারওপার করেন, বলছেন,' 'বলাই! ভুলে গেছিস, আমরা আমাদের ছেলেবেলায় করেছি! মা আসার আগে রামচন্দ্রর বাহনদের পাঠিয়ে দেন।' ছেলেবেলার এই ধারাবাহিকতা হঠাৎ হারিয়ে গেল। এখন আর কেউ বাঁদর থেকে মানুষ হয় না। মানুষ থেকে বাঁদর হয়।

পর্যায়ক্রমে কানমলা ও ভারায় ওঠার মধ্যেই তেরপল চেপে যেত, যেন সার্কাসের তাঁবু। ঝুলে-থাকা নারকোল দড়ি মাথা উঁচিয়ে থাকা বাঁকাচোরা ছ'ইঞ্চি পেরেক। তেরপলের ফুটোয় ফুটোয় শরতের নীল আকাশের উঁকি। চেঁদো মাটিতে একটা বটি পুঁতে দিয়ে বলত, 'যা, বৃষ্টির পথ বন্ধ করে দিলুম। এই কায়দাটা আমি পঞ্চা গুণীনের কাছে জেনেছি।' একজন সন্দেহ প্রকাশ করলে, 'ব্যাং না বাটি!' লেগে গেল ধুন্ধুমার। গুণীন ইহলোকে নেই। তখন পেল্লায় পেল্লায় মানকচু গাছের ঝোপের তলা থেকে শেতলা একটা ব্যাং ধরে নিয়ে এল। জ্বলজ্যান্ত একটা ব্যাং-কে কবর দিলে,

সে তো মরেই যাবে। আবার গবেষণা। সিদ্ধান্ত হল বাটি। ব্যাংটাকে ছাড়ামাত্রই লাফ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে পিচ্ করে আমাদের গায়ে হিসি। গণেশ বললে, দেখলি তো, মানুষের কোনাদিন উপকার করতে নেই!'

চতুর্থীর মধ্যরাতে মা এলেন প্যান্ডেলে। গান করে আমাদের মায়েরা জাগিয়ে দিলেন, 'ওঠ ওঠ, মা এসে গেছেন।' ছোট্ ছোট্। ঘুম-ভাঙা চোখে আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি। দেবদেবীরা সামনে। তখনও গয়নাগাঁটি পরেননি। হাতের মুঠো আছে অস্ত্র নেই। এতেই যা রূপ খুলেছে! আর কিছুর দরকার নেই।

প্রত্যেকবার যা হয়, এবারেও তাই। মা লক্ষ্মী আর মা সরস্বতীর পোজিশান! কে বাঁদিকে, কে ডানদিকে! 'ডাক তারাদাকে। একবার বসে গেলে আর নড়ানো যাবে না!' শ্যামলকাকু বললেন, 'আরে আমি বলছি...'

'চুপ্, তুমি একটা কথাও বলবে না, তোমার জন্যেই আমাদের এই সন্দেহ। সন্দেহটা তুমিই তৈরি করেছ। গতবার সন্ধিপূজার সময় ধরা পড়ল, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্লেস চেঞ্জ করেছেন!'

'কিন্তু কি রকম ম্যানেজ দিলুম বল্! সরস্বতীর বীণাটা খুলে এনে লক্ষ্মীর হাতে, আর লক্ষ্মীর ঘটটা সরস্বতীর হাতে। প্যাঁচাটাকে স্রেফ এদিক থেকে ওদিকে, আর রাজহাঁসটাকে ওদিক থেকে এদিকে।'

একালে তো তাই হল। বিদ্যা আর বিনয় দেয় না, দুর্বিনীত করে। যে বিদ্যা শুধু না দেয়, সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়। বিদ্যা হবে অর্থকরী! স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায় কে তোমারে চায়! বাদ্যযন্ত্র, সরোদ, সেতার আমেরিকায় ডলারে বাজে। ছেলেবেলার অসুরকেই ভীষণ ভাল লাগত। কারণ, অসুর একেবারে আমাদের চোখের সামনে। গোলাগুলি ফুলিয়ে বুক চিতিয়ে বাস্তবভূমিতে। সিংহটা যেন তার পোষা কুকুর! আর মা দুর্গা সেই কোন ওপরে নাচের ভঙ্গিতে টাল খাচ্ছেন। অনেকটা পিছিয়ে না গেলে মুখ দেখা যায় না। আমরা বলাবলি করতুম, 'মায়ের খুব রিস্ক। ওইভাবে কেউ যুদ্ধ করে!' হারু যোগ করত, 'সিলিপ খেয়ে পড়ে গেলে মহা কেলো!'

সেকালের পুজো একালে মহাপুজোর রূপ নিয়েছে। ভক্তি, কল্পনা, টাকা চাপা পড়ে গেছে। মহাজলুস। প্রোমোটাররা পুজো প্রোমোট করছেন। ঘটের চেয়ে ঘটা বড়। প্রতিমার চেয়ে প্যান্ডেলের আকর্ষণই বড়। মা

কখনও হোয়াইট হাউসে, না হয় ভিক্টোরিয়ায়। পুজো এখন মার্কেট আর মার্কেটিং। ঢাক বাজালে একালের শিশুদের বুক নেচে ওঠে না। ইন্টারনেটে পুজো দেখা।

তাঁতের লালডুরে খড়খড়ে শাড়ি পরা মায়েরা কাঁখে তাঁর শিশুটিকে নিয়ে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। শিশুটির একটি পা পেছনে দুলছে। কাজল চটকানো মুখ। মুখে বুড়ো আঙুল। পৃথিবীর মা অনিমেষে জগতের মাকে দেখছেন। একালে মা যাদের কাছে পাহাড় ছেড়ে আসেন তারাই সব পাহাড়ে পালায়। একালের কেউ কাঁদতে কাঁদতে বলে না—'মা আবার এসো!'

উত্তর

সব কাজ শেষ হতে হতেই সন্ধ্যা নেমে এল। হিমাংশুবাবু একেবারে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। সংসারের এক পাশ থেকে, যেন টুক করে গাছ থেকে খসে পড়ে গেল একটি পাকা ফল। এত সফল মানুষের বিশাল এই পৃথিবী থেকে বিফল এক মানুষের চিরবিদায় ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। অমন কত হিমাংশু আসে-যায়! আমিও ওই দলেই পড়ি।

বড় চাকরি করতেন সায়েব কোম্পানিতে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মোটা মাইনে। বনেদী, সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। সুপুরুষ। ভাল ঘরে বিয়েও করলেন। জীবনের একমাত্র নেশা ছিল সংগীত। মার্গ সংগীতে ক্রমশই উন্নতি করতে লাগলেন। নামকরা দুই ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ আর খেয়াল শিখলেন। সংগীতের ব্যাকরণ আর পরিবেশন, উভয় দিকেই সমান ওস্তাদ। তাঁর কালের বড় বড় অনুষ্ঠানে হিমাংশুবাবু ছিলেন গভীর রাতের শিল্পী। এইটাই ছিল তাঁর কদরের প্রমাণ।

সংগীতের জগতের প্রবল আকর্ষণে বাঁধা মাইনে অমন চাকরিটা ছেড়ে দিলেন।

শ্মশান-সঙ্গীরা বলাবলি করতে লাগলেন, মানুষটা নিজেও ডুবলো,

সংসারটাকেও ডুবিয়ে গেল। ছেলেটা অমানুষ, মেয়েটার বিয়ে হয়নি ভাই দুটো স্বার্থপর। আরে গান, রাখো তোমার গান। কে জানবে ক্ল্যাসিক্যাল গান। দরবার কোথায় যে দরবারি গাইবে। ভোর হতে না হতেই মানুষ ছুটছে ধান্দায়, তখন কার দায় পড়েছে ভৈরবী শোনবার। হিন্দি ফিলমি গানের যুগ, সেখানে জিভ ছোলা গান চলে।

হিমাংশু ছাই হচ্ছেন, এদিকে সমালোচনা চলেছে। একজনও প্রশংসার কথা বলছে না। মানুষটার কোনও গুণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জীবনটা ভুলে ভরা। আত্মঘাতী এক মানুষ। তুমি চাকরি ছাড়লে বেশ করলে, তোমার কি দরকার ছিল সাধুসঙ্গ করার! যোগ আর প্রাণায়াম করতে গিয়ে মাথাটা বিগড়ে গেল।

বিগড়ে গেল মানে? ফুল ম্যাড! একদিন আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, ওরই মেয়ের পাত্র দেখতে। আমারই পরিচিত একটি ছেলে। দু-দশ পা হাঁটে আর দাঁড়িয়ে পড়ে ডান পা'টা একবার করে ঝেড়ে নেয়। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কি হচ্ছে! বললে, আমার ডান পা'টা মাঝে মাঝে ছোট হয়ে যায় তখন ঝেড়ে ঠিক করে নিতে হয়।

সবাই হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

আমার আর সহ্য হল না। সরে গেলুম গঙ্গার ধারে। আমার চোখে হিমাংশুবাবু একজন বড় সাধক। আমি তাঁর অনেক প্রমাণ পেয়েছি। জীবনের শেষ কুড়িটা বছর তাঁর সঙ্গে থেকে আমার মনে হয়েছিল, এই মানুষের সংসার করা উচিত হয়নি। আলু, পটল, ঢেঁড়সের জগতের মানুষ এঁরা নন। জাতশিল্পী, জন্মসাধক। ভুল করে সংসারে ঢুকে পড়েছিলেন। সারাটা জীবন তারই খেসারত দিতে হল।

সেই দিনটির কথা এই মুহূর্তে বড় বেশি মনে পড়ছে।

আমাকে নিয়ে গেলেন বীরভূমের এক নির্জন শ্মশানে। সেখানেই থাকতেন তাঁর তান্ত্রিক গুরু। সেটা ছিল গ্রীষ্মকাল। সেবার গরমও পড়েছিল খুব। চারপাশ জ্বলে যাচ্ছে যেন। সকাল আটার পর রোদের দিকে তাকানো যায় না। শ্মশানের ধার দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদীটা শুকিয়ে কঙ্কাল। বালির ওপর শ্মশানের পোড়া কাঠ, শবের ছাই ছড়িয়ে আছে। দেখলেই ভয় করে। মৃত্যু আমাদের ভেতরই আছে, ঘুরছে-ফিরছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, তখন ভয় করে না, যেই বাইরে বেরিয়ে এল অমনি ভয়ে মরি। শ্মশানটার কোনও

সীমা-পরিসীমা নেই। যে যেখানে পারে চিতা সাজিয়ে শবদাহ করে যায়। আধপোড়া বাঁশ ভাঙা কলসি, ছেঁড়া কাপড় ছড়িয়ে পড়ে থাকে। দিশি মদের বোতল যত্রতত্র। ব্যবহৃত গাঁজার কল্কে। এক পাল তাগড়া কুকুর। শুকনো নদীর কিনারায় ধ্যানস্থ শকুন। নদীর ওপারে ধূসর একসার পাহাড়। যত্রতত্র টিলা। ওইরকম এক ভয়ঙ্কর জায়গায় সেই তান্ত্রিকের আস্তানা। তাল তাল পাথর সাজিয়ে চারটে দেওয়াল, মাথার ওপর পাতার ছাউনি। লম্বা একটি বাঁশের মাথায় লাল একটা পতাকার পত পত। একপাশে বিশাল একটা ত্রিশূল পোঁতা। নিকানো উঠানে একটা তাগড়া হাঁড়িকাঠ। বলির রক্তে মাটিটা লাল রজনের মতো চকচক করছে। আর একপাশে বিশাল একটা হোমকুণ্ড। সবচেয়ে মারাত্মক সেই গুহার মতো ঘরে মায়ের মূর্তিটি। ছিন্নমস্তা। এক হাতে তাঁর নিজের কাটা মুণ্ড। গলা থেকে ফিনকি রক্তের ধারা মুখে এসে পড়ছে। এই ধারা তৈরি করা হয়েছে লাল রঙের তার দিয়ে। মূর্তির বেদীতে সর্বক্ষণ জ্বলছে বড় একটা প্রদীপ। এরই মধ্যে লোভনীয় তান্ত্রিকের একমাত্র শিষ্যা। কত বয়স হবে! পঁচিশ কি তিরিশ! এলো চুল। শ্যামলা রঙ। ধারালো মুখ। নর্তকীর মতো সুঠাম শরীর। হাসলে ঝকঝকে একসার দাঁত বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। পাতলা দুটো ঠোঁট। একটা মানুষকে পাগলা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ধর্ম আমি বুঝি কি বুঝি না, জানি না। তবে এইটুকু বুঝি, আমার একটা দেহ আছে, মন আছে ইন্দ্রিয় আছে আর আছে প্রেম। কি অদ্ভুত মিলন! একদিকে মৃত্যু, আর একদিকে সেই শ্যামাঙ্গী। তার ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো অদ্ভুত সেই হাসি। বড় প্রেমে পড়ে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, তার পেয়ারের কুকুরটাকে সরিয়ে আমি যদি সেই জায়গাটা নিতে পারতুম। তান্ত্রিকদের, ভৈরবীদের একটা সিদ্ধাই থাকে, তার মধ্যে বশীকরণ একটা।

হিমাংশুবাবুর তান্ত্রিক গুরুকে বাইরে থেকে ভয়ঙ্কর মনে হলেও, ভেতরে একজন প্রেমিক ছিলেন। আসন ছেড়ে যেই উঠে দাঁড়ালেন, প্রায় ছ'ফুট লম্বা দশাসই এক মানুষ! বুক সিঁদুরের মতো লাল। মুখমণ্ডল অগ্নিভ। চোখ দুটো থকৃথকে লাল। ভয়ে আমি কথাই বলতে পারতুম না, আমার যা কিছু কথা, সবই হত ওই তারার সঙ্গে। তার নাম ছিল তারা।

তান্ত্রিক নিজেও উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। ওই আশ্রমে সবই

ছিল, হারমোনিয়াম, একজোড়া তম্বুরা, পাখোয়াজ, খোল, তবলা, মৃদঙ্গ। কোথা থেকে বোধহয় নদীর ওপারে পাহাড়ের দিক থেকেই দুটি আদিবাসী মেয়ে আসত। তারাই সংগ্রহ করে আনত হোমের কাঠ, রান্নার কাঠ। তারাই রাঁধত, আশ্রমের অন্যান্য কাজ সব তারাই করত।

এই শ্মশানেই অমাবস্যার মধ্যরাতে হিমাংশুবাবুর কণ্ঠে মালকোষ শুনেছিলুম। ভূত নামানো রাগ। সত্যিই তাই। মিশকালো আকাশে ঝাঁক-ঝাঁক তারা। দূরে দূরে প্রহরীর মতো পাহাড়ের জমা অন্ধকার। সদ্য নির্বাপিত চিতার পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়া। প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে আসা খড়খড়ে বাতাস।

একজোড়া তম্বুরার একটা আমার হাতে, একটা তারার হাতে। পাখোয়াজে সেই তান্ত্রিক গুরু। বিস্তারে আলাপে মালকোষের রূপ ক্রমশই খুলছে। পাহাড়ের কোলে শেয়ালের ডাক। বিচিত্র এক হাহাকারের মতো। দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে সুরের একটা মণ্ডল তৈরি হল। মা ছিন্নমস্তার তারের ফিনকি সুরের তরঙ্গে থির-থির করে কাঁপছে। রাত যত বাড়তে লাগল ততই মনে হতে লাগল একটা অলৌকিক জগতে প্রবেশ করেছি। অশরীরীদের খিল-খিল হাসি যেন কানে আসছে। শীত শীত করছে। সারা দেহে রোমাঞ্চ। ওই রাতেই বুঝেছিলুম, হিমাংশুবাবু সুর-সিদ্ধ। এমন মানুষ কখনও সংসারী হতে পারে না।

কেউ কেউ বলতে লাগল, ওই তন্ত্র হিমাংশুবাবুর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তন্ত্র তা নয়, গাঁজা, ভাং, কারণ-বারি আর রমণী। তা না হলে অমন চাকরি ছেড়ে কেউ সংসারটাকে পথে বসায়! যে যা বলুক, আমি জেনে গিয়েছিলুম, হিমাংশুবাবু একজন গায়ক নন, তিনি সিদ্ধপুরুষ। রাগ-রাগিনীর রূপ দর্শন করেছেন তিনি। তিনি অস্বীকার করলেও আমি তার সাক্ষী। এই বীরভূম আশ্রমেই। ভোরবেলা ভৈরবী গাইছেন কুঠিয়ার পেছন দিকের চাতালে। পাকুড়, বট, অশ্বত্থের ডালপালার আচ্ছাদনে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করেও ফুটছে না। বড় মায়াবী লাগছিল সেই স্থানটিকে। চরাচরে ব্যস্ত হয়ে আছে মিহি চাদরের মতো শেষ রাতের কুয়াশা। আমি অনেকদূরে একটা পাথরের ওপর বসেছিলুম আপাদমস্তক একটা চাদরমুড়ি দিয়ে। একটা আচ্ছন্ন ভাব। কিছুটা ঘুমে, কিছুটা সুরের মোহিনী-মায়ার প্রভাবে। হঠাৎ মনে হল, চাতালের একপাশে মিহি সাদা ওড়না গায়ে সুন্দরী

এক রমণী বসে আছে, পিঠে ছড়িয়ে আছে রেশমের মতো কালো চুল। ভাবছি, কে এই সুন্দরী! এ তো তারা নয়, অন্য কেউ। চোখের ভুল নয় তো! হতে পারে, শেষ রাতের ঘুম লাগা চোখ এক চিলতে স্বপ্ন পাশ থেকে উড়ে আসতে পারে। কারণও আছে। তারা আমাকে গুণ করেছে, খুন করেছে। কাল আমরা দুজনে হেঁটে নদী পার হয়ে ওই দূর পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ওখানে তারার জন্য একটা গুহা আছে। অদূরেই আছে অবহেলিত একটি ভৈরব মন্দির। স্থানীয় মানুষ বলে 'ভৈরবতান'। অতীতে সেখানে নরবলিও হত। বছরে একবার শিবরাত্রির দিন এখানে এক ভৈরব আসেন। একটা জমায়েত হয়। সারা রাত পূজা হয়, পরের দিন আবার সব ফাঁকা। কেউ জানে না কে এই ভৈরব, কোথা থেকে আসেন! রটনা স্বয়ং মহাদেব এসে নিজের পূজা নিজেই করে যান। সাহস করে যারা আসতে পারে তাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

তারা এই 'ভৈরবথানে' মাঝে মাঝেই আসে। যার পাশেই এই গুহা। সঙ্গে দশ-বারোটা আলু এনেছিল। কাঠকুটা জ্বেলে আলুগুলো তার মধ্যে ফেলে দিয়ে আমাকে বললে, তুমি এগুলোকে উলটে-পালটে পোড়াও আমি ততক্ষণে পূজাটা করে আসি। এখানে আর কোনও ভয় নেই, একমাত্র ভয় বিষাক্ত সাপ। যদি দু-একটা আসে ভয় পাবে না, স্থির হয়ে বসে থাকবে আর বাবার নাম করবে।

সেই আগুন, সেই ধোঁয়া, আলুপোড়ার সোঁদা-সোঁদা গন্ধ, তারার দীঘল শরীর, থেকে থেকে হাসির বিজলি ঝিলিক, নদীর কৃপণ জলধারায় গা ডুবিয়ে চান—সারাটা দিন সংসার-মুক্ত এক অদ্ভুত আনন্দ। ঈশ্বরকে দেখিনি, দেখবও না কোনোদিন, কিন্তু তারাকে দেখিনি, এ-কথা বলার উপায় নেই। সর্বাঙ্গ দেখেছি, সর্বত্র দেখেছি, স্বাদে ও ঘ্রাণে। কালো শীতল পাতের শুয়ে থাকা শরীরের বাষ্প ছাপ, এক এক করে সব ত্যাগ, সমস্ত লজ্জা হতে মুক্তি, আবার লজ্জায় ফিরে আসা, হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসে থাকা। ঈশ্বরকে বুঝতে না পারলেও, রোদে জ্বলে যাওয়া ওই দুপুরে কুণ্ডলিনী শক্তিকে বুঝতে পেরেছিলুম—সাপ কি ভাবে জেগে উঠে ফণা তুলে ছোবল মারে! সেই ছোবলে বিষ থাকে না অমৃত। তারা বলেছিল, গুহায় সাপ আছে।

মাস্টারমশাইয়ের সামনে যিনি বসে আছেন, তিনি তারা নন। ভোরের

মতই স্নিগ্ধ, উদাস কেউ একজন। মনের কতরকম সন্দেহ। হঠাৎ মনে হল, মাস্টারমশাই কি এরই জন্যে সংসার ভুলে এখানে ছুটে ছুটে চলে আসেন, এই বিধবা সুন্দরীর জন্য। প্রথমে ভেবেছিলুম তারার আকর্ষণে। তারা নয়, এই রমণীই আকর্ষণ।

পুবের অন্ধকার আকাশ যেই আলোয় ফাটব-ফাটব হয়েছে, গান যেই শেষ হয়েছে, অবাক হয়ে দেখছি, সেই মহিলা আর নেই। একটা কুয়াশার আঁচল ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। মাস্টারমশাই তম্বুরাটি কাঁধে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন সদ্যফোটা ভোরের আলোয়।

মাস্টারমশাইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কি দেখলুম!'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি দেখেছ? রাগিনী ভৈরবী। আসেন, শেষ রাতে আমার কাছে গান শুনতে আসেন। তুমি কারোকে বোলো না ভাই। তুমি হয়ত আরও অনেককে দেখবে, তোমার সেই চোখ আছে, কিন্তু ভুলেও বলবে না কারোকে, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

'আর কারা আসেন?'

'বেহাগ, ইয়ামন, বাগেশ্বরী।'

'কেন আপনি কনফারেন্সে গান করেন না!'

'কানফারেন্সে!' হিমাংশুবাবু হাসলেন, 'গান কি বেগুন, না কলা, যে হাটে বসে বিকবো! আমার সেই গানের লাইনটা মনে কর, গান শোনাবে তাকে যিনি দিন দুনিয়ার কাণ্ডারী। আমি ভগবানকে গান শোনাই শ্মশানে বসে, যেখানে জীবনের পাশে মহাশ্মশানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কী দর্শন করেছিলেন!'

'না,' বলেছিলুম। জানি না আমি। অত বিস্তারিত লেখা-পড়া আমার নেই। আমার জীবন বড় এলোমেলো, ছন্নছাড়া। আমার লেখাপড়া পাশ করে চাকরি পাওয়ার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে নয়। ভালবাসি গান। সুর আমাকে আর একটা জগতে নিয়ে যায়, ঝকঝকে তারা-ভরা আকাশে, পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়া ঝরনায়, ঢেউ ভাঙা সমুদ্রে।

মাস্টারমশাই চুপ করে আছেন দেখে বললুম, 'বলুন না, কী দেখেছিলেন ঠাকুর?'

'মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়েছেন। গঙ্গায় নৌকোভ্রমণ হচ্ছে। মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে নৌকো এসেছে, পাশেই মহাশ্মশান, সারসার

চিতা জ্বলছে। ঠাকুর বেরিয়ে এলেন নৌকোর গলুই থেকে, টলবল করতে করত এগিয়ে যাচ্ছেন নৌকোর ধারে। মাঝিরা ধর ধর করছে, টাল খেয়ে জলে না পড়ে যান। মথুরবাবু আর হৃদয়বাবু দু'জনে দু'পাশ এসে দাঁড়িয়েছেন। ধরতে হল না, ঠাকুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চিতা দেখছেন। সার সার জ্বলছে... কী দেখলেন, সে-কথা পরে বললেন মথুরবাবুকে। আমি মুখস্থ করে রেখেছি তাঁর জীবনী থেকে, মাঝে মাঝে নিজেকে শোনাই।'

মাস্টারমশাই কিছুক্ষণ নিজের ভাবে বসে থেকে এসই অংশটি শেনালেন : আমারও মুখস্থ।

'দেখিলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারক-ব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবনের অপর পার্শ্বে সেই চিতার ওপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার-বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন।'

এই শ্মশানে এসে হিমাংশুবাবুকে চিনেছিলাম। বিরাট এক সাধক। সংসার তাঁর জীবনের করুণ এক দুর্ঘটনা। অনেক চেষ্টা করেছিলেন সংসারী হওয়ার। পারেননি। চাকরি গেল। সংগীতের আসরে কেউ ডাকলে না। ছাত্র-ছাত্রীদের এমন গুরু পছন্দ হল না, যাঁর নাম নেই, প্রচার নেই, গ্ল্যামার নেই। বাকিরা সাহায্য করার ভয়ে আলাদা করে দিলে। অর্ধাহার, অনাহারে দিন কাটে। ছেলেটি বিগড়ে গেল, মেয়েটির লেখা, পড়া, বিয়ে কিছুই হল না। বউদি চলে গেলেন ক্যানসারে। তাঁর চলে যাওয়ার রাতটা আজও আমার মনে আছে। সুন্দরী ছিলেন। বহুলোক, বিশেষ করে হিমাংশুবাবুর অত্মীয়-স্বজনেরা আমার খুব বদনাম করতেন। আমার মতলব খুব খারাপ। মা আর মেয়ে দু-জনকেই ভোগ করছি। ব্যঙ্গ করে আমার নাম রেখেছিল, ঝাঁপতাল। বলত, ফাঁকতালে ঝাঁপতাল মারছি। এর বেশি তাদের আর কিছু করার ছিল না। বউদির ক্যানসার হয়েছিল লিভারে। সেই প্রাচীন রূপকটি আজও কত সত্য। মাকড়সা আর ব্যাধি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করে নিলে কে কোথায় আশ্রয় নেবে। মাকড়সা বললে, আমার একটু বড়সড় জায়গা চাই, ঝুল তৈরি করতে হবে তো, আমি রাজবাড়িতে

যাই। অসুখ বললে, ঠিক আছে যাও, আমার আশ্রয় তো ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ি নয়, আমার আশ্রয় রক্ত-মাংসের খাঁচা। মাকড়সা রাজপ্রাসাদে গিয়ে জাল বোনে, আর শত শত ভৃত্য রোজই ঝুল-ঝাড়ু দিয়ে সেই জাল লুটে নিয়ে যায়। এদিকে ব্যাধি আশ্রয় নিয়েছে খেটে-খাওয়া গরিব এক রমণীর শরীরে। অসুখ ভেবেছিল, কত কাণ্ডই না হবে! ডাক্তার-বদ্যি আসবে, ভাল-ভাল, দামী-দামী ওষুধ খাওয়াবে। কোথায় কি! সেই পানাপুকুরে চান, পান্তাভাত, সেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম। পাত্তাই দিচ্ছে না! তখন মাকড়সা আর ব্যাধি জায়গা বদল করলে। ও এল গরিবের আটচালায়, এ গেল রাজবাড়িতে গরিবের কুঁড়েতে ঝুলের সমাদর। তুমিও ঝোলো, আমিও ঝুলি। রাজপুরুষদের শরীরের অসুখের মহা খাতির। ডাক্তার, বদ্যি, ওষুধ-পথ্য।

বউদি প্রথমটায় পাত্তাই দিলেন না। অম্বল, বদহজম, অমন কতই হয়! যার হাঁড়ি চড়ে না তার আবার ডাক্তার-বদ্যি। একটা বছর টোটকা। আস্তে আস্তে পেট ফুলছে। নোংরা লোকগুলো বলতে লাগল, পাপ কি আর চাপা থাকে, বিশেষ করে এইসব পাপ! আরও অশ্লীল ভাষায় বলেছিল, যার অর্থ দাঁড়ায়, উত্তেজনার মুহূর্তে আবরণী ফেটে যায়, অথবা ব্যবহার করার কথা মনে থাকে না। তিনটেই তো উপোসী ছারপোকা।

তিনটের লক্ষ্য, কে, কে! এক নম্বর আমি, দু'নম্বর বউদি, তিন নম্বর তাঁর মেয়ে। একটা পরিবারের অত সেবা কি বিনা প্রসাদে হয় বাবা! আরও অশ্লীল ইঙ্গিত—পাঁউরুটির লোভেই কুকুর ন্যাজ নাড়ে। এইখানেই শেষ নয়, এইসব ইতরজনেরা আরও এক ধাপ এগোলেন। হিতাকাঙ্ক্ষী যেন কতই—'হ্যাঁ গো, কোথায় হবে, নার্সিং হোমে না হাসপাতাল। হাসপাতাল হলে আগেই নাম লেখানো আছে তো!'

দেখতে দেখতে পা ফুলে গেল। দেহ রক্তশূন্য। অবশেষে নিয়ে গেলুম বড় এক ডাক্তারের কাছে। দেখে বললেন, 'করেছেন কি?' আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'কিছুই করার নেই। লিভার ক্যানসার।' সব শুনে হিমাংশুবাবু বললেন, 'ভালই হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। আমি জেলার, আমি কংস। তালা খোলার চাবি আমার কাছে ছিল না। বসুদেব এসেছেন ক্যানসার হয়ে।' বসে রইলেন চুপ করে। শুরু হল আত্মীয়স্বজনদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। 'তানপুরা ঘাড়ে নিয়েই ভাবলে তানসেন

হয়ে গেছি। রোজগারের মুরোদ নেই সংসার! ব্যাটা পাষণ্ড! চোখ বুজিয়ে সারাদিন সুর ভাঁজছে! গলা দিয়ে সুর বেরোয় না। গান গাইছে না ডিঙি বাইছে!' একদিন বলেই ফেললুম, 'তোমরা ইতিহাস জান না, জানলে এসব কথা বলতে না। এককালে হিমাংশুবাবু ছাড়া ফাংসান হত না। সংগীতের জগতের দলাদলি আর নোংরামিতে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন।' পালটা আক্রমণ হল, 'কোন কালে? কালিদাসের কালে? ঢুকলেন কবে যে বেরোলেন।'

বউদি মারা যাওয়ার আধঘণ্টা আগে আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলে, 'তুমি ওকে একটু দেখ, বালকের মতো নিরীহ মানুষ সুরপাগল। জগৎ-সংসারের কিছুই বোঝে না। আর ওই অসহায় মেয়েটি রইল।' এইটুকু বলার পরই যন্ত্রণার আর্তনাদ। তারপরেই শেষ। তারপরেই প্রশান্ত মুখচ্ছবি। সব যন্ত্রণার অবসান।

শ্মশান থেকে বাড়ি সামান্যই পথ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি। তৃষা! রাস্তায় আলো জ্বলে না। বিশ্রী রকমের স্যাঁতস্যেঁতে একটা অন্ধকার। একটানা দুটি বছর দু'হাতে বাবাকে সেবা করে করে আজ ভারমুক্ত। এতদিন একটা কর্তব্য নিয়ে ছিলে টান ধনুকের মতো হয়েছিল, আজ একবারে নেতিয়ে পড়েছে। বিশ্বসংসারে কেউ নেই। একটি মাত্র ভাই বিয়ে করে বহুদিন আলাদা। একবারও আসে না, আজও আসেনি।

—এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চলো, ভেতরে চলো।

তৃষা এই আহ্বানটুকুর অপেক্ষায় ছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ভেতরে যেতে বললেও আমি জানি ভেতর বলে কিছু নেই। হিমাংশুবাবুর এই বিষয়-সম্পত্তির বহু শরিক। তৃষার এখানে স্থান হবে না। আজ হোক কাল হোক, পথে তাকে নামতেই হবে। মায়ের মতোই রূপসী ছিল। এখন সে রূপের কিছুই নেই। শীর্ণ হয়ে গেছে। মুখের লাবণ্য ঘুচে গেছে। বাবার মতোই মৃত্যু স্বভাবের মেয়ে। দস্তুর পৃথিবী আর একা এই মেয়েটি মুখোমুখি।

ঘরে বিশাল খাটটিতে শূন্যতার হাহাকার। মাস্টারমশাইয়ের শেষ সিল্কের পাঞ্জাবীটি হ্যাঙারে ঝুলছে। দেওয়ালে বউদির যৌবনবেলার ছবি। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত সেই তম্বুরাটি। কয়েকদিন আগে পাঁচ

কেজি সরু চাল, দু-কেজি মুগের ডাল, তেল আর আলু কিনে দিয়েছিলুম। হয়ত আছে।

চায়ের ইচ্ছা হচ্ছে। জানি যোগাড় নেই।

তৃষা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। সব গেছে, মায়ের মতো চুলের ঢলটি ঠিক আছে। আমি একটা ভাঙা চেয়ারে বসে আছি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। দূরে একটা বাড়িতে টিভি চলছে। পর্দায় আলো লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে।

তৃষা হঠাৎ বললে, 'আমার কি হবে?'

বড় অসহায়, বড় করুণ শোনাল তার গলা। কি হবে? কে জবাব দেবে? আমারই বা কি হয়েছে! ত কিছুই তো হওয়ার ছিল! কিছুই হয়নি। কোনোরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। মনে মনে বললুম, আমার ফুটো নৌকোর যাত্রী হবে তৃষা! তোমাকে বাঁচাতে না পারি, তোমার সঙ্গে মরার একজন সঙ্গী দিতে পারি।

মুখে বললুম, 'কেটলিটা দাও, চা আনি।'

তৃষা বললে, 'ঠিক দু'দিন হল।'

—কি হল?

—উপোস।

রাস্তার কোলাহলে পা রাখতেই কানে বাজল মাস্টারমশাইয়ের শেষ কথা, 'তৃষিত, আমি চলে যাবার পরেও কনসার্ট চলবে।' ফিরে আসছি, অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে উঠছি, হঠাৎ মনে হল, একটা কেটলি, দু'কাপ চা! তৃষা! উত্তর পেয়ে গেছি!

জাল

বাঁ-পাশে নদী। নদীটার সুন্দর একটা নাম। কে রেখেছিল, কবে রেখেছিল কেউ বলতে পারবে না। তারা নেই, নদীটা আছে। নদীর নাম ঝুমকি। ডান পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে বরাবর। আর একটু পরেই সন্ধে হবে। আমি হাঁটছি। শীত-শীত বাতাস। শীত আসতে আর দেরী নেই।

এদিকটায় লোকজনের তেমন বসতিও নেই। শহরের বাইরে। স্টেশান অনেক দূরে। দুপুর-দুপুরেই আসার কথা ছিল। ট্রেনটা এত লেট করল, যে বেলা শেষ হয়ে এল। শীতের বেলা ঝপ করে শেষ হয়ে যায়। ইচ্ছে করেই হাঁটছি কারণ, এই পথটা আমার স্মৃতির পথ। এই পথে ছোট ছোট নুড়ির মতো পড়ে আছে আমার অতীত জীবন। যে জীবন নিয়ে কেউ কোনওদিন ইতিহাস লিখবে না। স্ট্যাচু করে মালা পরাবে না গলায়।

এই শহরে আমার বাবা ছিলেন মস্ত এক মানুষ। মিশনারি স্কুলের নামকরা প্রিন্সিপাল। আমাদের সুন্দর একটা বাংলো ছিল। সুখের সংসার ছিল সুন্দর। আমার মা ছিলেন ভারি মিষ্টি। আমার বয়েস যখন ছয় কী সাত, তখন এক বছরের মধ্যেই বাবা আর মা দু'জনেই মারা গেলেন।

এই নদীর নাম ঝুমকি। এই নদী বলতে পারবে, জীবন কেন চলে যায়! কেউ কেউ পৃথিবীতে এসে কেনই কেবল দুঃখ পায়। আমি বলতে পারব না। মানুষের চোখ দুটো সামনে, সে কেবল আগতকেই দেখবে, বিগতকে দেখতে পাবে না। কেন এল, কি নিয়ে এল, কি পেতে এল, প্রশ্ন আছে, জবাব নেই। সন্ধান আছে, প্রাপ্তি নেই!

ঝুমকির একেবারে কিনারায় সেই কুঠিয়া। ওখানে একজন থাকে, যাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। তার সাধুর মতো জীবন, জীবিকা কিন্তু মাছ ধরা। তার কেউ নেই, কিন্তু আমার মতো 'কেউ নেই, কেউ নেই' বলে মন খারাপ করে জীবনটাকে বরবাদ করতে চায় না। সে বলে, আমার নদী আছে। সে আমার মেয়ে ঝুমকি। সে বলে, আমার কত গাছ আছে, কত বড় বড় মাঠ আছে। আমার একটা ছোট্ট পাহাড় আছ। রাতে আমি তারাদের মালিক, পনেরো দিনের জন্যে আমার সঙ্গে গল্প করতে আসে আমার সেই ছেলেবেলার চাঁদমামা। কী বলো তুমি, আমার কেউ নেই! এরা তো তোমারও। তুমি কেবল নেই, নেই করেই গেলে।

সে আমার ললিতদা।

কুঠিয়ার সামনেটা ফাঁকা। ঘুরে পেছন দিকে গেলুম। একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে সে। জাল বুনছে একমনে আর গান গাইছে গুনগুন করে। যখন যা মনে আসে সেইটাকেই গানে ফেলে সুর চড়িয়ে দেয়।

আমার দিকে চোখ না তুলেই বললে, 'অনেকদিন পরে এলে?'

'অনেক চেষ্টায় একটা চাকরি পেয়েছি।'

'কী চাকরি?'

'রংকলে।'

'বাঃ, খুব ভাল কথা। রং? সে তো খুব ভাল জিনিস! লাল, নীল, হলদে, সবুজ! তাহলে খুব আনন্দে আছ বলো?'

'আট ঘণ্টা ডিউটি, আর রঙের গন্ধে বুকটা কেমন করে! রাত্তিরে মাথা ধরে।'

'সে আর কী করবে, তুমি যদি সাধ করে শহর চাও, শহর তামাকে জ্বালা দেবে। আমার মতো মাছ ধর, আরামে থাকবে। নদীর মিষ্টি গন্ধ! আমি যে রুপোর কারবারী আর তুমি হলে রূপোর।'

'রুপোর কারবারী মানে?'

'মাছ কী তুমি দেখো নি! রুপোর তবক মোড়া মাছ।'

'আমি কী মাছ ধরতে জানি?'

'ওর আর আবার জানাজানি কী! কোমর জলে নামবে, জালখানি ঘুরিয়ে ফেলে দেবে জলে, তারপর টানবে। টানতে টানতে আনবে কোলের কাছে। তিন খেপ মারলেই একটা লোকের পেট চলে যাবে। তবে তুমি যদি খুব ভাল খেতে চাও, আবার যদি মদ খেতে চাও, কাপ্তেনি করতে চাও, আবার যদি মেয়েছেলে চাও, তাহলে তোমাকে যন্ত্রের কাছে যেতে হবে, তোমার বুক চেপে ধরবে, মাথা ধরবে, তুমি কত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে! চার দেয়ালের খাঁচায় তুমি মরার আগেই মরে যাবে, ভূত হয়ে বেঁচে থাকবে। তা, সে তোমার ব্যাপার। কী মনে করে এলে! দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভালই আছ হে!'

'তুমি তো জানো, এখানে আমার নাড়ির টান। আমি যে এইবার বিয়ে করব। সংসার করব। একটা কপালে একটা সোনালি টিপ, একটা নাকে পাথর বসানো একটা নাকছবি, দু-চোখে কালোজলের টলটলে দীঘি, সেখানে তোমার চাঁদ সাঁতার কাটতে নামবে পূর্ণিমার রাত্তিরে।'

'সে কে? শুনি তো সে কে?'

'তাকে তুমি দেখেছ। সে এখানেই থাকে। ওই চার্চের অরফ্যানেজে।'

'নাম কী তার?'

'ডোনা।'

'সে তো খুব ভাল মেয়ে। আমার কাছে আসে। এই একা সেদিন চাঁদের আলোয় আমাদের ফিস্ট হল। আমরা দুজনে। খুব ভাল রাঁধে তো। তবে তোমাকে বলে রাখি, আমার মতো কেউ রুটি তৈরি করতে পারবে না। একেবারে তুলো। আচ্ছা তুমিই বল, আমি যদি ওকে মশলাটা ওইভাবে পিষে না দিতুম তাহলে মাংসটা কী অত ভাল হত! শোনো, অহংকার মোটেই ভাল না। আমার মশলাটা যদি ভাল না হত তাহলে ডোনা কী করত! এ-কথা আমি অস্বীকার করছি না যে ডোনা ভাল রাঁধে না, তবে কী জান, আমার মতো খিচুড়ি কেউ রাঁধতে পারবে না। ডোনাকে এ-কথাটা তুমি বলতে পার, তবে আগের কথাগুলো না বলাই ভাল, কেন জান, অহংকার করা ভাল নয়। কিসের অহংকার, তবে এ-কথা ঠিক, ডোনার মতো টোম্যাটোর চাটনি কারও ক্ষমতা নেই করে। তুমি ডোনাকে এখন বিয়ে করতে যাচ্ছ? আমার কাছ থেকে মেয়েটাকে কেড়ে নেবে! ও তো মেয়ে নয়, ও নদী, ও পাখি, ও গাছ, আকাশ, বাতাস, তারা।'

'ফাদার আমাকে বলেছিলেন, যেদিন তুমি একটা চাকরি পাবে, যেদিন তুমি প্রমাণ করতে পারবে, তুমি তোমার রোজগারে সংসার চালাতে পারবে, সেইদিন তোমার হাতে ডোনাকে তুলে দেব। আমি সেই প্রমাণ দাখিল করতে এসেছি।'

'ফাদার ডেভিসের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওই ফাদার তো ভগবান। সেবার আমার অসুখ করেছিল। করতেই পারে। শরীর থাকলেই করবে। এতে তো লজ্জার কিছু নেই। আমার কিন্তু খুব লজ্জা করেছিল, ফাদার তিন দিন, তিন রাত সমানে আমার সেবা করেছিলেন, ডোনাও ছিল। ডোনা তো থাকবেই, সে যে আমার বন্ধু। ফাদার শুধু তোমার ওই চার্চের ফাদার নন, আমার ফাদার। আমি যে এখন কী করি! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই নদীটা ফাদারকে দিয়ে দি, ওই পাহাড়টাও, শালের জঙ্গলটাও। তুমি বিয়ে করে ডোনাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'কলকাতার কাছেই একটা জায়গায়।'

'ও তো এখানে একটা চাকরি পেয়েছে।'

'চাকরি পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, চাকরি।'

'তাহলে দেখি কী হয়।'

'দেখিটেখি নয়, তুমি বিয়েও করবে, চাকরিও ছাড়াবে, তা কী করে হয়, দোনো এক সাথ! যাঃ, আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে তোমাদের প্রেম।'

'আমিও অরফ্যান, ও-ও অরফ্যান।'

'বাজে কথা বলিসনি। শোন, এই কুঠিয়াটা আমি তোকে দান করে দিচ্ছি, এইখানে থাক। এই নতুন জালটা তোকে দিয়ে দেব। দেখ, মাছধরা আমার জীবিকা ছিল না, আমি শিখেছি নদীর কাছে থাকব বলে। কোথায় ছিল আমার দেশ! কেউ জানে না। হঠাৎ এসে গেছি, হঠাৎ পেয়ে গেছি জীবন। শহর কিন্তু ডোনার জন্যে নয়। ডোনা হল নদীর মেয়ে! শহরে গেলে ও নষ্ট হয়ে যাবে। শুনেছি, সেখানে লম্পট বড়লোক আর গুণ্ডারা থাকে। সেখানে মানুষের হৃদয় নেই, মনে প্রেম নেই, চোখে জল নেই। শহর হল শয়তানের। গ্রামকে ফুসলে নিয়ে গেছে বেশ্যা শহর করবে বলে। ওখানে এমন একটা নদী পাবে!'

'কেন, আমাদের অত বড় নদী, গঙ্গা!'

'ওটা আর নদী নেই, কলকারখানা, আর তোমাদের শহরের নোংরা জলের নর্দমা।'

ললিতদা আবার জাল বুনতে লাগল। অন্ধকার নেমে গেছে। অভ্যাসে হাত চলছে। ঘরের ভেতর কাঠের টেবিলে সোনার জলে লেখা বাইবেল, তার ওপর একটা ক্রশ। ক্রশটা মাথায় আর বুকে ঠেকালুম। মনে মনে বললুম—Lord, I believe; help thou mine unbelife।

ললিতদা বললে, 'লণ্ঠনটা জ্বেলে দে, পাশেই দেশলাই আছে।'

লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে টেবিলে রাখলুম। অন্ধকার ঘন হলে এই আলোটাই জোর হবে।

'আমি তাহলে আসছি। ঘুরে আবার আসব।'

'রাতটা থাকবি?'

'তা না হলে যাব কোথায়?'

'তাহলে খিচুড়ি চাপাই।'

'চাপাও। এতটা হেঁটে খুব খিদে পেয়েছে।'

বিশাল একটা গেট। পুরো খোলা, ও, আজ যে শুক্রবার। চার্চে প্রেয়ার হচ্ছে। আলো জ্বলছে। জেনারেটারের শব্দ। লাল সুরকির চওড়া পথ, দু-পাশে বাগান রেখে সোজা এগিয়ে গেছে ভেতরে। অনেকটা দূরে সাদা ঝকঝকে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। বিদেশ থেকে বড় কেউ এসেছেন। সবাই প্রেয়ারে। বারোটা একেবারে ফাঁকা। কোথাও চাঁপা ফুল ফুটেছে। ভীষণ গন্ধ। গন্ধের সঙ্গে ভালবাসার খুব যোগ। ভালবাসার সঙ্গে কোমল একটা শরীরের, পায়রার মতো নরম বুকের, ঝকঝকে কালো মর্মর মতো দুটো চোখের, ফুলফুল একটা স্কার্টের, ভরাট বুকে সাদা একটা ব্লাউজের।

হলে ঢুকতেই প্রেয়ারের সুরে ভেসে গেলুম। অরগ্যান বাজাচ্ছেন বৃদ্ধ ফাদার ডেভিস। নানেরা সব সাদা হুড পরে দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বা লম্বা জানলায় টিন্টেড গ্লাস। সোনার জলে ছবি আঁকা। আলো পড়ে ঝকঝক করছে। চোখের অনুসন্ধান ডোনাকে। কোথায় সে! ওই তো পালপিটের সামনে। মনে হল, ছুটে যাই, উড়ে যাই। সে তো উপায় নেই।

'মাস' শেষ হল এক সময়। অরগ্যানের সুর, সমবেত প্রার্থনা, সমাবেশ, আলো, বাতি, খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ প্রলম্বিত মূর্তি, সব মিলেমিশে মনটা বেশ ভরে গেল। মনে হল, এই সুন্দরের এলাকায় চিরকাল যদি থাকা যেত। শহরের ঘুপচি এলাকা। সদা ব্যস্ত মানুষের খণ্ডযুদ্ধ, রংকলের রোলার ড্রামের ভেতর পোর্সিলেন বলের অনবরত শব্দ, থিনারের গন্ধ, মাসের শেষে সামান্য ক'টা টাকার জন্যে হাত পেতে দাঁড়ান! সুখের চেয়ে যন্ত্রণা বেশি। স্বপ্ন কোথায়, সবই তো দুঃস্বপ্ন।

সিস্টাররা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেই বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছেন বাইবেল আর ক্রুশ। পোশাকের খশখশ শব্দ। পালপিটে অরগ্যানের সামনে বৃদ্ধ ফাদার ডেভিস।

খুব আস্তে কথা বলেন, বাতাসের সুরে। আমাকে সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। সামনে একটু ঝুঁকে আছেন।

'ব্লেসিংস মাই সন! কেমন আছ তুমি?'

'প্রভুর আশীর্বাদে ভালই আছি ফাদার! আই হ্যাভ গট এ জব। ফাদার! আপনি কেমন আছেন?'

'আই অ্যাম অলওয়েজ উইথ মাই লর্ড।'

'ফাদার! আপনি বলেছিলেন...'

'ইয়েস, আই নো, বাট শংকর, আই হাভ সামথিং... না, এখানে নয়, আমার কটেজে চল, তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।'

সুরকি ঢালা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে একেবারে পেছনের দিকে। শেষ হয়েছে ঝুমকি নদীর কিনারায়। চার্চ কম্পাউন্ডের পাঁচিল। পাঁচিলের পরেই ঢালু পাড়। পাড় ছুঁয়ে কুলুকুল বইছে নদী। ওদিকে ছোট্ট একটা গেট আছে। সেই গেট খুলে নদীতে নামা যায়।

সাদা গাউন পরে ফাদার হাঁটছেন আগে আগে। আমি পেছনে। কেউ কোনও কথা বলছি না, নিস্তব্ধতা ভেঙে যাওয়ার ভয়ে। মাঝ মাঝে শুকনো পাতায় পা পড়লে সামান্য মচ্‌মচ্‌ শব্দ। পথ যেন আর ফুরোয় না।

ফাদারের কটেজের বাইরে একটা ঢাকা বারান্দা। গোটাকতক বেতের চেয়ার-টেবিল, নিখুঁত সাজানো। ঘরের দরজায় নেটের পর্দা। ভেতরে মৃদু আলো। বাইরে থেকে ভেতরটা মনে হচ্ছে স্বপ্ন।

ফাদার বললেন, 'বোসো, আগে কফি খাওয়া যাক।'

'আমি নিয়ে আসি!'

'না, তুমি বোসো। সব আমার হাতের কাছে আছে।'

ফাদার ঘরের ভেতর থেকে একটা ফ্লাস্ক আর দুটো কাপ নিয়ে এলেন। নিঃশব্দে কফিপান হল কিছুক্ষণ। হঠাৎ খুব মৃদু স্বরে ফাদার বললেন, 'আই হাভ এ সিক্রেট ফর ইউ। একটা গোপন খবর! এতদিনে সেটা প্রকাশ পেল।'

'কী খর্বর ফাদার!'

'তুমি কী জানতে, তোমার বাবা আর মা দু'জনেই আত্মহত্যা করেছিলেন!'

'মারা গিয়েছিলেন। আত্মহত্যা করেছিলেন বলে জানতুম না।'

'ইয়েস, বোথ অফ দেম কমিটেড স্যুইসাইড, কেন জান?'

'না ফাদার।'

'ডোনা, তোমার বোন।'

'আমার বোন! তা কেমন করে হয়! আমিই তো একমাত্র ছেলে!'

'ওয়েট, দেয়ার ইজ এ লেটার। আমার হাতে এসেছে।'

ফাদার উঠে ঘরের ভেতর গেলেন। সেখান থেকে ডাকলেন, 'শংকর, ভেতরে এসো।'

আমার হাতে একটা কাগজ দিলেন। কাগজটা পুরনো হয়েছে। কালির কালো রঙ লালচে হয়েছে। টেবিলল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে বললেন, 'এইখানে বসে পড়ো।'

আমার হাত কাঁপছে। বুকের কাছটা কেমন করছে। পড়তে অসুবিধে হলেও পড়া যাচ্ছে—

'পাপ করেছি আমি।'

'কেন করেছি, তার কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই নি। হয় তো ওই রাতে শয়তান আমার ওপর ভর করেছিল। যা করা উচিত নয়, মুহূর্তের ভুলে তাই করেছি। ভেবেছিলুম, পার পেয়ে যাব, তা হয়নি। সে গর্ভবতী হল। আমার সন্তান সে ধারণ করল। সে খুব ভাল ছিল। আমাকে ভালবাসত। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার ইচ্ছেও তার ছিল না। কিন্তু সেও ছিল পাপী।

মুহূর্তের ভুলের এই কলঙ্ক আমার স্ত্রী, আমার একমাত্র সন্তানকে যেন স্পর্শ না করে। আমার স্ত্রী আমার অবর্তমানে আমার সন্তানকে মানুষ করে তুলতে পারবে—এই বিশ্বাস আমার আছে। আমার পুত্রের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নৈতিক দিক থেকে আমি পতিত হলেও, শিক্ষায়, জ্ঞানে আমার কিছু সুনাম ছিল। সেই উত্তরাধিকার আমি রেখে গেলুম। অর্থ, বিত্ত, এসব আমার কিছুই নেই।'

পড়া শেষ হল, ফাদারকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে এই সে? কেন করে বুঝলেন, ডোনা সেই মেয়ে?'

'খুবই সঙ্গত প্রশ্ন তোমার। এই সে হল তোমার পিতার এক ছাত্রী। সম্প্রতি সে মারা গেছে। মৃত্যুর সময় আমি তার কাছে ছিলুম। সে আমাকে সব জানিয়ে গেছে। তোমার বাবার এই লেখাটা তার কাছেই ছিল, আমাকে দিয়ে গেছে। বলে গেছে, ডোনাকে যদি কেউ বিয়ে করে সে জানতে চাইবে, ডোনার বাবা কে, ডোনার মা কে!'

'আমি তো জানতে চাইনি ফাদার! আমি তো না জেনেই

ভালবেসেছি, বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চেয়েছি। আপনি বলেছিলেন, তুমি চাকরি পেলেই সব হবে।'

'তুমি যাকে বউ হিসেবে চাও, সে এখন তোমার বোন। এই তথ্যটা .তো আমার তখন জানা ছিল না শংকর। তবে তোমার মা জানতেন।'

'মা কেন আত্মহত্যা করলেন?'

'এইটাকেই বলতে পার প্রেম, ট্রু লাভ। তোমার বাবা নেই এটা তিনি সহ্য করতে পারলেন না।'

'আমি তাহলে তাঁর কেউ ছিলুম না!'

'মেডিকেল রিপোর্ট বলছে, তোমার মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।'

'ডোনার মা তখন কোথায়?'

'মেয়েটাকে আমাদের ক্রেডেল ফেলে দিয়ে সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিল। শি বিকেম এ রাইটার!'

'কী নাম?'

'অনুপমা বোস।'

'আমি তাঁর বই পড়েছি। তাঁর কাহিনী নিয়ে একটা সিনেমা হয়েছিল।'

'হোয়াটস্ দ্যাট?'

'দোলনা, সুপার হিট। সে তো তাহলে আমাদেরই কাহিনী।'

'আই হ্যাভ গট দি ইংলিশ ট্রানশ্লেশান পাবলিশড ইন ব্রিটেন।'

'আমার এই মা তো তাহলে বিরাট লেখিকা ছিলেন!'

'অফ কোর্স!'

'কী ভাবে মারা গেলেন?'

'অ্যাকসিডেন্ট।'

'ফাদার! এঁরা এমন করলেন কেন? আমার বাবা বিয়ে করতে পারতেন?'

'তাহলে তো সবই সোজা হয়ে যেত। নদী তো সোজাই চলতে পারে, কেন হঠাৎ বাক নেয়, কোর্স চেঞ্জ করে, কূল ভাঙে, কূল গড়ে। হোয়াই! দ্যাট ইজ ফেট। দ্যাট ইজ ডেসটিনি। শংকর! আমাদের প্রভু বলে গেছেন— Be sure your sin will find you out। তিনি আরও কী বলেছেন! আমাদের পিতারা খেয়েছেন টক আঙুর, তাই ছেলেদের দাঁত টকে আছে। The fathers have eaten sour grapes, and the childrens

teeth are set on edge। তোমার পিতা সাময়িক হলেও কামার্ত হয়েছিলেন, তিনি স্বভাব-পাপী হলে এই পদস্খলনে কিছু হত না, কিন্তু তিনি ছিলেন মানী, জ্ঞানী, কর্তব্যপরায়ণ। আর তোমার মা আর ডোনার মা— দু'জনেই সমান, দু'জনেই সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিল, তাই মৃত্যু তাদের তাড়া করল, পাপের বেতন মৃত্যু। তুমি কী ডোনার সঙ্গে দেখা করবে!'

'না ফাদার, আমিও পাপ করেছি। I confess, তবে না জেনে। আমি জানতুম তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তাই তিন বছর আগে এক্সমাসের সময় আমি তাকে স্পর্শ করেছিলুম, পাপ করেছিলুম পুণ্য করছি ভেবে। পিতার রক্ত আমারও শরীরে আছে। The wages of sin is death।

'যা হয়ে গেছে গেছে। Past is past, নতুন বর্তমান তৈরি কর।'

'ফাদার, বাইবেল আমার নিত্যসঙ্গী, জেরেমিআয় আছে— Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots। ইথিওপিয়ার মানুষ চামড়ার রং পাল্টাতে পারবে? চিতা বাঘ মুছে ফেলতে পারবে তার গায়ের স্পট? আমি যাই ফাদার?'

'এই রাতে যাবে কোথায়?'

'The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen'।

একটা কালো কুকুর আমার পেছন পেছন এল ললিতদার চালা পর্যন্ত। যেমন এল হঠাৎ দেখি নেই। গা'টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। স্পিরিট, আত্মা, কার আত্মা! ললিতদা গান গাইছে, আর খিচুড়ির হাঁড়িতে হাতা মারছে। আমাকে দেখে বললে, 'ব্রাদার! আজ খুব কেয়ার নিয়ে রাঁধছি। গানটা শুনলে, বোম্বাইসে আয়া মেরা...।'

এতক্ষণ শক্ত ছিলুম, এইবার হঠাৎ কেঁদে ফেললুম। ললিতদা উঠে এল, 'কী হয়েছে দোস্ত!'

'যে আমার বউ হবে সে আমার বোন। এখন তার আর বোন হওয়ারও উপায় নেই, আমি তোকে বউয়ের মতো আদর করে এসেছি এতদিন। একদিন চরম আদরও করেছি।'

'কিছুই বোঝা গেল না।'

খেতে খেতে সব কথা ললিতদাকে বলে ভেতরটা একটু হালকা হয়েছে। দু'জনে বসেছি ঝুমকির ধারে। অন্ধকারে বইছে নদী। আকাশের

গায়ে থেবড়ে আছে চুরালিয়া হিলস। চার্চের বিরাট চূড়া স্তব্ধ হয়ে আছে দিনের প্রতীক্ষায়। বিরাট ঘণ্টা যেন মৃত্যুর ঘোষণা।

ললিতদা অন্ধকারে হেসে উঠল, 'আমি তোর চেয়ে অনেক অনেক বেশি চালাক শংকর। মানুষের সংসারের একপাশে আছি, ভেতরে ঢুকিনি। তোকে আমি বার বার বলছি, এখনও সময় আছে, নদীকে বন্ধু কর। ফিরে তাকায় না, থেমে থাকে না। চলেই যায়, চলেই যায়, সামনে কেবল সামনে! একই জলে দুবার চান করা যায় না। নদী হল সময়। ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে গেল আমার চল্লিশটা বছর, আমার যত সুখ, যত দুঃখ। নদী আমার মা, নদী আমার মেয়ে, নদী আমার প্রেমিকা। জাল দিয়ে মাছ ধরি, কথা বলি, যাকে ভাল লাগে তাকে মুক্তি দি। যাদের ভাল লাগে না পাঠিয়ে দি মানুষের ভোগে। আমি ভগবান যদিও আমার নাম ললিত গোমেজ।'

খশ্ করে একটা শব্দ হল। ললিতদা। বললে, কে, কে ওখানে!'

অন্ধকার নড়ছে, অন্ধকার চলছে, এগিয়ে আসছে। কালো চাদর জড়ানো একটা মূর্তি, 'চুপ্, আমি ডোনা। পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

ডোনা ঝাঁপিয়ে আমার বুকে এসে পড়ল, 'দাদা! তুই আমার দাদা। স্বামীর চেয়ে অনেক ভাল। আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে চল।'

চার্চের বিরাট ঘণ্টাটা একবার ঢং করে উঠল। বোধ হয় বাদুড় ঢুকেছে ঘণ্টা ঘরে। তিন বছর আগের সেই রাত। ডোনা আমার আলিঙ্গনে। সে রাতে প্রেমের সঙ্গে কাম ছিল, আজ শুধুই প্রেম। তাই এত ভাল লাগছে, চোখে জল আসছে। নিজের রক্ত খুঁজে পেয়েছি। দাদার মধ্যে তো বাবাও থাকে।

আত্মার আত্মহত্যা

আমাদের সবেতেই ফাঁকি। এর জন্যে দায়ী ইলেকট্রিসিটি। বিদ্যুতের আবিষ্কার আর তার জনমুখী ব্যবহার চালু হওয়ার পর থেকে ফাঁকিবাজি আরও বেড়ে গেল।

কি রকম?

সুইচ টিপলুম, পটাস করে জ্বলে গেল আলো। সুইচ মারা মাত্রই পাম্পের গর্জন, ছাদের ট্যাঙ্ক ভরে গেল। চিমনি পরিষ্কার, পলতে কাটা, তেল ভরার বালাই নেই। আলোটিকে সাবধানে রেখে, যাতে দমকা বাতাস না লাগে, কাছে সরে এসে, আলোর বৃত্তে বইখানি খুলে নিবিষ্ট অধ্যয়ন, আলোর বাইরে ছায়ান্ধকার, তারপর নিবিড় অন্ধকারের এলাকা। রাত বাড়ছে, চিমনিতে দীপের রাত্রি জাগরণের কালিমাও বাড়ছে। এই যে তিনটি বৃত্ত, আলো, ছায়ান্ধকার, ঘোর অন্ধকার, এই তো আমাদের মন। জানি না, অল্প আভাস, পূর্ণ প্রকাশ। আলো থেকে অনেক দূরে, অর্থাৎ অজ্ঞান, অল্প দূরে, অর্থাৎ আভাস, রয়েছে কি সব, তেমন স্পষ্ট নয়, আলোর সন্নিকটে উদ্ভাস, অতঃপর নিবেশ—নিবিষ্ট—জ্ঞান। বোতাম টেপা আলোর জীবনের সান্ধ্য চিত্রটা এইরকমই ছিল। প্রথম আলোর যত্ন, সাধুর নিত্য লোটা মাজার মতো কাঁচের চিমনি পরিষ্কার করা, আলোর রাতের পরমায়ু তেল ভরা। পলতেটিকে গোল করে কাটা, সামান্য গোলযোগে শিখা তেড়াবাঁকা হয়ে যাবে। এটি যেন আলোর অ, আ, ক, খ। মন যদি পলতের মতো গোল না হয়, তাহলে জ্ঞানের আলোও ছেতরে যায়। অতঃপর আলোর বৃত্ত জ্ঞানের সাধককে টেনে আনবে একপাশে। মন নিবিষ্ট হয়ে, আঁধারে ঢাকা থাকবে যাবতীয় অন্য বিভ্রান্তি। সেসব থেকেও থাকবে না। রাত যত প্রভাতের দিকে যাবে, আলো পাণ্ডুর হবে। ঊষা এসে অন্ধকারের গলায় রবির কিরণমালা পরাবে। উষালগ্নে প্রতিদিন এই অদ্ভুত, অলৌকিক বিবাহ! আলো এসে অন্ধকারকে বরণ করে নেয়। ঠাকুরের সেই

কথা—অবিদ্যামায়াকে বিদ্যামায়ায় রূপান্তরিত করে নাও। আলোর বুকে, শিবের বুকে, অন্ধকারের, শ্যামার নৃত্য সাক্ষাৎ সত্য, সংগ্রাম নয় সমর্পণ। দূর থেকে দেখলে আলোও কালো। জ্ঞান থেকে দূরে—এক দর্শন, জ্ঞানের কাছে—এক দর্শন, জ্ঞানের কাছে—আর এক দর্শন। ঠাকুর বললেন, দূর থেকে দেখি, তাই সমুদ্র নীল, দূর থেকে দেখি, তাই ভুবনমোহিনী, জ্যোতির্ময়ী জগদম্বা কালো। কাছে গেলে, শিব, শক্তি অভেদ। এইবার জ্ঞানের পারে যাও, আলোও নেই, কালোও নেই।

ঠাকুর কত অদ্ভুত, কত সহজ। বিভাগ করছেন—জ্ঞান আর চৈতন্য। জ্ঞানের পারে গেলেই চৈতন্য। সসীম থেকে অসীমকে দেখা, আবার অসীম থেকে সসীমকে দেখা। আমার দেহবোধ রয়েছে, দিন, রাত, জন্ম, মৃত্যু দেখছি। স্থান, কালের বোধ আছে। টনটনে 'আমি' রয়েছে একটা। আমি একটা তুমি একটা বিভাজন রয়েছে স্পষ্ট। তখন 'নেতি, নেতি' করে এগোচ্ছি সত্যের দিকে। শাশ্বতের দিকে। তিনি কেমন? শ্রীভগবান গীতায় বলে দিলেন,

অজেনিতঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

পৃথিবীর দৃশ্যমান জগতের এক একটাকে ধরছি। এটা নিত্য, এটা, এটাও না? কোনোটাই অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ নয়। আমি সেই বস্তুকে চাই, যা অজ, জন্মরহিত, নিত্য ত্রিকালে, পরিমাণশূন্য, শাশ্বত, অপক্ষয়শূন্য ও পুরাণ, পরিণামশূন্য। এগোতে এগোতে যখন প্রায় হতাশ, সবই তো চলে যায়। হু হু শব্দে বর্তমান চলেছে অতীতে, ভবিষ্যৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বর্তমানের বুকে। অনুক্ষণ এই তাণ্ডবে বসবাস। বাউলের দল এল, খানিক নাচাগানা হল। চলে গেল। পড়ে রইল ভাঙা উনুন, পোড়া কাঠ। আবার এল একদল।

ঠাকুর বলেছেন, অস্তিত্বের এই বহমানতা চোখে পড়াটাই উদয়, জ্ঞানের উদয়। যার পরেই প্রশ্ন আসবে—'কে ঠেলছে?' কে কে ঠেলে ঠেলে কাঠ গুঁজছে অস্তিত্বের অনির্বাণ হোমানলে। 'কে খেলায় আমি খেলি বা কেন?' মথুরবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, 'বাবা! সবই তো প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে, লালে লাল, সাদায় সাদা। তোমার লাল জবা গাছে সাদা জবা হবে?' ঠাকুর বললেন, 'তাঁর ইচ্ছে হলে তাও হতে পারে।'

হলও তাই। ঠাকুর ডালটা মথুরবাবুর টেবিলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই দেখ মথুর!'

সবিস্ময়ে দেখলেন, 'লাল আর সাদা জবা।'

অন্তরালে কার শক্তি, কোন শক্তি! ছোট এতটুকু একটা বীজে বিশাল বটের শক্তি! নদীর গর্জমান তরঙ্গে বিদ্যুতের শক্তি। বিদ্যুতের বিস্ময়কর চালিকা শক্তি। আকাশে বিদ্যুতের এক চমকে কয়েক লক্ষ ভোল্টের উৎপত্তি। বালকের বিশ্বাসে একরকম, বিজ্ঞানীর পঠিত জ্ঞানে একরকম, আর আধ্যাত্মিক মানবের জ্ঞানে সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেটি কেমন? ঠাকুর বলছেন তাঁর বালক ভাইপো শিবরামের কথা। 'ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভেতর সে আছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তবুও দ্বার খুলে খুলে বাইরে যেতে চায়। বিকালের পর আর বাইরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে আর বলছে, খুড়ো, আবার চকমকি ঠুকচে'।

কে ঠুকছে! কোন সুদূর নভোলোকে বসে আছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক নিয়ন্তা। তাঁর কাছে সব আছে। বিরাট বিরাট চকমকি পাথর তাঁর হাতে। ঝড়ের রাতে আকাশের অলিন্দে বেরিয়ে এসে তাঁর ইচ্ছামতো এক-একবার ঠোকেন, আর ব্রহ্মাণ্ড ঝলসে যায় নিমেষ-নীল আলোয়। বালক তার স্থির পরা বিশ্বাসে সেই কনক হাত দুটি দেখতে পায়।

ঠাকুর তাঁর কলেজে পড়া যুবক ছাত্রদের তড়িৎ-সম্বন্ধীয় আলোচনা শুনে প্রশ্ন করলেন, 'হাঁরে, তোরা ও-কি বলছিস? ইলেক্‌টিক্‌টিক্‌ মানে কি?' যুবক ভক্তেরা তখন পরম উৎসাহে তাঁদের কলেজি জ্ঞান প্রকাশ করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, বজ্রনিবারক দণ্ডের উপকারিতা। সর্বাপেক্ষা উচ্চ পদার্থের ওপরেই বজ্রপতন হয়, সেই কারণে ওই দণ্ডের উচ্চতা বাড়ির উচ্চতার চেয়ে একটু বেশি হওয়া উচিত।'

ঠাকুর মন দিয়ে সব শুনে বললেন, 'কিন্তু আমি যে দেখেছি, তেতলা বাড়ির পাশে ছোট চালাঘর—শালার বাজ তেতলায় না পড়ে তাইতে এসে ঢুকল! তার কি করলি বল! ও সব কি একেবারে ঠিকঠাক বলা যায় রে! তাঁর ইচ্ছাতেই আইন, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই উলটে-পালটে যায়। যাঁর আইন, যিনি আইন করেছেন, তিনি ইচ্ছে করলে আইন পালটে অন্য আইন করতে পারেন।'

নেতি নেতি করে যে শূন্যে উপনীত হবে সেখানে জ্ঞান নয়, আছে

চৈতন্য। জ্ঞান আপেক্ষিক অনেক নিচের জিনিস। জ্ঞান হল প্রত্যক্ষের জ্ঞান। চৈতন্য হল চিদাকাশ। সেখানে জ্ঞান সূর্য উদিত হয় ..কেন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন। সে-জ্ঞান কেমন? ইলেক্‌টিক্‌টিকের জ্ঞান নয়। কূপ থেকে ইন্দ্রিয়ের পাকান দড়ি দিয়ে বোধের বালতি দিয়ে জল তোলা নয়। সমুদ্রের চরাচর উচ্ছ্বাসের মতো প্লাবিত হওয়া। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর চৈতন্যে জাগরিত হওয়া। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে' নিজেকেই খুঁজে পাওয়া। এইটিই হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের বিকিরণের নাম চৈতন্য।

ঠাকুর সেই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন জ্ঞান, ভক্তি আর তন্ত্রের পথ ধরে। সেই অবস্থাটা কেমন? পূজার জন্যে দূর্বা, বিল্বপত্র তুলতে গেছেন। দূর্বা তুলতে তুলতে অনুভব করছেন—সর্বত্র চৈতন্য—ছিন্ন দূর্বাদলের বেদনা নিজে অনুভব করছেন। বিল্বপত্র তুলতে গিয়ে পাতার সঙ্গে বেলগাছের ছাল একটু উঠে এসেছে, মনে হল নিজের ছালই উঠে এল, বেলপাতা আর তোলা হল না।

এই কথাই বললেন, শ্রীভগবান তাঁর শ্রীমুখে,

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমংপশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।

(গীতা : ৬অ/৩২)

হে অর্জুন, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে অভিন্ন তুলনা করে সকল প্রাণীতে সুখ বা দুঃখ সমানভাবে দেখেন, সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ।

অনুভূতির জগতে প্রবেশ করতে হলে নীরব, নিবিড় ধ্যানের প্রয়োজন। মনে, বনে, কোণে। বোতাম-টেপা ব্যস্ততার এই যুগে মন যেন স্কেটিং বুট পরে সদাই ধাবন্ত। বন হয় প্রমোদকানন, না হয় মাফিয়াদের লীলাক্ষেত্র, আর কোণ! আসবাব পরিকীর্ণ।

সভ্যতার অসভ্যতায় মানুষের আত্মা আত্মহত্যা করেছে।